বিমলানন্দ শাসমল

লুকাও কাঁদে লাঁদে

বিমলানন্দ শাসমল

ভারত কিভাবে ভাগ হলো

বিমলানন্দ শাসমল

ভারত কিভাবে ভাগ হলো

হিন্দুস্তান বুক সার্ভিস
কলকাতা

BHARAT KI KORE BHAG HOLO

BIMALANANDA SASMAL

প্রথম হিন্দুস্তান সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৯১

কপিরাইট প্রকাশকের

মূল্য : তিরিশ টাকা

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক : হিন্দুস্তান বুক সার্ভিস
৩৭, ইমদাদ আলি লেন, কলকাতা ৭০০০১৬

মুদ্রক : দুলাল দাশগুপ্ত
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৫, মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২

উৎসর্গ

নির্যাতিত ও পিছিয়ে পড়া
মানুষদের প্রকৃত দরদী
নাসীর আহমদ সাহেবকে

ভূমিকা

ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসের বেশির ভাগ সময়ে দেশটি পরস্পর বিবদমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ব্যতিক্রম ঘটেছিল বৌদ্ধ যুগে, মহারাজ অশোকের সমসাময়িক কালে। বৌদ্ধ যুগের অবসানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থান হোল এবং ভারত আবার বিবদমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল। সেই সুযোগে মুসলমান আক্রমণকারীরা ভারতে প্রবেশ করে কোন কোন অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করল। বিদেশ থেকে আগত মুসলমানদের চেয়ে কালক্রমে যে সকল নিপীড়িত-নিষ্পেষিত হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের সংখ্যাই বেশি হয়ে দাঁড়াল। এরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও ভারতের আদি সন্তান ছিল এবং রইল। প্রচার করা হ'য়ে থাকে যে মুসলমান আক্রমণকারীরা বলপূর্বক হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ একথা স্বীকার করেন নি। তিনি যা বলেছেন, অর্থাৎ দলিত হিন্দুরা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল সেইটাই সত্য বলে মনে হয়। কারণ সে সময়ে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অনিশ্চিত অবস্থার সুযোগ নিয়ে মুসলমানরা আরও অনেক বেশি হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করতে পারত। তা তারা করেনি। হিন্দুরা সংখ্যাগুরুই থেকে গেল আগাগোড়া।

ধীরে ধীরে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটল বটে কিন্তু মারাঠা, রাজপুত ও শিখদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিল। মারাঠা ও শিখদের সঙ্গে মুসলমানদের বৈরিতার সুযোগ নিয়ে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ জাতি ভারতে প্রবেশ করল এবং বহুবিধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করল। ব্রিটিশ শাসনের দৌলতে এই একীভূত শাসনব্যবস্থার অধীন হয়ে ভারতবাসীরা একটা আপাতগ্রাহ্য জাতীয় ঐক্যের প্রথম স্বাদ পেল। স্বয়ং বাল গঙ্গাধর তিলক লিখেছেনঃ "বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এদেশে ইংরেজরাই প্রথম একটি জাতীয় ঐক্যের বনিয়াদ গঠন করেছিল।" কিন্তু ইংরেজের রচিত শাসন-ব্যবস্থার অধীন থাকার জন্য ভারতবাসীদের মধ্যে যে জাতীয় ঐক্যের সূচনা রচিত হয়েছিল তা অনেকটা বাহ্যিক ছিল, তাদের হৃদয়ের অন্দরমহলে পৌঁছতে পারেনি।

মুসলমানরা ইংরেজকে প্রথম প্রথম ঘৃণা করত তাদের রাজত্ব কেড়ে নিয়েছে ব'লে, ওদিকে হিন্দুরা প্রত্যক্ষভাবে এদেশে ইংরেজের আগমনকে স্বাগত

জানিয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমানের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য এই-ভাবে প্রথম থেকেই প্রতিভাত হোল। ভারতে এক ঐক্যবদ্ধ শাসন-ব্যবস্থা ইংরেজ চেয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সংরক্ষণের জন্য। ভারতীয় জাতি-গুলি একটি মিলিত জাতিতে পরিণত হোক তার চেয়েও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সংরক্ষণই ইংরেজের কাছে অধিকতর মূল্যবান ছিল। কারণ একদিকে বিদেশী শাসনের পরিসীমার মধ্যে ভারতকে এক মিলিত জাতিতে পরিণত করা সহজ ছিল না, অন্যদিকে ভারতবাসীরা ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হলে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিপন্ন হোত।

যদিও ভারতবাসীর জাতীয় একত্বের ধারণা ইংরেজের নিকট থেকে শিক্ষালাভেই সৃষ্ট হয়েছিল তথাপি ভারতের শিক্ষিত মহলের একাংশ প্রথম থেকেই প্রচার শুরু করল যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বার্থে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষের বীজ বপন করে এদের পরস্পরকে পরস্পরের শত্রু করে দিয়েছে। ভারতকে শোষণ করতে হলে এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের শত্রু করে না তুললে শোষণ-যন্ত্রটি চালু রাখা সম্ভব ছিল না বলেও বলা হতে লাগল। শিক্ষিত সমাজ আরও বিশেষ করে প্রচার করতে লাগল যে ভারতের সকল সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-বিরোধ সকলই ইংরেজের সৃষ্টি এবং সেই হেতু ইংরেজ শাসনের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সকল সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-বিরোধের অবসান হতে বাধ্য।

১৯০৫ সালে যখন বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন করা হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল বঙ্গ-বিভাগ পরিকল্পনাটি ছিল হিন্দুকে মুসলমান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেবার ব্রিটিশ চক্রান্ত। কিন্তু ১৯৪৭ সালে মুসলমানরাই চাইল অবিভক্ত বাঙলা আর হিন্দুরা চাইল বাঙলা বিভাগ। ১৯০৫ সালে কার্জন যা চেয়েছিলেন ১৯৪৭ সালে হিন্দুরা স্বেচ্ছায় সেই প্রস্তাবকে কার্যকরী করল। আসলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকেই হিন্দুরা—বিশেষ করে বাঙালি হিন্দুরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেশাগত একচেটিয়া অধিকারের কায়েমি স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। পূর্ববাঙলা ও আসামের কিয়দংশ মুসলমান প্রধান হওয়া সত্ত্বেও সেখানে আইন ব্যবসা, ডাক্তারি, চা ও পাটের ব্যবসায়ে হিন্দুরা নিজেরাই অথবা ইংরেজ বণিক কোম্পানির প্রতিনিধি হয়ে পেশাগুলিতে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। পূর্ব বাঙলা মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে চলে গেলে সেই একচেটিয়া অধিকারে বাধা পড়বে বলেই প্রধানত হিন্দু সন্ত্রাসবাদীরা বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল।

ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষায় বিশেষ পারদর্শী হওয়ার দরুণ তখন শিক্ষিত

সমাজ বলতে হিন্দু ভদ্রলোককেই বোঝাত। এই শিক্ষিত সমাজ যখন ইংরেজের হাত থেকে শাসনভার কেড়ে নেবার জন্য আন্দোলন শুরু করল তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজের বদলে দেশের শাসন ভার পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়া। দেশের সর্বসাধারণের মঙ্গলের কথা—দেশের একটি সার্বজনীন স্বাধীন ও মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা বা পরিকল্পনা ভারতের শিক্ষিত সমাজের কোনদিন ছিল না। সেইজন্য শুরু থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হবার জন্য দেশের নিচেরতলার সাধারণ মানুষকে দেশের শিক্ষিত সমাজ কোনদিন ডাক দেয়নি। কিংবা সেই সংগ্রামে সামিল হবার জন্য তাদের কোন অবকাশ রাখেনি।

শিক্ষিত সমাজের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কি করে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করা যায় যাতে স্বাধীনতা লাভের পর সমাজের সকল প্রকার সুখ-সুবিধা তাদের ও তাদের বংশধরদের একচেটিয়া অধিকারে আনতে পারে। দেশের নিচের তলার মানুষের জন্য এদের কিছু করণীয় ছিল না। তাদেরও এবিষয়ে কখনও কিছু করতে বলা হয়নি। তাদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা ছিল না—তারা সংগঠিত হতে পারেনি। ওদিকে নিচেরতলার সাধারণ মানুষদের মধ্যে হিন্দুদের যে অবস্থা ছিল মুসলমানদেরও তাই ছিল।

কিন্তু বিবাদ বাধল হিন্দু শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে মুসলমান শিক্ষিত সমাজের। সাধারণ মুসলমান সম্বন্ধে মুসলমান শিক্ষিত সমাজের যে খুব একটা মাথাব্যথা ছিল তা নয় এবং সে দিক দিয়ে শিক্ষিত হিন্দু সমাজ ও শিক্ষিত মুসলমান সমাজের বিশেষ কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু মুসলমান শিক্ষিত সমাজ বুঝতে পারল হিন্দু শিক্ষিত সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও চক্রান্তে পারদর্শিতার কাছে তাদের ভবিষ্যতও অন্ধকারেই থাকবে। তারা হিন্দু শিক্ষিত সমাজের কাছে চাকরি-বাকরি ও অন্যান্য সামাজিক সুখ-সুবিধা লাভের বেলায় এঁটে উঠতে পারবে না। মুসলিম শিক্ষিত সমাজের স্বার্থ-রক্ষার জন্য তারা ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগ গঠন করল ঢাকায়।

শিক্ষিত সমাজ সব দেশেই বুদ্ধি যোগায় কিন্তু তাদের কার্যক্ষেত্রে কর্মক্ষমতা খুবই সীমিত। কিন্তু নিচেরতলার লোকদের উস্কানি দিয়ে অঘটন ঘটাবার ক্ষমতা রাখে তারা। মুসলমান শিক্ষিত সমাজকেও কোন দাবি আদায়ের জন্য এই পথেই যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু তারা সারা ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় সংখ্যালঘু। সংখ্যাগুরু ও নানান বলে বলিয়ান হিন্দু শিক্ষিত সমাজের কাছে এদের দুর্বল হয়েই থাকতে হল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বড় বড় নেতা যেমন অরবিন্দ, তিলক, লাজপত রায় প্রভৃতি কর্তৃক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে হিন্দু ধর্ম দর্শনের একটা সংমিশ্রণের প্রয়াস চালাবার দরুণ মুসলিম শিক্ষিত সমাজ স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল স্রোত থেকে দূরে সরে রইল। গান্ধী প্রথমে এই বিপত্তির কথা বুঝতে পেরে হিন্দু ও

মুসলমানকে পাশাপাশি দাঁড় করাবার প্রত্যাশায় খিলাফৎ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিলেন। খিলাফৎ-অসহযোগ যৌথ আন্দোলন সে সময়ে দেশে অভূত-পূর্ব সাড়াও জাগিয়েছিল। কিন্তু হিন্দু শিক্ষিত সমাজ খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করা পছন্দ করেনি। তুরস্কের রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলন ভেস্তে যাওয়ায় হিন্দু মুসলমান পূর্বের মতন আবার দূরে সরে গেল। হিন্দু শিক্ষিত সমাজের নিকট থেকে মুসলমান শিক্ষিত সমাজের আশংকার রেশ থেকেই গেল।

মুসলমান সমাজের এই আশংকা দূরীভূত করবার জন্য ১৯২১-এর গয়া কংগ্রেসে প্রস্তাব নেওয়া হোল যে চাকরি-বাকরি ও অন্যান্য সামাজিক সুখ-সুবিধায় মুসলমানের সংখ্যানুপাতিক ন্যায্য দাবি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অচিরে একটি সর্বভারতীয় হিন্দু-মুসলিম চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবের কথা ভুলেই গেলেন। ওদিকে বাঙলায় মুসলমানরা সংখ্যাগুরু। স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠিত হবার পর কাউন্সিলে সরকারকে বিব্রত ও নাজেহাল করবার প্রতিটি পদক্ষেপে মুসলমানদের সাহচর্য অপরিহার্য ছিল। কাজেই ১৯২৩ সালে মুসলমানদের সমর্থনকে নিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাঙলার হিন্দু-মুসলিম চুক্তি সম্পাদন করলেন। কিন্তু প্রায় সমগ্র হিন্দু শিক্ষিত সমাজ এই চুক্তির বিরোধিতায় আসরে নামল। এবং বাঙলায় কংগ্রেসের যে দু'-একজন নেতা যেমন, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, এই চুক্তির স্বপক্ষে ওকালতি করলেন তাঁরা হিন্দু শিক্ষিত সমাজের অপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তাঁর নিজের প্রিয় অনুচরদের প্রচণ্ড বিরোধিতায় চিত্তরঞ্জন খুব বিব্রত হলেন এবং শেষে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে অকস্মাৎ পরলোকগমন করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাঙলার কংগ্রেস নেতারা চিত্তরঞ্জনের বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল করে দিলেন—এই বাতিলকরণের নেতৃত্ব দিলেন শরৎচন্দ্র বসু। তিনি বললেন, এই চুক্তি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে পাশ হয়নি এবং কথা ছিল স্বরাজ লাভের পর এই চুক্তির শর্তগুলি কার্যকরী করা হবে কাজেই চুক্তির অস্তিত্বই নেই।

বাধ্য হয়ে মুসলমানরা ভারত রাষ্ট্রের মধ্যেই নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা শুরু করল। গান্ধী-নেহরু প্রভৃতি কংগ্রেস নেতারা মুসলমানদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনেও নিয়েছিলেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে গেল। যে যুদ্ধ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে ফাসিস্ত আগ্রাসী দেশগুলির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করা হয়েছিল ব'লে বলা হোত সেই যুদ্ধের শেষে ভারতকে স্বাধীনতালাভ থেকে বঞ্চিত করে রাখা অসম্ভব ব'লে স্বীকৃত হোল। তাই ব্রিটিশ সরকার ১৯৪২-এর মার্চে ক্রিপ্‌স্‌ মিশন পাঠাল ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে যুদ্ধের পরে

ভারতে একটি স্বাধীন সরকার কিভাবে গঠন করা যায় তার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে। গান্ধী এবং জিন্না উভয়েই ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ১৯৪৩ সালে আর্চিবল্ড ওয়েভেল ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হবার পরই ভারতকে স্বাধীনতা দানের প্রস্তাব নিয়ে প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করলেন। তিনি চার্চিলকে লিখলেনঃ "ভারতকে পশুশক্তি দিয়ে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। আমরা বহুদিন আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সেইমত যথাশীঘ্র ভারতকে স্বাধীনতা দিতেই হবে।" প্রধানতঃ ওয়েভেলের চেষ্টাতেই ভারতের অন্তবর্তী সরকার গঠিত হ'ল এবং নেহরু, প্যাটেল ও আজাদ প্রভৃতি ও মুসলিম লিগের লিয়াকৎ আলি খাঁ, চুন্দ্রিগড় প্রভৃতি বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করলেন। ওয়েভেলের চেষ্টাতেই ভারতকে স্বাধীনতাদানের প্রস্তুতি শুরু হোল।

ইতিমধ্যে ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে চার্চিলের রক্ষণশীল দলকে পরাজিত করে শ্রমিক দল সরকার গঠন করলো এবং ক্লেমেণ্ট এটলি প্রধানমন্ত্রী হ'লেন। বিলাতের শ্রমিক দল মন্ত্রিসভা ১৯৪৬-এ তিন মন্ত্রীর এক ক্যাবিনেট মিশন পাঠালেন ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা ক'রে ভারতের স্বাধীনতার খসড়া প্রস্তাব রচনা করবার জন্য যেটা তাঁরা প্রকাশ করলেন ১৬ই মে।

এই প্রস্তাবে ভারতকে তিনটি সেকশনে ভাগ করা হোল। একটি হিন্দু-প্রধান প্রদেশগুলি নিয়ে। অন্য দুটি পশ্চিমে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান নিয়ে এবং পূর্বে বাঙলা ও আসাম নিয়ে। কেন্দ্রের হাতে রইল মাত্র চারটি বিভাগঃ—বিদেশ, প্রতিরক্ষা, যাতায়াত ব্যবস্থা এবং এই বিষয়গুলি সম্পর্কিত অর্থ বরাদ্দ ব্যবস্থা। সেকশনগুলি অন্যান্য সকল বিষয় পরিচালনা সম্পর্কে স্বাধীন। কোন প্রদেশ দশ বছর বাদে তার সেকশন থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। একটি স্বাধীন সংবিধান পরিষদ বা কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি স্বাধীনতার এই খসড়াকে পাশ করিয়ে স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করবে।

সবার আগে জিন্না এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তাঁর বহুদিনের পাকিস্তান ও ভারতবিভাগের দাবি প্রত্যাহার করে নিলেন। কংগ্রেস প্রস্তাবে বলা হোলো তারা এই খসড়া প্রস্তাবকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু কিছুদিন বাদে তখনকার কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে বলে বসলেনঃ "আমরা কিছুই গ্রহণ করিনি—আমরা একটি স্বাধীন কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে যাবার প্রস্তাব গ্রহণ করেছি এবং সেখানে যে প্রস্তাব পাশ হ'বে ভারতের স্বাধীনতা সেইভাবে রূপ নেবে। একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বসমাজে অবহেলার পাত্র হবে—আমরা তাতে রাজি হতে পারি না।"

জিন্না তখন বললেনঃ "ইংরেজ সরকারের থাকাকালিন অবস্থায় কংগ্রেস নেতারা যখন ইচ্ছামত নিজেদের কথা পাল্টাচ্ছেন তখন ইংরেজরা চলে গেলে এ'রা কী করবেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।" অতএব তিনি দাবি করলেন, ভারত বিভাগ ছাড়া শান্তিলাভের অন্য কোনো পথ নেই। তিনি ঘোষণা করলেন, "পাকিস্তান লাভের জন্য এখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ বেছে নিতে হবে। সাংবিধানিক পন্থার প্রতি 'গুডবাই'।"

গান্ধী বলেছিলেন, "ভারত বিভাগ মানে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। পাকিস্তানের জন্য এক ইঞ্চি জমি দেওয়াও ঠিক হবে না।" ওদিকে জিন্না বলেছিলেন, "সাংবিধানিক পন্থার প্রতি গুডবাই।" অতএব দেশময় একদিকে হিন্দু-শিখ অন্যদিকে মুসলমানের সঙ্গে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল প্রথমে কলকাতা, তারপর নোয়াখালি, তারপর বিহার ক্রমে ক্রমে সমগ্র উত্তর ভারত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুনে জ্বলতে লাগল। সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ নিল পাঞ্জাবের দাঙ্গা। সেখানে উভয় সম্প্রদায়ের কয়েক লক্ষ লোক নিহত হোল। সবচেয়ে আশংকার কথা হ'ল পাঞ্জাবের দাঙ্গা কখন তার ভয়াবহ রূপ নিয়ে উত্তর ভারতের অন্যান্য শহরে ছড়িয়ে পড়বে। সেই নিরতিশয় বিপজ্জনক সম্ভাবনাকে রুখবার জন্য মাউণ্টব্যাটেন রাতারাতি পার্টিশন প্ল্যান তৈরি করলেন এবং নেহরু ও প্যাটেলকে দিয়ে তাদের সমর্থনে সেটি সই করিয়েও নিলেন। জিন্নার পাকিস্তানকে খর্ব করবার জন্য বাঙলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করবার ব্যবস্থা রাখা হোল।

তবুও গান্ধীকে রাজি করানো গেল না। কিন্তু তাঁকে বোঝানো হল একমাত্র ভারত বিভাগ করেই পাঞ্জাবের দাঙ্গাকে শান্ত করা যেতে পারে অন্যথায় এই দাঙ্গা অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়লে তা রোধ করবার ক্ষমতা নেহরু, প্যাটেল, মাউণ্টব্যাটেন কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না। গান্ধীও তখন অশীতিপর এবং অন্যান্য নেতাদের নিরুপায় অবস্থার কথা বুঝতে পেরে তাঁকেও শেষ পর্যন্ত ভারত-বিভাগে সম্মতি দিতে হোল।

১৯৪৬-এর ২৭শে আগস্ট বড়লাট লর্ড ওয়েভেল কলকাতার দাঙ্গার উল্লেখ করে গান্ধীকে অনুরোধ করেছিলেন জিন্নার সঙ্গে একটা দ্রুত মীমাংসার ব্যবস্থা না করতে পারলে কলকাতার দাঙ্গা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে এবং প্রচুর লোকহানি হবে। গান্ধী তার জবাবে বলেছিলেন, "ইফ্ ইণ্ডিয়া লীড্স্ এ ব্লাডবাথ শী শ্যাল হ্যাভ ইট্।" (ভারতকে যদি রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে যেতে হয় তাহলে তাই হবে।")

দাঙ্গা-রক্তপাত এড়াবার জন্যে ওয়েভেল একটা সুন্দর প্রস্তাব করেছিলেন যাকে তিনি বলতেন ব্রেকডাউন প্ল্যান। প্রথমে হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিকে আগে স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হোক এবং মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলিতে

ব্রিটিশ শাসন আরও কিছুকাল চলুক—পরে অবস্থা শান্ত হলে সময় বুঝে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে চলবে। কারণ মুসলমানের ক্ষোভ আশু হিন্দু শাসনের বিরুদ্ধে, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ততটা নয়। ওয়েভেলের এই প্রস্তাব এটলি সরকার অগ্রাহ্য করে ও নেহরুও অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলে দেশে বোধহয় এত লোকহানি, রক্তক্ষয় হোত না।

বিমলানন্দ শাসমল

বিভেদের বীজ

ভারত কেন ভাগ হোলো—এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের চলে যেতে হবে সুদূর অতীতে—কয়েক হাজার বছরের পুরোনো ভারতে। আমাদের চলে যেতে হবে সেইদিনের ইতিহাসে যেদিন এই ভারতের মাটি লাল হয়ে উঠেছিল আর্যের হাতে নিপীড়িত অনার্যের রক্তে। বহুদিন আগে ১৩৬৭ সালের মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে আমি লিখেছিলাম যে, ইহুদি, মোঙ্গল বা ককেসীয় জাতি বলে যেমন মনুষ্য সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর উল্লেখ আছে, সেই রকম আর্যজাতি বলে কোনো বিশেষ জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানব ইতিহাসে কোনো উল্লেখ নেই। পৃথিবীর কোন্ অঞ্চল এদের আদিম বাসস্থান, সেই কারণে সে সম্বন্ধেও কোনো ইতিহাস নেই। আর্যরা যে বহিরাগত একথা অবশ্য কেউ কেউ স্বীকার করেন।

বলা হয়ে থাকে, ভারতের প্রথম সভ্যতা আর্যরাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর্যরা ভারতকে সুসভ্য করবার জন্য কোথা থেকে ভারতে এলেন, সে-সম্বন্ধে অনেক জল্পনা-কল্পনা আছে বটে, কিন্তু ভারতে আসবার আগে তাঁদের জন্মস্থানকে তাঁরা কতখানি সুসভ্য করতে পেরেছিলেন সে-সম্বন্ধেও ইতিহাসে কোনো ইঙ্গিত নেই। 'আর্য' কথাটি নাকি এসেছে পারস্য দেশের 'আরিয়স' বাক্যটি থেকে। কিন্তু পারস্যের ভাষায় 'আরিয়স' মানে অভিজাত—ওটা কোনো জাতিজ্ঞাপক বাক্যই নয়।

হিটলারও জার্মানদের এই আর্য-বংশসম্ভূত বলে জাহির করতেন। জার্মানদের আর্যত্বের পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্য তিনি লক্ষ লক্ষ ইহুদি নর-নারী ও শিশুর প্রতি যা করেছিলেন তা কেবল হাজার হাজার বছর আগে আর্যরা অনার্যদের প্রতি যা করছিলেন তার সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু যেমন জার্মানীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন হিটলারের আর্য-বংশ বহির্ভূত, তেমনি ভারতে অনার্যরা প্রাক-আর্য যুগ থেকেই সভ্য-জাতি হিসাবে বাস করছিলেন। এই প্রাক-আর্য সভ্যতার আকর্ষণেই আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেছিলেন অন্য দেশ থেকে। যেমন মুসলমানরা পরে অন্য দেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন, তেমনি আর্যরাও এদেশে বহিরাগত।

স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্য বলেছেন, আর্যরা ভারতেরই লোক—'সমস্ত ভারতই আর্যময়'। কিন্তু অনার্যদের প্রতি আক্রমণের কথা এবং তাদের প্রতি আর্যদের আচরণ—যা বেদে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে তিনি

কোথাও কিছু বলেন নি। তাঁর মতে, আর্যদের আদিম বাসস্থান ছিল আফগানিস্তান এবং সে সময়ে আফগানিস্তান ভারতেরই অংশ ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আর্যরা সভ্যতা বিস্তার করেছিল বলে বলা হয়, কিন্তু আফগানিস্তানে আর্য সভ্যতার আদিম রূপটি কি ছিল, বিবেকানন্দ তা বলেন নি।

বলা হয়ে থাকে, আর্য-হিন্দুরা চিরদিন শান্তিপ্রিয় এবং আবহমানকাল ধরে তাঁরাই পৃথিবীতে শান্তির বাণী বহন করে এনেছেন। কিন্তু এদেশে আর্যদের জীবনপ্রভাত শুরু হয়েছিল নিরীহ শান্তিপ্রিয় অনার্য অর্থাৎ দাস বা দস্যুজাতির রক্তসিঞ্চনে। বেদে আর্যদের হাতে এই নিরপরাধ দাস ও দস্যুজাতির হত্যালীলার চিত্রটি সুপরিস্ফুট হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে কোরানে আছে—'কাফেরদের' হত্যা করিবে।* কিন্তু বেদ বলেছে, দাস ও দস্যুজাতিকে অর্থাৎ অনার্যকে 'হত্যা করাই ধর্ম।' বেদের বহু মন্ত্রে দাস ও দস্যুজাতিকে হত্যা করবার শক্তি ও সুযোগ প্রার্থনা করা হয়েছে দেবতার কাছে। বিশেষত ঋক্‌বেদ ও অথর্ববেদে।

বেদে আরও একটা জিনিস প্রকাশ হয়েছে। আর্যদের একটিমাত্র অস্ত্র ছিল, আগুন দিয়ে পোড়ানোর ক্ষমতা। ওদিকে দাস ও দস্যুজাতির ছিল অলংকারাদি, বাসগৃহ এমন কি নগর-স্থাপত্য। রামায়ণে বানর-সৈন্য দিয়ে সেতু তৈরি করে রামের লংকাযাত্রার পথ করে দেবার যে-কাহিনী আছে তা সম্পূর্ণ অলীক নাও হতে পারে। বানররা হলো অনার্য জাতির প্রতীক এবং অনার্যরাই তখন সমুদ্র পারাপারের সেতু তৈরি করবার ক্ষমতা রাখতেন। মহাভারতের ময়দানব জতুগৃহ তৈরি করেছিলেন। তিনিও দাস বা দস্যুজাতি-সম্ভূত ছিলেন। অনার্যদের মধ্যে যাঁরা আর্য প্রভুত্ব স্বীকার করে নিতেন তাঁরাই ছিলেন দাস—যাঁরা করতেন না, তাঁরা দস্যু। বহিরাগত আর্যরা দাস ও দস্যুজাতির এই যে হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিলেন বহু সহস্র বছর আগে, এতেই ভারতীয় সমাজজীবনে বিভেদের বীজ প্রথম থেকেই আরোপিত হয়ে রইল।

---

* এটা যুদ্ধের সময়ের নির্দেশ। পবিত্র কোরানে উপস্থাপিত জীবন-দর্শন, শাশ্বত জীবনাদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধের ধারক সামাজিক জীবন-ধারাকে যারা অস্বীকার করে তাদেরকে কোরানের পরিভাষায় মান্যকারীদের (মুমিনদের) মোকাবিলায় কাফের (অবিশ্বাসী) বলা হয়েছে। এ বিভাগ হিন্দুধর্মের বর্ণাশ্রম বিভাগের ন্যায় কোনো বর্ণগত বা জাতিগত বিভাগ নয়। এই কাফেররা যখন আক্রমণাত্মকভাবে কোরান-পন্থীদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, সেই যুদ্ধকালীন অবস্থার এক সঙ্গীন পর্যায়ে কুরআন হত্যার নির্দেশ দেয়। বর্তমানে যে কোনো সরকারও যুদ্ধকালে হত্যার বা সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গীণ পরিস্থিতিতে Shoot at sight বা 'দেখা মাত্র গুলি করার' নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়।

যে সকল দাস ও দস্যুকে আর্যরা ধ্বংস করতে পারলেন না অথচ যারা আর্য প্রভুত্ব স্বীকারও করল না—তাদের রেখে দেওয়া হোলো সমাজের অন্তজ-অস্পৃশ্য করে। তাঁদের মারা হোলো না, শুধু কেড়ে নেওয়া হোলো তাঁদের মনুষ্যত্বের মর্যাদাটুকু। এইভাবে কায়িক পরিশ্রম দিয়ে যারা সমগ্র সমাজ-জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতো—চাষী, তাঁতী, কুমোর, কামার, স্যাকরা, গয়লা, ধোপা, নাপিত এমন কি স্থপতি ও শিল্পীদেরও আর্য-ভারতে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য করে দেওয়া হোলো। সেইজন্য স্বাভাবিক কারণেই ভারতীয় সমাজ-জীবনের প্রথম প্রভাত থেকেই এক বিরাট জনসমষ্টি দেশের ও সমাজের প্রতি বিমুখ হয়ে অন্তরে অন্তরে শত্রু হয়ে রইল। 'মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছো যারে'—সেই বিরাট জনসমষ্টি, দেশ ও সমাজকে কি করে ভালবাসতে পারতো, এই প্রশ্নটা আমি সবার সামনে রাখছি। সমাজসৌধের অঙ্গন থেকে এই বিরাট জনসমষ্টিকে যেন বলপ্রয়োগে বহিষ্কৃত করা হোলো ভারতীয় সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই। আর্য-হিন্দুদের মূল মন্ত্রই ছিল—সামাজিক বিভাজন।

এই সঙ্গে আর্য-হিন্দুরা একটি অপূর্ব বস্তুর সৃষ্টি করলেন, বুদ্ধি-জগতের ইতিহাসে যার তুলনা নেই। তাঁরা সৃষ্টি করলেন, কর্মবাদ। অর্থাৎ বর্তমান জীবনে যারা মানুষের অধিকারের মর্যাদা হারিয়ে দুঃখ-লাঞ্ছনার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে সেটা তাদের পূর্বজন্মের পাপের ফল এবং বর্তমান জীবনে যদি তারা পুণ্যকর্ম অর্থাৎ নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য উচ্চবর্ণের পদসেবা করে যেতে পারে, তাহলে পরজন্মে তারাও আবার উচ্চবর্ণে জন্মলাভ করে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবে। এটাই ঈশ্বরের অমোঘ বিধান।

এই ধর্মভিত্তিক সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে অচিরে বিদ্রোহ করলেন বিশ্বের প্রথম বিপ্লবী নায়ক, বুদ্ধ। তিনি বেদকে অস্বীকার করলেন এবং জনগণকে বেদের অনুশাসন অনুসরণ করতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, মানুষের জীবনে ঈশ্বরের কোনোই প্রয়োজন নেই, নিজের সদযুক্তিই মানুষকে পৌঁছে দেবে সত্যের সিংহদ্বারে, সমাজের প্রতিটি বিধি-নিয়ম যুক্তির দ্বারা বিচার করে নিয়ে পালন করতে হবে এবং এমন কি তাঁর নিজের কথাগুলিও।

আর্যদের ভারতে অনুপ্রবেশের পর অনার্য বা প্রাক-আর্য সভ্যতার একটি বিরাট অবদান নষ্ট হয়ে যেতে বসলো। আর্যরা ছিলেন আক্রমণকারী, তাঁরা এদেশে প্রেম ও মৈত্রীর ধ্বজা ওড়াবার জন্য আসেন নি। মৈত্রী ও প্রেমের বা মনুষ্যজীবনের মহত্তর আদর্শগুলির পীঠস্থান এদেশে রচনা করেছিলেন প্রাক্-আর্য ভারতীয়রা। দেশের চেয়ে জগৎ বড়—জাতির চেয়ে মানুষের মঙ্গল বড়, এটাই ছিল প্রাক্-আর্য ভারতের মর্মবাণী। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই তথ্যটি আমি কোথা থেকে পেলাম? উত্তরে বলবো, নৃশংস আক্রমণে অনার্যদের হত্যালীলার মধ্য দিয়ে আর্যরা প্রেম ও মৈত্রীর বাণীকে চিরতরে ভস্ম করে

দিয়েছিলেন এবং প্রেম ও মৈত্রী যদি আর্যদের জীবন-দর্শন থাকতো, তাহলে দাস ও দস্যুজাতির প্রতি তাঁরা এত নৃশংস হলেন কেন? কেনই-বা দেশের বিরাট জনসমষ্টিকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করে পশুতুল্য জীবন-যাপনের ধর্মীয় অনুশাসনের প্রচলন করলেন? স্বয়ং বিবেকানন্দ বলেছেন: 'এমন শাস্ত্রও আছে যাহাতে এইরূপ কঠোর বাক্য বলা হইয়াছে যে, যদি শূদ্র বেদ শ্রবণ করে তাহার কর্ণে তপ্ত সীসা ঢালিয়া দিতে হইবে, যদি তাহার বেদ কিছুমাত্র স্মরণ থাকে তবে তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। যদি সে ব্রাহ্মণকে 'ওহে ব্রাহ্মণ' বলিয়া সম্বোধন করে তবে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিতে হইবে। ইহা প্রাচীন আসুরিক বর্বরতা...এই প্রাচীনগণের ভিতর সময়ে সময়ে আসুরিক প্রকৃতিলোকের অভ্যুদয় হইয়াছিল'। (ভারতে বিবেকানন্দ, ৩২৯ পৃঃ)

যাঁরা বিশ্বমৈত্রীর বন্ধনে সমগ্র বিশ্বকে সম্মিলিত করবার ব্রত নিয়েছিলেন বলে বলা হয়, সেই আর্যরা এই ভারতভূমিতে ন্যায়বিচারের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু অস্বীকার করে এদেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে দণ্ডবিধি প্রয়োগের পৃথক মাপকাঠির ব্যবস্থা করেছিলেন। নারী ধর্ষণ করলে ব্রাহ্মণের শাস্তি ছিল কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাও নয়। কিন্তু শূদ্রের বেলায় শাস্তি নির্বাসন এবং সকল সম্পত্তির অধিকার লোপ। ব্রাহ্মণ নারী ধর্ষণ করলে ১০০০ মুদ্রা দণ্ড দিতে হোতো ব্রাহ্মণকে, কিন্তু শূদ্র-রমণী ধর্ষণ করলে ব্রাহ্মণের দণ্ড ছিল ৫০০ মুদ্রা। অর্থাৎ শূদ্র-রমণীর সতীত্বের দাম ছিল ব্রাহ্মণ-রমণীর ঠিক অর্ধেক। কোনো অপরাধেই এমনকি নরহত্যার অপরাধেও ব্রাহ্মণকে কোনো দৈহিক শাস্তি দেবার আইন ছিল না। (ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট ইন এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া, আর. পি. দাশগুপ্ত দেখুন)

ন্যায়বিচারের স্বাভাবিক গতিকে যাঁরা জাতিভেদের প্রাচীর দিয়ে এদেশে রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন, তাঁরা কি করে বিশ্বমৈত্রীর আদর্শকে সফল করতে পারতেন—আমি জানিনা। যাঁরা নিরীহ-নিরপরাধ অনার্যদের রক্ত-সিঞ্চনে দেশের মাটি লাল করেছিলেন, তাঁরা কি করে প্রেম ও মৈত্রীর পূজারী হতে পারেন—এটা আমার বুদ্ধির অগম্য। যাঁরা নিজের ভাইকে ন্যায়বিচারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, তাঁরা কি করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব সফল করে তুলতেন—আমার জানা নেই।

দেশের মাটি যে স্বর্গের চেয়েও গরিয়সী, এই সংকীর্ণ আদর্শও আর্যরাই এদেশে প্রথম প্রচার করলেন। এটা সত্যকার ভারতের আদর্শ নয়। এই কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আমার স্থির বিশ্বাস, আমার দেশবাসী সত্যকার ভারতকে ফিরে পাবে যদি তারা সেই শিক্ষার বিরুদ্ধে লড়তে পারে,

যা শেখায় যে, বিশ্বমানতার আদর্শের চেয়েও দেশ বড়ো'। (ইংরেজির অনুবাদ—ন্যাশন্যালিজম—১০৬ পৃঃ)

প্রাক্-আর্য ভারতের সবচেয়ে বড় অবদান এইটাই যে, দেশকে দেশ বলে নয়, পরন্তু বিশ্ব জগতের একটি অংশ হিসাবে দেখতে হবে। আলবার্ট সোয়াইৎযেয়ারের বা আলবার্ট আইনস্টাইনের "ওয়ানওয়ার্ল্ডে"র স্বপ্ন প্রাক্-আর্য ভারতীয়রা দেখেছিলেন হাজার হাজার বছর আগে। কিন্তু, "ওয়ানওয়ার্ল্ডে"র স্বপ্ন সফল করতে গেলে দেশের গন্ডীটি তুলে দিতে হয় এবং বিশ্বজগতের মধ্যে সেই গন্ডীকে ছড়িয়ে দিতে হয়। দেশকে ধ্বংস না করে কি করে সেটা সম্ভব, তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল প্রাক-আর্য ভারত। সেই কারণে ইতিহাসের প্রথম দিন থেকেই ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছিল বিশ্বময়। বিশ্বের সকল জাতির মানুষ এসে মিলতে পারতো ভারতে এবং বিশ্ব সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ গড়ে উঠতে লাগলো এই দেশের মাটিতে। সমগ্র বিশ্বকে একাত্ম করে নেবার এই-যে পরম প্রয়াস, এই জন্যই ভারতের আদিম অধিবাসী অনুপ্রবেশকারী আর্যদের প্রতিহত না করে তাঁদের আত্মীয় হিসাবেই বরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আদিম ভারতীয়দের এই বিশ্বজনসমাজে প্রতিষ্ঠার স্বপ্নটিকে আর্যরাই প্রথম নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙ্গে দিলেন। বিদেশ যাত্রা করলে যে হিন্দুকে সমাজচ্যুত করা হোতো সেটা বিদেশকে ঘৃণা করবার এই আর্য-মনোবৃত্তির অনুসরণেই। আর্য মনোবৃত্তির বিচারে অপর সকলেই ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ। শুধু আর্যরাই মহান এবং গরীয়ান।

বুদ্ধ এই অ-ভারতীয় আদর্শের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করলেন। ভারতের ইতিহাসে এই বুদ্ধই আজ পর্যন্ত একমাত্র ব্যক্তি যিনি ভারতের মর্মবাণীটি উপলব্ধি করে, তার প্রসারের জন্য জীবনপাত করেছিলেন। বুদ্ধ প্রথমে সামাজিক শোষণের শৃঙ্খল-জাল থেকে মুক্ত করলেন দেশের শ্রমিক-কর্মী সাধারণ মানুষকে। তারপর তিনি তাঁর মহৎজীবনের মঙ্গলস্পর্শ দিয়ে খুলে দিলেন ভারতের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের মহামিলনের তোরণদ্বার। যেখানে মানুষ মুক্ত সেখানেই সে পারে সৃষ্টির মহান ব্রত সফল করতে। তাই বৌদ্ধযুগে ভারতের মুক্ত সমাজের মানুষ দিকে দিকে শুরু করলো জয়যাত্রা। সংস্কৃতিতে, শিল্প-সাহিত্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, চরিত্রের মহনীয়তায় বৌদ্ধযুগের ভারত ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক আদর্শ দেশ।

কিন্তু আর্য-আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম চুপ করে বসে থাকেনি। বেদের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম গোপনে ও প্রকাশ্যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল অবিরাম। তারই ফলে ধীরে ধীরে বুদ্ধের প্রবর্তিত মহাধর্ম বিকৃত হয়ে উঠলো। বিবেকানন্দ অবশ্য বলেছেন যে, বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি খুব বীভৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং তার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের

চরম অধঃপতন ঘটলো। তার উত্তরে বলা যায় যে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসবার জন্য বুদ্ধের পরবর্তী ধর্মনেতারা ওই ধর্মের বহু আচারকে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের পটভূমিকায় প্রচলিত বহু ক্রিয়াকলাপ বৌদ্ধ ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে গেল যা বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত রূপটিকে অবশেষে ম্লান ও বিকৃত করে দিলো।

স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক যে-কারণেই হোক, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এলো তারই প্রাধান্য, ফিরে এলো জাতিভেদের যূপকাষ্ঠে ন্যায়বিচারের মৃত্যু-দণ্ড, ফিরে এলো ধর্মভিত্তিক সামাজিক শোষণের নগ্ন প্রকাশ।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সামাজিক নির্যাতনের এই নগ্ন পুনঃপ্রকাশে ভারতের দরিদ্র সাধারণ শ্রমিককর্মী নিষ্পেষিত হতে আরম্ভ করলে, তারা ধীরে ধীরে আবার দেশের ও সমাজের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠলো। মহামতি বুদ্ধের মহামন্ত্র ভারতের আপামর সাধারণকে যে মিলনসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছিল, সেটি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে একাকার হয়ে গেল এবং বিভেদের বন্যার বারি-রাশি ভারতীয় সমাজকে বিভিন্ন পথ দিয়ে প্রবলভাবে প্লাবিত করে তুললো।

বৌদ্ধধর্মকেই ভারতের অবনতির মূল কারণ বলে বারবার উল্লেখ করলেও বিবেকানন্দ স্বীকার করেছেন, 'ক্ষমতা যখন অসদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তখন উহা আসুরিকতার ভাব ধারণ করে...অতএব এই শতশত শতাব্দী-সঞ্চিত শিক্ষা ও সংস্কার—ব্রাহ্মণ এতদিন যাহার রক্ষক স্বরূপ—তাহা সর্বসাধারণকে দিতে হইবে আর তাঁহারা সর্বসাধারণকে উহা এতদিন দেন নাই। এই কারণেই মুসলমান আক্রমণ সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহারা (ব্রাহ্মণেরা) গোড়া হইতেই সর্বসাধারণের নিকট এই ভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন নাই, এই কারণেই সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে কেহ ইচ্ছা করিয়াছে, সে-ই ভারতে আসিয়া আমাদিগকে পদদলিত করিয়াছে। ইহাতেই আমাদের এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে। (ভারতে বিবেকানন্দ— ৩৩৪ পৃঃ)

বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির পর ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানে ভারতীয় সমাজের যে শোচনীয় অবস্থা দাঁড়ালো, বিবেকানন্দই তার সুস্পষ্ট চিত্র এঁকে দিয়েছেনঃ 'মুসলমান কয়জন সিপাহী আনিয়াছিল? ইংরাজ কয়জন আছে? ছ'টাকার জন্য পিতা ভ্রাতার গলা কাটিতে পারে এমন লক্ষ লক্ষ লোক ভারত ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যায়? সাত'শ বছর মুসলমান রাজত্বে ছ'কোটি মুসলমান, একশ বছর ক্রীশ্চান রাজত্বে কুড়ি লক্ষ ক্রীশ্চান—কেন এমন হয়? —ওরিজি-নালিটি একেবারে দেশকে কেন ত্যাগ করিয়াছে?' (২৪।৪।৯৭—পত্রাবলী ২য় ভাগ, ১৯৩-৯৪ পৃঃ)

সামাজিক বিভাজন

ব্রাহ্মণ্যধর্মের যুগে দরিদ্র অস্পৃশ্য শূদ্র শ্রমিকের জীবন বিভীষিকাময় হয়ে উঠলো। ধর্মীয় অনুশাসনের কঠিন নিগড় দিয়ে তাদের জীবনকে এমনভাবে বেঁধে দেওয়া হোলো যে, এই জীবন্ত নরক থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায়ই তাদের রইল না। বৌদ্ধদের উপরেও হিন্দু নৃপতিরা কম অত্যাচার করতেন না। বুদ্ধের পূজা বা গুণগান করলে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হোতো। এমন-কি শিল্পী ও কুশলীদের জীবনও বিষময় করে তোলা হোলো। বুদ্ধের পূজা করলে যে প্রাণদন্ড বা নির্বাসন দেওয়া হোতো তার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য হৃদয়স্পর্শী কবিতা 'শ্রীমতী'র কথা নিশ্চয়ই কেউ ভুলতে পারবেন না।

কিন্তু এইভাবে বুদ্ধভক্তেরা ও দরিদ্র শূদ্র শ্রমিক অস্পৃশ্যেরা ধীরে ধীরে দেশ ও সমাজজীবন থেকে নিশ্চিতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। দেশময় এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতার সংবাদ সেই প্রাচীন যুগেও বিশেষ চেপে রাখা যায়নি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সংবাদের সূত্র ধরেই ভারতে মুসলমান আক্রমণ শুরু হয়। যখন মহম্মদ-বিন-কাসিম প্রথম সিন্ধু আক্রমণ করেন, এ বিষয়ে ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, সিন্ধু দেশের কিছু অধিবাসী তখন মহম্মদ বিন-কাসিমকে পরোক্ষে সাহায্য করেছিলেন। এইজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন : 'এমন-কি মুসলমান অধিকারেও এই একচেটিয়া অধিকাররাহিত্যরূপ মহা সুফল ফলিয়াছে। আর মুসলমান রাজত্ব-যে প্রকৃত-পক্ষে সম্পূর্ণ মন্দ ছিল তাহাও নহে—জগতের কোনো জিনিসই সম্পূর্ণ মন্দ নহে, কোনো জিনিসই সম্পূর্ণ ভাল নহে। মুসলমানের ভারতাধিকার দরিদ্র পদদলিতদের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল। এইজন্যই আমাদের এক পঞ্চমাংশ ভারতবাসী মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। কেবল তরবারির বলে ইহা সাধিত হয় নাই। কেবল তরবারি ও বন্দুকের বলে ইহা সাধিত হইয়াছিল, একথা মনে করা নিতান্ত পাগলামি মাত্র।' (ভারতে বিবেকানন্দ, ৩২৭-২৮ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথও প্রায় এক জিনিসই লিখেছেনঃ 'ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের কোনো স্বাভাবিক জন্মস্বত্ব নেই। আমরা যখন পাশ্চাত্য জাতীয়তার কথা বলি তখন আমরা ভুলে যাই যে, সেখানকার লোকেদের মধ্যে একজনের প্রতি অন্যের একটি প্রকাশ্য ঘৃণাভাব নেই যা আমাদের বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে আছে। সমগ্র পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত কোথাও আছে কি, যেখানে মানুষে মানুষে রক্তের মিলন সংঘটিত হতে দেওয়া হয় না অথচ সেখানে বলপ্রয়োগ বা

অর্থকরী উদ্দেশ্য ছাড়া তারা পরস্পরের জন্য স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছে?' (ইংরেজির অনুবাদ, ন্যাশনালিজম—১২৪ পৃঃ)

অতএব মুসলমান আক্রমণের প্রথম থেকেই দেশের দরিদ্র পদদলিতেরা মুসলমানদের স্বাগত জানিয়েছিল এবং কয়েকশ' বছরের মুসলমান রাজত্বে দেশের কয়েক কোটি নিপীড়িত অস্পৃশ্য-শূদ্রের দল স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। মুসলমান আক্রমণের সময়ে স্বাভাবিকভাবেই কিছু অত্যাচার হয়েছিল, কিন্তু হিন্দু সমাজের অত্যাচারিত শূদ্র অস্পৃশ্যদের কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ একটা জীবন্ত নরক থেকে মুক্তির পথ হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল।

১০০১ সালে গজনীর মামুদ ভারত আক্রমণ করে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করলেন। কয়েকশ' বছরের মুসলমান রাজত্বে কয়েক কোটি শূদ্র-অস্পৃশ্য মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু সাধারণভাবে মুসলমান-দের সংগে হিন্দুদের অর্থাৎ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সামাজিক মিলন কখনও সম্পূর্ণ হতে পারেনি। তার প্রধান কারণ, অন্য ধর্ম ও সমাজস্থ ব্যক্তিকে আপন সমাজের সংগে আত্মস্থ করে নেবার যে-স্বাভাবিক ক্ষমতা সেটা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানে ভারতবর্ষ থেকে বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল।

এত সামাজিক বিরোধসত্ত্বেও মুসলমান রাজত্বে বহুক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজপতিরা মুসলমান দরবারে মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছিলেন এবং এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলমান নবাব-বংশের সংগে বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপন করেছিলেন।

হিন্দু মুসলমানদের মূল পার্থক্যটি এখানে বলে রাখা দরকার। হিন্দুদের অর্থাৎ উপনিষদের ধর্মের মত এত বড় উদার ধর্ম পৃথিবীতে বিরল। কারণ, উপনিষদে বহু অনার্যের অবদান আছে এবং প্রাক-আর্য প্রভাবে উপনিষদ বহুলাংশে প্রভাবিত। কিন্তু হিন্দু সমাজের মত অনুদার সমাজ ও মুসলমান সমাজের মত উদার সমাজ পৃথিবীতে নেই। উপনিষদের ধর্মের উদার ইঙ্গিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সংগেই এদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়, আবার মুসলমান সমাজের অনুদারতা মূলতঃ বিধর্মীদের প্রতিই প্রযুক্ত হোতো এবং সমাজের অন্তর্ভুক্তদের জন্য যে-উদারতার পটভূমিকা তৈরি হয়ে ছিলো তার তুলনা নেই। হিন্দু ও মুসলমানদের বিবাদ ধর্ম নিয়ে নয়, পরন্তু এটা গোঁড়া হিন্দু-সমাজের সংগে বিধর্মীর প্রতি অসহিষ্ণু গোঁড়া মুসলমান সমাজের দ্বন্দ্ব। হিন্দু সমাজের অর্থাৎ হিন্দু উচ্চবর্ণের চরম সংকীর্ণতা এবং বিধর্মীর প্রতি মুসলমানদের অনীহা কয়েকশত বছরের মুসলমান রাজত্বে হিন্দু ও মুসল-মানের মধ্যে কোনো প্রকৃত মিলন সংঘটিত হতে দেয়নি।

বৌদ্ধযুগে যেমন ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনরভ্যুত্থানের সুযোগের অপেক্ষায় বসেছিল, তেমনি মুসলমান যুগেও মারাঠারা এবং রাজপুতেরা মুসলমান প্রভুত্বের

বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এবং সাধারণভাবে হিন্দুরা মুসলমান প্রভুত্বের অবসানের সুযোগ আসার অপেক্ষায় ছিলেন। সেই সুযোগ এনে দিল ইংরেজ বণিক, ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী।

ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে বাণিজ্য করতেই এসেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা দেশের শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নিল। এতে একশ্রেণীর হিন্দুদের ও বিশেষত বাঙালী-হিন্দুদের উৎসাহ, প্ররোচনা এবং সক্রিয় সাহায্য ছিল সবচেয়ে বেশি। যে মুসলমান প্রভুত্ব হিন্দুরা নিজেদের আয়াসে ধ্বংস করতে পারেন নি—ইংরেজের সাহায্যে এবং বুদ্ধিতে তাঁরা সেই উদ্দেশ্যে সফল হলেন। ধীরে ধীরে মুসলমান প্রভুত্ব লোপ পেল। ইংরেজ হয়ে উঠলো দেশের প্রভু। ১৭৫৭ সালের পলাশি যুদ্ধে মারাঠা নায়ক বালাজী বাজিরাও নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ইংরেজকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন বলে ক্লাইভকে চিঠি লিখেছিলেন। (কর্নেল মেলিসনের লেখা 'লর্ড ক্লাইভ' দ্রষ্টব্য)

হিন্দুরা বিশেষ করে বাঙালী-হিন্দুরা ইংরেজের প্রভুত্বকে শুধু স্বাগত জানালেন তাই নয়, ইংরেজি শিক্ষা, তাদের সংস্কৃতি, তাদের জীবন-দর্শনকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। ওদিকে ইংরেজরা তাদের রাজত্ব কেড়ে নিয়েছে, তাই শত্রুর শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার প্রতি মুসলমান বিমুখ হয়ে রইলেন। বেশিদিন গেলো না—ইংরেজ বিরোধিতার নেতৃত্ব নিলেন মুসলমানদের ওয়াহবী সম্প্রদায়। ওয়াহবীরা মুসলমান রাজত্ব ফিরিয়ে আনবার জন্য দেশে প্রচন্ড সংগ্রাম শুরু করলেন সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিয়ে। কিন্তু যেহেতু তাঁরা মুসলমান রাজত্ব ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছেন, সেই হেতু সাধারণভাবে হিন্দুদের কাছে তাঁরা গ্রহণীয় হলেন না। গোঁড়া ধর্মান্ধ বলে ওয়াহবীদের কাছ থেকে দূরে সরে রইলেন হিন্দুরা। ইংরেজ রাজত্বের আগে ভারতে মুসলমানদের রাজত্বই ছিল, কাজেই মুসলমান রাজত্ব ফিরিয়ে আনার জন্য যদি ওয়াহবীরা সংগ্রাম শুরু ক'রে থাকেন, তাকে ইসলামের পুনরভ্যুত্থানের চেষ্টা বলা ঠিক নয়। কিন্তু হিন্দুরা তাই মনে করলেন এবং ওয়াহবীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে দূরে সরে থাকলেন। ওয়াহবীরা যদিও ইসলামের পুনরভ্যুত্থানের জন্য সংগ্রাম করে থাকেন—এটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, তাঁরা ইসলামের নামে ধর্মীয় কপটাচারের বিরুদ্ধেও প্রবল সংগ্রাম শুরু করেছিলেন।

বাংলায় ওয়াহবীদের নেতা ছিলেন মহম্মদ শরীয়তুল্লা। রংপুর, মালদহ, ফরিদপুর, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুরে ওয়াহবীরা ইংরেজদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। ওয়াহবীদের দমন করবার জন্য ইংরেজরা সৈন্যদল নিয়োগ করেছিলেন এবং কারাগারে এ'দের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হত। ওয়াহবী বিদ্রোহীদের বন্দী রাখবার জন্যই আন্দামানে সেলুলার জেল তৈরি

করা হয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ নরম্যান—আবদুল্লার সহকর্মী আমানুল্লার হাতে কোর্টে ওঠবার সিঁড়িতে ছুরিকাঘাতে নিহত হন। তখনও হাইকোর্ট ভবন তৈরি হয়নি বলে কলকাতার হাইকোর্ট বসতো টাউন হলে।

হিন্দুরা এটা স্বীকার করতে চান না, কিন্তু বাংলার ও পাটনার ওয়াহবী-রাই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের দিশারী ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহেও এঁদের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল এবং যে যে স্থানে সিপাহী বিদ্রোহ ফলপ্রসূ হয়েছিল, তা অনেকটা এই ওয়াহবীদের প্রচেষ্টায় ও সংগঠনে। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে যত ওয়াহবী প্রাণ দিয়েছেন বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, যে কোন পরাধীন জাতির পক্ষেই তা গৌরবের বিষয়। কিন্তু ভারতের ইতিহাস এদের সেভাবে স্বীকৃতি দেয় নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই যে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ-বিচার, এতেই প্রমাণ করে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে হিন্দু ও মুসলমান প্রথম থেকেই দুই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখতেন।

১৮৫৭ সালের সিপাহ বিদ্রোহে প্রথম নেতৃত্ব এসেছিল মুসলমান সিপাহীদের নিকট থেকে। পরে সেটা হিন্দু সিপাহী দলে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে যদি একে আমরা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম মনে করি, সেটাও ঠিক নয়। কারণ, হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতদের মধ্যে বেশির ভাগই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ইংরেজকে সমর্থন ও সাহায্য করেছিলেন। ওদিকে হিন্দু সেনাদল ও হিন্দু সাধারণের ইংরেজের বিরুদ্ধে একটি প্রধান অভিযোগ নিয়ে ইস্তাহার ছাপা হয়েছিল—'ইংরেজদের চোখে অভিজাত ব্যক্তিরা ও ছোটজাতের লোকেরা এক সমান, নিম্নশ্রেণীর লোকেদের সামনে তারা উচ্চ শ্রেণীর লোকেদের অপমান করে, এমনকি অস্পৃশ্য চামারদের অভিযোগে তারা ভদ্রলোক, নবাব ও রাজাদের গ্রেপ্তার করে কিংবা দরবারে তলব করে অপমান করে।' (ইংরেজির অনুবাদ—এ হিস্টরী অফ দি ইণ্ডিয়ান রেভোল্ট—জর্জ ডড, ৪২৭-৪২৮ পৃঃ)

ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য বাড়লো বই কমলো না। তার তিনটি কারণের প্রথমটি হোল, হিন্দু বিশেষ করে বাঙালী-হিন্দু ইংরেজি ভাষার সাহিত্য, দর্শনে পারদর্শিতা লাভ করে ইংরেজি সভ্যতা ও জীবন-দর্শনকে পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করলেন; কিন্তু মুসলমান বিধর্মী শত্রুর ভাষা, সাহিত্য, দর্শনকে পরিত্যাগ করলেন ও মাদ্রাসাগুলিতে ইংরেজি শিক্ষা নিষিদ্ধ করে নির্দেশ জারী করলেন অনেকে। দ্বিতীয়টি হোল, ১৮৪৪ সালে ভারতের ইংরেজ শাসকরা সরকারী দপ্তরে আদালতে এতদিনের প্রচলিত ফার্সী ভাষা তুলে দিয়ে ইংরেজির প্রচলন করলেন এবং

তাতে বহু মুসলমানের জীবিকা নির্বাহের পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ হোল, কিন্তু ইংরেজিনবিশ হিন্দুদের বরাত খুলে গেল। তৃতীয়টি হচ্ছে, ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ-কৃত পার্মানেণ্ট সেটেলমেণ্টে বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ইংরেজের প্রিয়পাত্র হিন্দুরাই বেশিরভাগ জমিদারির মালিক হয়ে বসলেন এবং মুসলমানের বেশিরভাগ—বিশেষতঃ পূর্ব ভারতে—চাষী ও প্রজা হয়ে জমিদারের অত্যাচারের বোঝা বইতে বাধ্য হলেন। ১৮৭৫ সালে স্যার সৈয়দ আহমেদ এই অবস্থাটার দূরীকরণের জন্য আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন বটে, কিন্তু সেটা বেশির-ভাগই সীমাবদ্ধ থাকলো উত্তর ভারতের মুসলমানদের মধ্যে। পূর্ব ভারতের মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের সামাজিক ও শিক্ষাগত পার্থক্য বেড়েই চললো। এইরূপ একটা উপায়হীন নিরাশার অবস্থা মুসলমানদের হিন্দু সাধারণের প্রতি ধীরে ধীরে নিরতিশয় উষ্ণ করে তুলতে লাগলো।

১৮৯৯ সালে ভারতের বড়লাট হয়ে লর্ড কার্জন ভারতীয় সমাজের এই বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থাটির কথা সম্যকরূপে উপলব্ধি করে তার প্রতিবিধানের চেষ্টা করলেন। ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে হিন্দুরা যেভাবে সামাজিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছিলেন, ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করার জন্য মুসলমান ঠিক সেইভাবে পিছিয়ে পড়ছিলেন। হিন্দু ও মুসল-মানের শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত এই বিরাট পার্থক্যটি যতদূর সম্ভব দূর না করতে পারলে, এদের মধ্যে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল এবং সেটাই ভারতবর্ষের জন্য একটি সুষ্ঠু ও সম্মিলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে, পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ঘটনার তীব্রতা অনুভূত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। লর্ড কার্জন সেটা বুঝতে পেরে বাংলা প্রদেশকে দুটি ভাগে ভাগ করবার ব্যবস্থা করলেন। তখন বাংলা বিহার উড়িষ্যা একটি প্রদেশ ছিল। তিনি পশ্চিমবাংলা, বিহার-উড়িষ্যা এবং পূর্ব-বাংলার ও আসামের অংশ বিশেষ নিয়ে দুটি প্রদেশ সৃষ্টি করলেন এবং এইভাবে মুসলমানপ্রধান পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের শিল্প-সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি করে দিলেন। লর্ড কার্জনের এই বিধান তাঁর পক্ষে এমন কি ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার পক্ষে কাল হয়ে উঠলো। সকলেই স্বীকার করেন যে, লর্ড কার্জন ভারতের যোগ্যতম বড়লাটদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। আমাদের দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতি সাধনের জন্য তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা আমাদের পক্ষে আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাব সারা দেশের হিন্দু সমাজকে আলোড়িত করে তুললো। এই আন্দোলন বাংলা থেকে শুরু হয়ে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল।

জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও মানসিক বিভাজন

১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন বাংলা এবং ভারতের সমগ্র হিন্দু সমাজকে আলোড়িত করে তুললো। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে তিনটি সুস্পষ্ট কর্মবিধি রূপায়িত হোলো, যার ফলাফল হোলো সুদূরপ্রসারী। এই আন্দোলনেই প্রথম বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রস্তাব ঘোষণা করা হোলো। দ্বিতীয়তঃ, এই আন্দোলনেই সাধারণভাবে প্রথম সন্ত্রাসবাদ ও ইংরেজ রাজকর্মচারী হত্যাকে দেশপ্রেমের গৌরবময় বহিঃপ্রকাশ বলে মেনে নেওয়া হোলো এবং যাঁরা দেশী-বিদেশী রাজকর্মচারী হত্যা করতে পারলেন বা এমন কি ভুলক্রমে রাজকর্মচারী ভেবে নিরীহ ইংরেজ ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলাকে হত্যা করতে পারলেন—তাঁদের দেশের ও সমাজের নমস্য ও প্রণম্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া হোলো। সন্ত্রাসবাদ শুধু রাজকর্মচারী হত্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো না, সন্ত্রাসের সাহায্যে নিজের বা মুষ্টিমেয়র মত অপরের বা সাধারণের ওপর চাপিয়ে দেওয়াটাও রাজনৈতিক প্রগতির গৌরব অর্জন করলো। তৃতীয়তঃ, এই সন্ত্রাসবাদ বা বিপ্লববাদ আটকে থাকলো শুধু হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে—না পারলো টেনে আনতে সাধারণ জনসমাজকে, না পারলো মুসলমান সমাজকে।

এই তৃতীয় কর্মবিধিটি কার্যকরী হোলো খুব সূক্ষ্মভাবে, যার ফলাফল ভারতের পক্ষে গভীর অমঙ্গলজনক হয়ে উঠলো, যদিও হিন্দু শিক্ষিতেরা এটা এখনও স্বীকার করতে রাজি নন। এই বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ছিল সন্দেহাতীতভাবে মুসলমান-বিরোধী এবং গভীরভাবে মুসলমান স্বার্থের পরিপন্থী। এই আন্দোলনের তাগিদে যে-সকল সন্ত্রাসবাদী বা বিপ্লববাদী নেতা কর্মক্ষেত্রে প্রকাশিত হলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন গভীরভাবে মুসলমান-বিরোধী। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম' বইতে লিখেছেনঃ 'বিপ্লববাদীরা যে-শ্রেণী থেকেই আসুন না কেন, প্রত্যেকেই ছিলেন মুসলমান-বিরোধী।' (ইংরেজির অনুবাদ—৫ পৃঃ)

বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্বের প্রথম সারিতে দাঁড়ালেন, যেমন—তিলক, অরবিন্দ, বিপিন পাল—এঁরা এমন একটা রাজনৈতিক আদর্শের প্রচার আরম্ভ করলেন, যাতে মুসলমানের স্থান পাওয়া অসম্ভব ছিল। এঁরা প্রত্যেকেই রাজনৈতিক আদর্শের ভিতর দিয়ে

হিন্দুধর্ম-দর্শনের মহিমা প্রচার করতে শুরু করে দিলেন।

তিলক 'আর্কটিক হোম ইন দি বেদাস' বইটিতে আগেই লিখেছিলেন যে, 'আর্য হিন্দুরা দেবলোক থেকে এসে প্রথম মর্তে নামেন উত্তর মেরুতে, তারপর ইয়োরোপের মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন পৃথিবীকে একটি সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান গ্রহরূপে তৈরি করবার জন্য এবং তাঁরাই স্বর্গ থেকে মর্তে আসবার সময়ে চতুর্বেদ স্বর্গ থেকে বহন করে আনেন। শিবাজি উৎসব ও গণপতি উৎসবের মধ্য দিয়ে তিনি নিশ্চিতভাবে হিন্দুধর্মের আদর্শকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বপন করেছিলেন এবং এইভাবে সমগ্র মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বসলেন।

অরবিন্দ লিখেছিলেনঃ 'সর্বসাধারণকে আহ্বান করে নিয়ে আসা, ভবিষ্যতের গৌরবকে অতীতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা, ভারতীয় রাজনীতিকে ভারতের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উন্মাদনা দিয়ে সঞ্জীবিত করা—ভারতের বিরাট ও সুতীব্র রাজনৈতিক জাগরণের জন্য এইগুলিই হচ্ছে অপরিহার্য প্রস্তুতি। (স্পিচেস এন্ড রাইটিংস অফ বি জি তিলক—এ্যাপ্রিসিয়েসন বাই অরবিন্দ ঘোষ—ইংরেজি অনুবাদ—৬-৭ পৃঃ)

অরবিন্দ অবশ্য একথাও লিখেছিলেনঃ 'পৃথিবীর মনুষ্য জাতিগুলির মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষের জন্যেই ছিল এক সমুজ্জ্বল দৈব-নির্দেশ যা সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের পক্ষে ছিল অনিবার্য। সমগ্র বিশ্বের ভবিষ্যতের ধর্মবিশ্বাস ভারতবর্ষকেই জন্মদান করতে হবে। যে চিরন্তন ধর্মবিশ্বাস মানুষের সকল ধর্মবিশ্বাসকে এক সূত্রে গেঁথে সমগ্র মানবজাতিকে একক জীবনে পরিণত করবে।' (ইংরেজির অনুবাদ)

অরবিন্দের মধ্যে এই-যে দেশপ্রেমের ধর্মীয় উন্মাদনা এবং ভারতীয় রাজনীতিকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা দিয়ে সঞ্জীবিত করবার যে-প্রচেষ্টা, তা সন্দেহাতীতভাবে হিন্দুধর্ম-দর্শনকে ভারতের রাজনীতিতে চাপিয়ে দেবার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই ধরনের রাজনীতি মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহের প্রশ্ন জাগিয়ে তুললো এবং রাজনীতিতে এই ধরনের সাম্প্রদায়িকতার আমদানি তাদের সচকিত করে তুললো।

বিপিনচন্দ্র পাল এটা আরও পরিষ্কারভাবে বললেন। তিনি লিখলেনঃ 'আমাদের কালে জাতীয় চেতনার ও আশা-আকাঙ্খার নব-জাগরণ প্রাচীনকালে শাক্ত-ধর্মের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, ভবানী এবং প্রাচীন হিন্দু শক্তি-উপাসকের কল্পিত মূর্তি ও অবয়বগুলি এক নূতন রূপে দেখা দিল। এই সকল প্রাচীন ও সনাতন দেব-দেবীগণ—যাঁরা আধুনিক মানুষের মনের উপর সকল রকম প্রভাব হারিয়ে ফেলেছিলেন—তাঁরা দেশবাসীর চিন্তায় ও আত্মায় এক নূতন ঐতিহাসিক ও জাতীয়তা-

বোধক ব্যাখ্যা নিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন। দেশের লক্ষ লক্ষ লোক আজ দেশকে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী বলে পূজা করছেন। এইগুলি আর শুধু পৌরাণিক অলীক সৃষ্টিমাত্র নয়, বা কাল্পনিক জীবমাত্র নয়—এমন কি রাজনৈতিক আদর্শের চিত্রও নয়। এঁরা সেই মাতৃরূপের বিভিন্ন বিকাশ। ভারতের আত্মাই হচ্ছেন এই মাতৃদেবী।...এই মাতৃদেবীর আরাধনা আমাদের সাধারণ আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি। আমাদের সমাজের যৌথ জীবন ও কর্মপ্রণালীর এটাই হচ্ছে আধ্যাত্মকরণ ও চেতনাকরণ। আমাদের সমাজ-মানসের এবং জাতীয় অবয়বের এইটাই চরমতম বিকাশ। আমাদের মনুষ্যত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের সঙ্গে ইহা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।' (সোল অফ ইণ্ডিয়া—ইংরেজির অনুবাদ—১৫৫-১৬১ পৃঃ)

মুসলমানরা যখন রাজনীতিতে 'ইনসাল্লা' ঢোকালেন, তখন আমরা খুব চটেছিলাম। কিন্তু আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমাদের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দেবী দুর্গাকে দেশজননীর বাহ্যিক রূপ বলে প্রচার করে গেছেন এবং অরবিন্দ, তিলক, বিপিন পাল প্রভৃতি সকল নেতাই বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শের পূজারী ছিলেন।

অরবিন্দ ও অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা যে হিন্দু সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা ছিলেন, তারই সমর্থনে সাহিত্যিক গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী লিখেছেনঃ 'আমরা দেখিয়াছি, দেখিতেছি অরবিন্দ এই বঙ্কিমপ্রদর্শিত জাতীয়তাকেই সজ্ঞানে ১৮৯৪ খ্রীঃ হইতেই অনুসরণ করিতেছেন। ব্রাহ্ম সমাজের অথবা মুসলমানের তিনি ধার ধারেন না। তিনি এক পায়ে দাঁড়াইয়া বগলামন্ত্র জপ ও বগলা মূর্তি পূজা শেষ করিয়া আসিয়াছেন।...গুপ্ত সমিতিতে মাকালীও আছেন এবং শ্রীগীতাও আছে। এতে মুসলমান ভ্রাতাগণ যদি বলেন যে,—'এ ব্যবস্থায় দেশ উদ্ধারের জন্য আমরা যাই-ই বা কী করিয়া, আর থাকি-ই বা কোন মুখে? আমাদের ত একটা পৃথক ধর্ম ও তার অনুশাসন আছে'—এ কথার জবাব ত চরমপন্থীদের ওই গুপ্ত সমিতির দেওয়াই কর্তব্য।

চরমপন্থী রাজনীতি ও বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি উভয়ই হিন্দু জাতীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দুই সম্প্রদায়ই ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ প্রচার করেন নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের সাম্প্রদায়িক মতবাদ ও অনুষ্ঠানকে ইঁহারা যেন প্রাণপণে টানিয়া আনিয়াছেন। ভাবিয়াছিলেন যে, ইহার দ্বারাই তাড়াতাড়ি কার্য উদ্ধার হইয়া যাইবে। আমার বলিবার কথা—১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে অরবিন্দ, গুপ্ত অথবা প্রকাশ্য—এই দুই প্রকার রাজনীতিতে প্রবেশ করিবার মুখেই কংগ্রেসী জাতীয়তাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। হিন্দুয়ানী ও হিন্দু সাধনাবর্জিত কংগ্রেসী বস্তুতন্ত্রহীন জাতীয়তা অরবিন্দ রাজনীতি

ক্ষেত্রে প্রবেশমুখেই বর্জন করিয়াছেন। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাই অরবিন্দের জাতীয়তা, কংগ্রেসী জাতীয়তা তাঁহার জাতীয়তা নহে, বরং জাতীয়তার বিপরীত বস্তু।' (শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ—৪৫২-৫৩ পৃঃ)

বঙ্কিম-অরবিন্দ-বিপিন পাল এবং তাঁদের উত্তরসূরী বিপ্লববাদীরা বাংলায় এবং তিলক ও তাঁর উত্তরসূরীরা মহারাষ্ট্র ও উত্তর ভারতে যে জাতীয়তার আমদানি করলেন, তা ছিল নিছক হিন্দু সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ। মুসলমানগণ স্বভাবতই এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে ১৯০৫ সাল হতে শুধু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন তা নয়—তাঁদের মধ্যেও ধর্মীয় বিষে বিষাক্ত রাজনীতির উন্মেষ হোলো।

এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বহুবার তাঁর মত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে গেছেন। ১৯২২-এ তিনি লিখেছেনঃ 'আমাদের দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল তখন আমি তার মধ্যে ছিলাম। মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেয়নি, বিরুদ্ধে ছিল। জননায়কেরা কেউ কেউ ক্রুদ্ধ হয়ে বলিছিলেন—ওদের একেবারে অস্বীকার করা যাক। জানি, ওরা যোগ দেয়নি। কিন্তু কেন দেয়নি? তখন বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে এত প্রবল যোগ হয়েছিল যে সে আশ্চর্য। কিন্তু এতো বড়ো আবেগ শুধু হিন্দু সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রইল, মুসলমান সমাজকে স্পর্শ করল না। সেদিনও আমাদের শিক্ষা হয়নি। পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের ডোবাটাকে আমরা সমাজের দোহাই দিয়ে গভীর করে রেখেছি।...

আমি যখন আমার জমিদারী সেরেস্তায় প্রথম প্রবেশ করলেম তখন একদিন দেখি, আমার নায়েব তাঁর বৈঠকখানার এক জায়গায় জাজিম খানিকটা তুলে রেখে দিয়েছেন। যখন জিজ্ঞেস করলেমঃ 'এ কেন'? তখন জবাব পেলাম, যে-সব সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায়, তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। এক তক্তপোষে বসাতেও হবে অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক। এ প্রথা তো অনেকদিন ধ'রে চলে এসেছে, হিন্দুও মেনে এসেছে। মুসলমানও মেনেছে। জাজিম-তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, জাজিম-পাতা আসনে অন্যে বসেছে। তারপর ওদের ডেকে একদিন বলেছিঃ আমরা ভাই, তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চলতে হবে। তখন হঠাৎ দেখি, অপরপক্ষ লাল টকটকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, আমরা পৃথক। আমরা বিস্মিত হ'য়ে বলি, রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়? বাধা ঐ জাজিম-তোলা আসনের মস্ত ফাঁকটার মধ্যে। ওটা ছোটো নয়। ওখানে অকূল অতল কালাপানি। বক্তৃতামঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিলেই পার হওয়া যায় না।' (রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খন্ড, ৩৩-৩৪ পৃঃ)

বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে দেশের হিন্দু নেতারা যে অন্ধ রাজনীতির অনুসরণ করেছিলেন, তার নিন্দা করে ডঃ আম্বেদকর লিখেছেনঃ 'বাঙালী হিন্দুদের বাংলা বিভাগের বিরোধিতা করার প্রধান কারণ ছিল, পূর্ববঙ্গে বাঙালী মুসলমানেরা যাতে যোগ্য স্থান না পেতে পারে সেই আকাঙ্ক্ষার দরুণ। বাঙালী হিন্দুরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে, বাংলা বিভাগের বিরোধিতা ক'রে এবং সেই সঙ্গে স্বরাজলাভের দাবি ক'রে তাঁরা একদিন মুসলমানদের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের শাসক করে তুলবেন।' (পাকিস্তান অর পার্টিশন অফ ইণ্ডিয়া—ইংরেজির অনুবাদ, ১১০ পৃঃ)

১৯০৫-এর বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষে সৃষ্টি করলো দুটি জাতীয়তাবাদ—একটি হিন্দু, অপরটি মুসলমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হোলো নিখিল ভারত মুসলিম লীগ।

১৯০৬ সালের সুরাট কংগ্রেসে যখন তিলক, অরবিন্দ প্রভৃতি চরমপন্থী নেতারা নরমপন্থীদের অপসারিত করে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিকে দখল করলেন, তখন স্বভাবতই এ'দের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কংগ্রেসকেও প্রভাবিত করলো। ১৯০৬ সালেই কংগ্রেস সাধারণভাবে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ালো এবং তারই প্রতিযোগী হিসাবে দাঁড়ালো নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ।

হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক বিভাজন

চরমপন্থী বা অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের প্রচারণায় শুধু যদি হিন্দু দেব-দেবীকে দেশ-জননীর মূর্ত প্রকাশ বলে উল্লেখ থাকতো, তাহ'লে মুসলমানেরা অতটা ভয় পেতেন না। কিন্তু চরমপন্থীরা দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে আরও একটি নতুন জিনিসের অনুপ্রবেশ ঘটালেন। সেটা হচ্ছে ফাসিস্ত মনোবৃত্তি। তাঁদের কর্মধারার অঙ্গ হিসাবে শুধু সরকারী কর্মচারী হত্যা করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। বলপ্রয়োগে বা ভয় দেখিয়ে দেশের লোককে তাঁদের নিজেদের মতের অনুবর্তী করাও তাঁদের কর্মসূচীর একটা প্রধান অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়ালো। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন, সেটা মনে রাখা দরকার। তিনি লিখেছিলেনঃ 'দেশের যে সকল লোক গুপ্ত পন্থাকেই রাষ্ট্র-হিতসাধনের একমাত্র পন্থা বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহাদিগকে গালি দিয়াও কোনো ফল হইবে না এবং তাহাদের ধর্মোপদেশ দিতে গেলেও তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। আমরা যে যুগে বর্তমান, এ যুগে ধর্ম যখন রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নিকট প্রকাশ্যভাবে কুণ্ঠিত, তখন এরূপ ধর্মভ্রংশতার যে দুঃখ তাহা সমস্ত মানুষকেই নানা আকারে বহন করিতেই হইবে, রাজা ও প্রজা, প্রবল ও দুর্বল, ধনী ও দরিদ্র কেহ তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না।...

'দুঃখ সহ্য করা তত কঠিন নহে, কিন্তু দুর্মতিকে সম্বরণ করা অত্যন্ত দুরূহ। অন্যায়কে অত্যাচারকে একবার যদি কর্মসাধনের সহায় বলিয়া গণ্য করি, তবে অন্তঃকরণের বিকৃতি হইতে রক্ষা করিবার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তি চলিয়া যায়, ন্যায়ধর্মের ধ্রুব কেন্দ্রকে একবার ছাড়িলেই বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে, কর্মের স্থিরতা থাকে না, তখন বিশ্বব্যাপী ধর্ম ব্যবস্থার সংগে আবার আমাদের ভ্রষ্ট জীবনের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য প্রচণ্ড সংঘাত অনিবার্য হইয়া ওঠে।.....

'সেই প্রক্রিয়া কিছুদিন হইতে আমাদের দেশে চলিতেছে একথা নম্রহৃদয়ে দুঃখের সহিত আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। এই আলোচনা আমাদের পক্ষে একান্ত অপ্রিয়, তাই বলিয়া নীরবে ইহাকে গোপন করিয়া অথবা অত্যুক্তি দ্বারা ইহাকে ঢাকা দিয়া অনিষ্টকে সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে দেওয়া আমাদের কাহারও পক্ষে কর্তব্য নহে। আমরা সাধ্যমত বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার না

করিয়া দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও উন্নতি সাধনের প্রাণপণে চেষ্টা করিব। ইহার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিব এমন আশঙ্কা করিবেন না।.....

'তথাপি দেশে বিদেশী পণ্যের পরিবর্তে স্বদেশী পণ্য প্রচার যত বড় কাজই হউক লেশমাত্র অন্যায়ের দ্বারা তাহার সমর্থন করিতে হইবে একথা আমি কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারি না।... কিন্তু হায়, মনে নাকি ভয় আছে যে, মুহূর্তের মধ্যে ম্যাঞ্চেস্টারের কল যদি বন্ধ করিয়া দিতে না পারি, তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দুঃসাধ্য উদ্দেশ্য অটল নিষ্ঠার সহিত বহন করিবার শক্তি আমাদের নাই, সেইজন্য এবং কোনোমতে হাতে হাতে পার্টিশনের প্রতিশোধ লইবার তাড়নায়, আমরা পথ-বিপথ বিচার করিতেই চাই নাই।...

'আমরা অনেকে সম্পূর্ণ জানি না এবং অনেকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক যে, বয়কট ব্যাপারটা অনেক স্থানে দেশের লোকের প্রতি দেশের লোকের অত্যাচারের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। আমি যেটাকে ভালো বুঝি, দৃষ্টান্ত ও উপদেশের দ্বারা অন্য সকলকে তাহা বুঝাইবার বিলম্ব যদি না সহে, পরের ন্যায্য অধিকারে বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করাকে অন্যায় মনে করিবার অভ্যাস যদি দেশ হইতে চলিয়া যাইতে থাকে, তবে অসংযমকে কোনো সীমার মধ্যে আর ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কর্তব্যের নামে যখন অকর্তব্য প্রবল হয় তখন দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে। সেইজন্যই স্বাধীনতা লাভের দোহাই দিয়া আমরা যথার্থ স্বাধীনতা-ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছি, দেশের মতের অনৈক্য ও ইচ্ছার বিরোধকে দণ্ড উত্তোলন করিয়া বলপূর্বক একাকার করিয়া দিতে হইবে, এইরূপ দুর্মতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমি যাহা করিব সকলকেই তাহা করিতেই হইবে, আমি যাহা বলিব সকলকেই তাহা বলিতেই হইবে, এইরূপ বলপ্রয়োগে দেশের সমস্ত মত, ইচ্ছা ও আচরণ বৈচিত্র্যের অপঘাত মৃত্যুর দ্বারা পঞ্চত্ব লাভকেই আমরা জাতীয় ঐক্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছি। মতান্তরকে আমরা সমাজে পীড়ন করিতেছি, কাগজে অতি কুৎসিতভাবে গালি দিতেছি এমন কি শারীরিক আঘাতের দ্বারাও বিরুদ্ধ মতকে শাসন করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছি। আপনারা নিশ্চয় জানেন এবং আমিও ততোধিক নিশ্চয়তররূপে জানি, এরূপ বেনামি শাসনপত্র সময় বিশেষ আমাদের দেশের অনেক লোকই পাইয়া থাকেন এবং দেশের প্রধান ব্যক্তিরাও অপমান হইতে রক্ষা পাইতেছেন না। জগতে অনেক মহাপুরুষ বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে মত প্রচারের জন্য নিজের প্রাণও বিসর্জন করিয়াছেন, আমরাও মত প্রচার করিতে চাই, কিন্তু আর সকলের দৃষ্টান্ত পরিহার করিয়া একমাত্র কালাপাহাড়কেই গুরু বরণ করিয়াছি।' ('পথ ও পাথেয়'—রাজা ও প্রজা পুস্তক হতে)

অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের এই ফ্যাসিস্ত মনোবৃত্তি মুসলমানদের মনে

সন্দেহ ও ভীতির সঞ্চার করেছিল সেই ১৯০৫ সাল থেকেই এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান স্রোত থেকে তাঁরা প্রায় সেই সময় থেকেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন। চরমপন্থী বা বিপ্লববাদীরাও সাধারণভাবে মুসলমানদের বাদ দিয়েই স্বাধীনতা আন্দোলন চালাতে মনস্থ করেছিলেন। ১৯০৫ সাল থেকেই চরমপন্থী বা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরাই কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। সেই হেতু হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটি রাজনৈতিক পার্থক্য পাকা হয়ে দাঁড়ালো।

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গান্ধীজী দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই এই পরিস্থিতির অত্যন্ত বিপজ্জনক ফলাফল সবন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। চরমপন্থীরা ভেবেছিলেন, মুসলমান না এলেও ক্ষতি নেই, তাঁরাই একা স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। কিন্তু গান্ধীজী দেখলেন, মুসলমানদের সমর্থন না পেলে ভারতের স্বরাজ আন্দোলন সম্পূর্ণ সফল হতে পারবে না। কি করে স্বরাজ আন্দোলনকে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত আন্দোলনে রূপান্তরিত করা যায়, তিনি তার পথ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

সুযোগও তিনি একটা পেয়ে গেলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিজয়ী মিত্রপক্ষের নেতা হিসাবে ইংরেজরা তুরস্ককে দুই ভাগে ভাগ করে দেবার প্রস্তাব করেন এবং বিশ্ব মুসলমান সমাজের ধর্মগুরু তুরস্কবাসী খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেন। ভারতের মুসলমান সমাজ মনে করলেন, ইংরেজরা অন্যায়ভাবে তাঁদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন। মুসলমান-দের তরফ থেকে খিলাফৎ কমিটি ঠিক করলেন, বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দাবিগুলি তাঁর কাছে উপস্থাপিত করবেন,— দাবি না মানলে সারা ভারতবর্ষে আন্দোলন করা হবে।

১৯২০-র ১লা আগষ্ট খিলাফৎ কমিটির অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার কথা ছিল। গান্ধীজী এই খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে রাজি হয়ে যান। কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলনের উদ্যোক্তারা মৌলানা মহম্মদ আলি ও মৌলানা শওকাত আলির নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগের প্রস্তাব আগেই গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি তাঁরা প্রকাশ্য সভায় প্রস্তাব পাশ করে মুসলমান জনসাধারণকে ভারতস্থ ইংরেজ সেনাদল থেকে পদত্যাগ করে ভারতীয় আর্মির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে স্বধর্ম রক্ষার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। এটা ছিল প্রকাশ্য রাজদ্রোহ। আলি ভ্রাতৃদ্বয় এর আগেই রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে অন্তরীণ জীবন-যাপন করে এসেছিলেন।

গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাঁর বৃহত্তর অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমানদের সহযোগিতা লাভ করা। কিন্তু হিন্দু

সাধারণ এবং বেশির ভাগ নেতৃস্থানীয় হিন্দু খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দিতে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না এবং এর সংস্পর্শ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। মডার্ন রিভিউ-এর সম্পাদক বিখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ-বিষয়ে একটু ব্যঙ্গ করেই লিখেছিলেনঃ 'মৌলানা মহম্মদ আলি ও মহাত্মা গান্ধী—এই দুজনের বক্তৃতা খুঁটিয়ে পড়লে এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, তাঁদের একজনের পক্ষে সুদূর তুরস্কে খিলাফতের দুরবস্থার কথাই প্রধান বিবেচ্য, কিন্তু অন্য জনের পক্ষে ভারতের স্বরাজলাভই প্রধান লক্ষ্য।' (ইংরাজির অনুবাদ)

গান্ধীজী কিন্তু এর খুব হাস্যকর একটি জবাব দিয়েছিলেনঃ 'আমি দাবি করছি যে, আমাদের উভয়ের পক্ষেই খিলাফৎই প্রধান বিবেচ্য, মৌলানা মহম্মদ আলির পক্ষে, কারণ যে এইটাই তাঁর ধর্ম, আর আমার পক্ষে কারণ যে, খিলাফতের জন্যে জীবনদান করতে পারলে আমি বা আমার ধর্ম অর্থাৎ গরুদের মুসলমান ছুরিকাঘাত থেকে বাঁচাতে পারবো।' (ইংরেজির অনুবাদ—২০।১০।১৯২০ ইয়ং ইন্ডিয়া)

এটা স্বীকার করতেই হবেঃ মৌলানা মহম্মদ আলি বলেছিলেন, "কোরাণে এমন কথা কোথাও লেখা নেই যে মুসলমানদের ধর্মীয় বিধি রক্ষার জন্য গোহত্যা করতেই হবে।" তাঁর আবেদনে, সারা ভারতের মুসলমান কসাইরা হাজার হাজার গরুকে মুক্ত করে দিয়েছিল।

কিন্তু গান্ধীজীর অভিলাষ সফল হতে পারেনি। তিনি মৌলানা মহম্মদ আলিকে সঙ্গে নিয়ে খিলাফৎ আন্দোলনের সমর্থনে সারা ভারতময় প্রচার করে বেড়িয়েছিলেন, তবুও হিন্দু জনসাধারণকে এই আন্দোলনে আকৃষ্ট করতে পারেন নি। আবার আরও একটা ব্যাপারে এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা গিয়েছিল। কংগ্রেসের নেতারা প্রায় একবাক্যে বললেন, ডোমিনিয়ন স্টেটাস পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে ভালো, কিন্তু খিলাফৎ-এর মুসলমান নেতারা বললেন, পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য।

গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু সকলেই একবাক্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশীদার হয়ে স্বাধীনতা লাভ বা ডোমিনিয়ন স্টেটাস পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের চেয়ে মহত্তর। ১৯২৪-এর বেলগাঁও কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণে গান্ধীজী বলেছিলেনঃ 'আমার মতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি তাঁদের কথা মত কাজ করেন এবং সততার সঙ্গে আমাদের তাঁদের সমান হতে সাহায্য করেন, তাহলে ব্রিটিশ সংস্রব সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন না করাই হবে আরও বিরাট জয়।' (ইংরেজির অনুবাদ)

১৯২৫-এ ফরিদপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি হিসাবে

চিত্তরঞ্জন বলেছিলেনঃ 'আমার মনে হয়, পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য কমন ওয়েলথের ভিতর থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতের প্রচেষ্টা চালানো উচিত যাতে সে বিশ্ব মানবসমাজের সেবা করতে পারে।' (ইংরেজি থেকে)

১৯২৮-এ কলকাতা কংগ্রেসে মতিলাল বলেছিলেনঃ 'আমার কাছে এইটাই মূল্যবান যে, ডোমিনিয়ন স্টেটাসে এমন অনেকটা স্বাধীনতা লাভ করা যায় যা পূর্ণ স্বাধীনতার কাছাকাছি এবং সব দিক দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে বেশী গ্রহণীয়।' (ইংরেজী থেকে)

এমন কি স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু যিনি ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করবার জন্য দাবি জানিয়েছিলেন, তিনিও আগে মতিলাল নেহরু কমিটির সদস্য হিসাবে ডোমিনিয়ন স্টেটাসই ভারতের লক্ষ্য বলে সেই কমিটি রিপোর্টে নিঃশর্ত সই দিয়েছিলেন।

ওদিকে ১৯২১-এর সর্বভারতীয় খিলাফৎ সম্মেলনে আজাদ শোভানি প্রস্তাব করেছিলেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য এবং সে প্রস্তাব পরে পাশও হয়।

১৯২৮-এর সর্বভারতীয় খিলাফৎ সম্মেলনে মৌলানা মহম্মদ আলি বলেছিলেনঃ 'সর্বদলীয় সম্মেলনে আমি বলেছিলাম যে, ভারতের চাই পূর্ণ স্বাধীনতা এবং তাতে কোনো সাম্প্রদায়িকতা ছিল না, তবুও আমাকে পদে পদে হয়রান করা হয়েছিল। এবং বারে বারে আমাকে বক্তৃতা বন্ধ করে দিতে হয়েছিল।... মতিলাল নেহরুর রিপোর্টের উপক্রমণিকায় দাসত্বের বন্ধনকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং মতিলাল নেহরুর প্রস্তাবটি ছিল সবচেয়ে জঘন্য। সর্বদলীয় সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ আনসারি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর হাতের একটি পুতুল মাত্র ছিলেন। আর ওই মিঃ জে এম সেনগুপ্তও সেই পোষাকই পরেছেন। এই সেদিন তাঁরা প্রস্তাব পাশ করেছিলেন যে, যদি সম্ভব হয় ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যুক্ত থেকেই স্বরাজ লাভ করতে হবে, কিন্তু প্রয়োজন হলে তার বাইরে গিয়েও স্বরাজ লাভ দাবি করতে হবে। এতদিনে বলবার সময় এসেছে যে, আমাদের স্বরাজ হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতার বাইরে, তবুও মতিলাল নেহরু বলছেন, ডোমিনিয়ন স্টেটাসই স্বাধীনতা... আমি ঘোষণা করছি যে, ভারতীয় মুসলমানদের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।' (ইণ্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিষ্টার ১৯২৮ ভলিয়ুম ২, ইংরেজির অনুবাদ)

কংগ্রেসে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও হিন্দু-মুসলিম চুক্তি

আরও একটি ব্যাপারে খিলাফৎ আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের বিশেষ করে গান্ধীজীর গভীর পার্থক্য ছিল। গান্ধীজী বারে বারে বলেছেন ও লিখেছেন যে গ্রাম-স্বরাজই কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য এবং দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তির স্বরাজ না হলে সে স্বরাজের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু তাঁর কথায় ও কাজে অনেক সময়ে মিল থাকতো না।

তাঁর দ্বারা পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের কৃষক, গ্রামবাসী ও খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের যোগ দেবার কোনো অবকাশ তিনি রাখেন নি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য তাদের আহ্বানও জানান নি। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজী ত্রি-বর্জন নীতি ঘোষণা করেছিলেন, অর্থাৎ আইনসভা, আদালত ও সরকারী স্কুল-কলেজ বর্জন করতে হবে। ১৯২১-এ ভারতে শিক্ষিতের হার কতটা ছিল বিবেচনা করুন এবং স্পষ্টতঃ গান্ধীজী তাঁর বহুল প্রচারিত অসহযোগ আন্দোলন এই অল্প শতাংশ শিক্ষিতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। কৃষক, গ্রামবাসী ও খেটে-খাওয়া মানুষ আইনসভা, আদালত ও স্কুল কলেজের সংগে কোনো সম্পর্ক রাখতো না। কাজেই তাঁদের পক্ষে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কোনো অবকাশই গান্ধীজী রাখেননি। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ১৯২১-এর ৩১শে ডিসেম্বরই স্বরাজ লাভ হবে এবং ওদিকে স্বরাজ আন্দোলনে ডাক দিয়েছিলেন দেশের তিন-শতাংশ শিক্ষিত ও অর্থবান সম্প্রদায়কে।

বাংলার বীরেন্দ্রনাথ শাসমল গান্ধীজীর আন্দোলনের এই অসংগতিটুকু প্রথমেই ধরতে পারেন এবং সেইজন্য ভারতবর্ষে তিনিই সর্বপ্রথম কৃষক গ্রামবাসীর গণ-আন্দোলন হিসাবে মেদিনীপুর ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করেন ও গ্রামবাসীদের চৌকিদারী ট্যাকস দিতে নিষেধ করেন। তাঁর অপূর্ব সংগঠন শক্তির মহিমায় তখনকার সরকার অবশেষে সমগ্র মেদিনীপুর থেকে ২২৭টি ইউনিয়ন বোর্ড তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। চৌকিদারী ট্যাক্স বিলুপ্ত হয়েছিল। এই আন্দোলন সম্বন্ধে কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক জে জি ব্রুমফিল্ড লিখেছেন "ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে এত খোলাখুলিভাবে ও ফলাফলের পরোয়া না করে লড়াইয়ের আহ্বান এর আগে কেউ জানায়নি।" (এলিট কর্ণফ্লিক্ট ইন প্লুরাল সোসাইটি)। কিন্তু কংগ্রেস নেতার বেশির ভাগ ছিলেন জমিদার। তাঁরা এই আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করেছিলেন

কারণ, গ্রামবাসী ও কৃষকদল সংগঠিত হচ্ছে দেখে তাঁরা ভয় পেয়ে যান। জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছেন যে, পাছে জমিদারর চটে যায়, সেই ভয়ে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনে গ্রামবাসীদের কর বন্ধের প্রকল্প কার্যকরী হতে দেন নি। কংগ্রেসের জমিদারদের সহযোগী নেতার তাই বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে বহিষ্কার করেন এবং এতবড় গণ-আন্দোলনের কথা কোনো ঐতিহাসিক তাঁর বইতে উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। কৈরা বা চম্পারণ সত্যাগ্রহ নিছক স্থানীয় অভিযোগের প্রশ্নে চালানো হয়েছিল—অসহযোগ আন্দোলনের সংগে এদের যুক্ত করা চলে না।

গান্ধীজী ও কংগ্রেস যে একেবারের নিচের তলার লোকদের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন টেনে নিয়ে যেতে পারেন নি—এটাই গান্ধীজীর ও কংগ্রেস নেতৃত্বের চরম ব্যর্থতা। আজ পর্যন্ত আমাদের সকল আন্দোলন তাই শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই আটক থেকে গেছে। এমন কি ৩০-এর লবন সত্যাগ্রহেও গ্রামবাসীর চেয়ে শহরের শিক্ষিত লোকই বেশি কারাবরণ করেছিলেন।

খিলাফৎ আন্দোলনের মুসলমান নেতারা যতদূর সম্ভব এই অসংগতি দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন। আগেই বলেছি, ১৯২১-এর ১০ই জুলাই সর্বভারতীয় খিলাফৎ সম্মেলন ঘোষণা করেছিলো যে, ভারতীয় আর্মিতে যে সব মুসলমান সৈন্য আছেন তাঁদের পক্ষে ভারতীয় আর্মিতে থাকা বা যোগ দেওয়া ইসলামধর্ম বিরোধী (ইন্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিষ্টার ১৯২১, ইংরেজির অনুবাদ ভলিয়ুম ২, ১৭৩ পৃঃ)। ১৯২১-এ মৌলানা মহম্মদ আলি সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন প্রস্তাবে বলেছিলেনঃ 'মহাত্মা গান্ধী ও যাঁরা তাঁর ধর্মমতে বিশ্বাস করেন তাঁরা গভর্নমেণ্টের সংগে সংগ্রামকে শান্তিপূর্ণ পথে চালাতে চান কিন্তু মুসলমান ধর্ম বলে যে, অন্যায়কে যদি হিংসার সাহায্য ব্যতিরেকে নির্মূল করা না যায় তাহলে হিংসা দিয়েই তাকে নির্মূল করা উচিত। যদি শান্তিপূর্ণ পথ কার্যকরী না হয় তাহলে প্রয়োজন হলে হিংসার ব্যবহার করতে হবে।' (ইন্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিষ্টার ১৯২১ ভলিয়ুম ২, ২৩১ পৃঃ—ইংরেজির অনুবাদ)

খিলাফৎ আন্দোলনের নেতারা তাঁদের আন্দোলনকে সর্ব শ্রেণীতে ছড়িয়ে দিয়ে খুব ব্যাপক করে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন, যেটা কংগ্রেস নেতারা পারেন নি বা করেন নি।

এইজন্যই গান্ধী-যুগে ভারতে অনেক বড় নেতা জন্মেছিলেন বটে, কিন্তু ভালো কর্মী সৃষ্টি হয় নি। যে শ্রেণীর লোক নেতা হতে চায়—গান্ধীজী

তাঁর সকল আন্দোলনে সেই শ্রেণীর উপরই বেশি নির্ভর করতেন এবং কর্মী তৈরি হয় যে.শ্রেণী থেকে সেই নিচের তলার লোকদের তাঁর আন্দোলনে যোগ দেবার কোনো অবকাশ রাখতেন না। ৩০-এর লবণ সত্যাগ্রহে গান্ধীজী অনেকটা এই ভুল শোধরাবার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু এই সত্যাগ্রহেও ভদ্রলোক শ্রেণীই বেশী সংখ্যায় যোগ দিয়েছিলেন এবং কৃষক গ্রামবাসীর সংখ্যা তুলনায় অনেক কম ছিল।

এই কারণেই গান্ধীজীকে আরও একটি জিনিস মেনে নিতে বাধ্য হতে হয়েছিল যা তাঁর জীবন দর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী। অসহযোগ আন্দোলনে নেতার সংখ্যা বেড়ে গেল বটে, কিন্তু কর্মী বলতে প্রায় কেউই রইলেন না। কারণ, কর্মী তৈরির কোনো প্রকল্পই তখন নেয়া হয়নি। কিন্তু কর্মী না হলে কোনো সংগঠন চালানো যায় না। বাংলায় চিত্তরঞ্জন দাশ এই অভাবটি দূর করবার জন্যে স্বদেশী যুগের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের ডেকে এনে কংগ্রেসের ভার তুলে দিলেন তাঁদের হাতে। মেদিনীপুরে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলনে কৃষক গ্রামবাসীদের এক বিরাট কর্মী সংগঠন তৈরি করেছিলেন, যে সংগঠনের বুনিয়াদ শক্ত থাকার দরুণ মেদিনীপুরে স্বাধীনতা সংগ্রাম বারে বারে অপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। কিন্তু পাছে তিনি সারা বাংলায় নিচের তলার মানুষকে অর্থাৎ কৃষক-গ্রামবাসী খেটে-খাওয়া মানুষকে সংগঠিত করে তোলেন, সেই ভয়ে চিত্তরঞ্জন তাঁকে সরিয়ে দিয়ে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের হাতেই কংগ্রেসের পূর্ণ পরিচালন ভার তুলে দিলেন। নিচের তলার কর্মীর অভাব শুধু বাংলায় নয় সারা ভারতেই ছিল। এইভাবে শুধু বাংলায় নয়, উত্তর ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই কংগ্রেসের পরিচালন ভার ধীরে ধীরে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের হাতে চলে গেল। কিন্তু এঁরা সকলেই প্রধানতঃ ছিলেন মুসলমান বিরোধী এবং স্বভাবতই অন্তরে অন্তরে অহিংসা মন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না।

গান্ধীজী শীঘ্রই এর প্রমাণ পেলেন ১৯২৪ সালে আহমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে। এই অধিবেশনে গোপীনাথ সাহা কর্তৃক কলকাতায় এক নিরপরাধ ইংরেজকে হত্যা করার নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করলেন স্বয়ং গান্ধীজী। চিত্তরঞ্জন এই প্রস্তাবের সংশোধনী আনলেন। তাতে বলা হোলো যে, হত্যাকাণ্ড নিন্দনীয় হলেও গোপীনাথ সাহা দেশপ্রেমের প্রেরণাতেই ইংরেজ হত্যা করেছিলেন। চতুর আইনবিদ চিত্তরঞ্জন ঘুরিয়ে বলতে চাইলেন যে, হত্যাকাণ্ড খারাপ হতে পারে কিন্তু দেশপ্রেমের প্রেরণায় হত্যাকাণ্ড চলতে পারে। গান্ধীজী ৭৮ ভোট পেলেন, চিত্তরঞ্জন পেলেন ৭০। নিখিল ভারত কংগ্রেসের ১৪৮ জন সদস্যের প্রায় অর্ধেক রায় দিলেন যে, দেশপ্রেমের প্রেরণায় হত্যাকাণ্ড চলতে পারে। অর্থাৎ, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তখন কংগ্রেস প্রতি-

ষ্ঠানটির প্রায় অর্ধেক কব্জা করে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁরাই কর্মী-স্থানীয় ছিলেন এবং অন্যান্যরা ছিলেন নেতা। কাজেই কংগ্রেসের মধ্যে তাঁদের প্রভাব কত গভীর হয়ে উঠেছিলো, সেটা বুঝতে কষ্ট হওয়া উচিত নয়। ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসেও এই রকমটি ঘটেছিলো। সেখানে গান্ধীজী বড়লাট লর্ড আরউইনের উপর বোমা আক্রমণের নিন্দা করে প্রস্তাব আনলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেসের ১১৭ জন সদস্য নিন্দা-প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেন, ৬৯ জন বিপক্ষে। ৬৯ জন কংগ্রেস সদস্য পরোক্ষে বড়লাটের প্রতি বোমা আক্রমণকে সমর্থন জানালেন।

এই যে কংগ্রেসের কর্মীদলে বেশিরভাগ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রায় একচ্ছত্র প্রাধান্য হয়ে গেল, গান্ধীজী এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারলেন না। কারণ, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে সংগ্রামের প্রধান সেনাপতি হিসাবে সে পথে যেতে তিনি সাহস করেন নি। এই কারণেই ওয়েভেল বারবার তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখেছেন যে, গান্ধীজী অন্তরে অন্তরে হিংসাকে সমর্থন করতেন, শুধু মুখে অহিংসার কথা বলতেন। গান্ধীজী সম্বন্ধে ওয়েভেলের এই কঠোর মন্তব্য সমর্থনীয় নয়। কিন্তু গান্ধীজী কংগ্রেসে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রাধান্য লঘু করবার জন্য কোনো চেষ্টা কখনও করেন নি।

কংগ্রেসের বহু প্রথম সারির নেতা জেলে যেতেন এবং লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিতেন, কিন্তু দেশের খুব সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ একদম ছিল না। কারণ, বেশির ভাগ নেতাই শহরের চৌহদ্দির মধ্যে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন, গ্রামাঞ্চলে একদম যেতেনই না। গেলেও যতদূর মোটর গাড়ি যায় তার বেশি যেতেন না। এমন কি চিত্তরঞ্জন বা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বেরও দৌড় ছিল ততদূর পর্যন্ত যতদূর মোটর গাড়ি যায়। অতএব এইসব নেতাদের নেতৃত্ব বজায় রাখবার জন্য সর্বসময়েই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী কর্মীদের উপর নির্ভর করতে হোতো। এবং তাঁরা কোনো কারণেই বিপ্লববাদী কর্মীদের চটাতে সাহস করতেন না। আমি দেখিয়েছি, মৌলানা আজাদ তাঁর বইতে লিখেছেনঃ সকল শ্রেণীর রেভলিউশনারিরা মুসলিম বিরোধী ছিলেন। ১৯২৬-এ এক চিঠিতে মতিলাল নেহরু জওহরলালকে লিখেছিলেনঃ 'দুর্ভাগ্যবশতঃ, বাঙালি রেভলিউশনারিরা চরমভাবে সাম্প্রদায়িক।' (এ বাণ্ড অফ ওল্ড লেটার্স দেখুন)

তাহলে, ১৯২১ সালেও অর্থাৎ গান্ধীযুগেও একটি সুসংগঠিত মুসলমান বিরোধী কর্মী দল কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যার অর্ধেক স্থান দখল করে বসলেন এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে তাঁদের গুরুত্ব হয়ে উঠল সংখ্যানুপাতে ঢের বেশি।

কারণ, নেতাদের তাঁদের উপরই নির্ভর করতে হত। শুধু অসহযোগ আন্দোলন বা খিলাফৎ আন্দোলনের কথা হলে হয়ত ব্যাপারটা বেশি দূর গড়াত না, কারণ গান্ধীজী অচিরেই অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এবং হিন্দুদের সক্রিয় সাহায্য ব্যাতিরেকে খিলাফৎ আন্দোলনের প্রভাবও বেশি বাড়তে পারে নি। কিন্তু ১৯২৩ সালের আর একটি ঘটনায় জল আরও একটু গড়িয়ে গেল।

চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু ১৯২৩ সালে গঠন করলেন নিখিল ভারত স্বরাজ্য দল। এবং ঘোষণা করলেন যে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যেমন বাইরে চলছে তেমনি আইনসভাগুলির ভিতরেও সেই সংগ্রাম চালাতে হবে। গয়া কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেনঃ 'আমাদের মধ্যে অনেকে মনে করেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই দেশের সাধারণ মানুষের স্বরাজ অর্জন করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি না যে, কোন বিশেষ শ্রেণীর আন্দোলনকে স্বরাজ সংগ্রামে কখনও পরিণত করার সম্ভাবনা আছে। আজ যদি বিলাতের পার্লামেণ্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে দেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রবর্তন করেন, আমার পক্ষ থেকে আমি তার প্রতিবাদ করব, কারণ তাতে নিশ্চিতভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবার পথ খুলে দেবে। আমি বিশ্বাস করি না যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেই করায়ত্ত ক্ষমতা হাত-ছাড়া করবেন। বর্তমানে দেশের শাসক সাদা চামড়ার আমলাতন্ত্রকে সরিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভারতীয় আমলাতন্ত্রকে বসালে ভারতের তাতে কি লাভ হতে পারে?' (ইংরেজির অনুবাদ)

নিখিল ভারত স্বরাজ্য দলের রাজনীতি কিন্তু চিত্তরঞ্জন জমিদার শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়েই শুরু করলেন। মুসলমান সম্প্রদায় স্বভাবতই এতে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁরা দেখলেন যে, যদিও চিত্তরঞ্জন আইনসভার ভিতর থেকে স্বরাজ-সংগ্রাম চালানোর কথা বললেন, তবুও স্বরাজ্য দলেরই একটা বড় অংশ—বিশেষ করে বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে, সরকারের সঙ্গে সহ-যোগিতা করে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। এইভাবে অবশেষে হিন্দু মধ্যবিত্তের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে যেতে পারে বলে মুসলমান-মধ্যবিত্ত রীতিমত শংকিত হয়ে উঠলেন। বাংলায় মুসলমানেরা সাধারণভাবে স্বরাজ্য দলের বিরুদ্ধে গেলেন। চিত্তরঞ্জনের মত বিরাট নেতার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও স্বরাজ্য দলের মনোনয়নে তিনি মাত্র কয়েকটি মুসলমান প্রার্থীকে নির্বাচনে জেতাতে পেরেছিলেন। স্বরাজ্য দলের অন্যান্য মুসলমান প্রার্থী শোচনীয়ভাবে হেরে যান। গান্ধীজীর মত চিত্তরঞ্জনও অচিরেই বুঝতে পারলেন, যেমন বাইরে তেমনি আইনসভার ভিতরেও মুসলমানদের সাহায্য না পেলে তাঁর সংগ্রাম সফল হতে পারবে না।

এর জন্য মূলত দায়ী ছিল কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের, বিশেষ করে বাঙ্গালী হিন্দুদের সংকীর্ণ নির্বুদ্ধিতা। লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগ মেনে নিলে পূর্ব বাংলা মুসলমান প্রধান হয়ে থাকত বটে, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা বরাবর রাখা যেত। বাংলাকে এক করে রাখবার এক উন্মাদ ও অন্ধ তাগিদে হিন্দু নেতারা সমগ্র বাংলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা কায়েম হতে সাহায্য করেছিলেন। ১৯০৫ সালে যে বাঙ্গালী হিন্দু কার্জনের সেটলড্ ফ্যাক্টকে আনসেটল করবার জন্য বুকের রক্ত দিয়েছিলেন, ১৯৪৭ সালে তাঁরাই বাংলা বিভাগের দাবি তুলে বাংলা ভাগ করিয়েছিলেন।

এইসময়ে আইনসভাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রতিনিধিদের সাহায্য না পেলে কোন প্রগতিমূলক কাজ করাই সম্ভব হচ্ছিল না। চিত্তরঞ্জন এটা বুঝতে পেরে মুসলমানদের সন্তুষ্ট করে তাঁদের সাহায্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার আশায় ১৯২৩ সালে সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মিলনীতে তাঁর বিখ্যাত হিন্দু-মুসলিম চুক্তি সম্পাদন করলেন। একে বেঙ্গল প্যাক্টও বলা হয়ে থাকে।

এই চুক্তির ফলে আইনসভাগুলিতে মুসলমানদের গরিষ্ঠতার অনুপাতে সদস্য সংখ্যা নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হোল এবং এই ব্যাপারে কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটির মধ্যে পূর্ব সম্পাদিত সর্বভারতীয় হিন্দু মুসলিম চুক্তির শর্তগুলি অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হল। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, চাকুরীর সংখ্যানুপাতিক বিন্যাস। সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের ৫৫ শতাংশ এবং হিন্দু ও অন্যান্যের ৪৫ শতাংশের ব্যবস্থা হয়েছিল। ধর্মীয় সহনীয়তার ক্ষেত্রে এই চুক্তি কয়েকটি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল। তার মধ্যে প্রধান ছিলঃ (১) মসজিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করা চলবে না (২) মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য গোহত্যা হলে তাতে বাধা দেওয়া চলবে না। কিন্তু হিন্দুদের মনে আঘাত লাগে এমন স্থানে গোহত্যা চলবে না।

এই চুক্তির ফলে মুসলমানদের একটা বড় অংশ খুশি হলেন এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হল। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং জমিদার শ্রেণীর হিন্দুরা এই চুক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ও সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ হলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল, যাঁদের হাতে চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের পরিচালনার ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। এমন কি গান্ধীবাদী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পর্যন্ত প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলেছিলেনঃ 'মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে করে আমরা তাদের একটার পর একটা দাবি বাড়িয়ে তুলতেই সাহায্য করছি।' (১৯২৭-এর ২৫শে এপ্রিল—দি বিঙ্গলী দেখুন)

চিত্তরঞ্জনের হিন্দু-মুসলমান চুক্তি সম্বন্ধে আবুল কালাম আজাদ ইণ্ডিয়া

উইনস ফ্রিডম বইতে লিখেছেনঃ 'এই সাহসিক ঘোষণা বঙ্গীয় কংগ্রেসের ভিত্তি পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছিল। বহু কংগ্রেস নেতা তুমুলভাবে এর বিরোধিতা করলেন এবং মিঃ দাশের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে দিলেন। তাঁকে সুবিধা-বাদের এবং মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য অভিযুক্ত করা হল। কিন্তু তিনি অটল পাহাড়ের মত খাড়া হয়ে রইলেন। এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, তিনি দেহত্যাগ করবার পর তাঁর কিছুসংখ্যক শিষ্য তাঁর আদর্শকে খর্ব করে দিলেন এবং তাঁর এই ঘোষণাটিকে বাতিল করে দেওয়া হল। ফল এই হল যে, বাংলার মুসলমানেরা কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াল এবং দেশ বিভাগের প্রথম বীজ বপন করা হল।' (ইংরেজির অনুবাদ—২১ পৃঃ)

হিন্দু-মুসলমান চুক্তি ছাড়াও ১৯২৫-এর ২রা মে ফরিদপুর বঙ্গীয় সম্মিলনীর সভাপতি হিসাবে তিনি যে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব করেছিলেন এবং ডোমিনিয়ন স্টেটাসকে পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে অধিক গ্রহণ-যোগ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন, তাতে তিনি বহু নবীন কংগ্রেসীর ও বিশেষভাবে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কাছে খুব অপ্রিয় হয়ে পড়েন। ফরিদ-পুরেই সম্মেলন মন্ডপে কংগ্রেস কর্মীদের কাছে দুর্ব্যবহার লাভ করে তিনি মন্ডপ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। সন্ধ্যেবেলায় তাঁর জ্বর হয়। তিনি অসুস্থই ছিলেন—তা বেড়ে যায়। তাঁর অসুখ আর সারে নি। ১৬ই জুন দার্জিলিংয়ে তিনি দেহত্যাগ করেন।

তাঁর মৃত্যুর পর বাংলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতারা ও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা চিত্তরঞ্জনের হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট বাতিল করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ভার চরমপন্থীদের হাতেই ছিল এবং তাঁদের দাবিতে গান্ধীজী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে চিত্তরঞ্জনের জায়গায় বাংলার নেতা করে দিলেন। বহু কংগ্রেস সদস্যের অমত সত্ত্বেও শুধু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দাবি মেটাবার জন্য গান্ধীজী যে যতীন্দ্রমোহনকে বাংলার নেতা করেছিলেন—তার উল্লেখ করে স্বরাজ্য দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ডঃ মুকুন্দরাম জয়াকর (পরে বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলে জজ নিযুক্ত হয়েছিলেন) ১৯২৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর লালা লাজপৎ রায়কে এক চিঠি লিখে জানিয়েছিলেনঃ 'বাংলা থেকে বন্ধুরা জানিয়েছেন, অন্যায় হস্তক্ষেপের দ্বারা গান্ধীজী যে সেনগুপ্তকে বাংলার নেতা করে দিলেন তাতে পার্টি শিগগির ভেঙ্গে যাবে।' (মাই লাইফ স্টোরি দ্বিতীয় ভাগ—৬৩০ পৃঃ)

চিত্তরঞ্জনের সক্রিয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব মাত্র পাঁচ বছরের ছিল। প্রথম জীবনে তিনি চরমপন্থী বিপ্লবী দল—অনুশীলন সমিতির সহকারী সভাপতি ছিলেন। ১৯২০তে তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে-

ছিলেন। ২১-এর নাগপুর কংগ্রেসে তিনি অসহযোগ আন্দোলনকে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু ১৯২৩-এ নিখিল ভারত স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠা করে আইনসভায় প্রবেশ আন্দোলন চালাবার পরিকল্পনা নিলেন। আইনসভায় প্রবেশ করে তাঁর স্বরাজ্য দল বাংলায় ও অন্যান্য প্রদেশে কয়েকবার মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কয়েকবার বাজেট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল। রাজনীতির চমক এই সব ব্যাপারে ছিল বটে, কিন্তু আসলে এ সবের কোন সার্থকতা ছিল না। কারণ, মন্ত্রি-সভা প্রত্যাখ্যাত হলে গভর্ণর মন্ত্রীদের শাসিত বিষয়গুলি আইন অনুসারে নিজের হাতে নিয়ে নিতেন এবং তখন তার উপরে আর ব্যবস্থাপক সভার কোন কর্তৃত্ব থাকত না। কেন্দ্রেও বাজেট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে বড়লাট সার্টিফিকেট দিয়ে বাজেট পাশ করিয়ে নিতেন। এই ধরনের রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে চিত্তরঞ্জন ১৯২৫-এর ২রা মে ফরিদপুরে প্রাদেশিক সম্মি-লনীতে প্রস্তাব করেছিলেন যে, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিলে ও মন্ত্রীমণ্ডলীকে সকল বিষয় শাসন করবার স্বাধীন অধিকার দিলে—তিনি ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছেন। এর জন্য তিনি সেসময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের বেলুড় মঠে তখনকার গভর্নর লর্ড লিটনের সঙ্গে এক গোপন সাক্ষাৎকারেরও ব্যবস্থা করেছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের এই আপাত-বিরোধী রাজনৈতিক মতামতের ঘূর্ণাবর্তের ভিতর বাংলার ও ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে একমাত্র উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল, হিন্দু-মুসলিম চুক্তি বা বেঙ্গল প্যাক্ট। ১৯২২-এ গয়া কংগ্রেসেই প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রকৃত মিলন সাধনের উদ্দেশ্যে উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা একটি প্যাকট্ বা চুক্তি করে হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। এই প্রস্তাবের তাগিদেই চিত্তরঞ্জন ১৯২৩-এ সিরাজগঞ্জে বেঙ্গল প্যাক্ট পাশ করিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর প্রিয় শিষ্যেরা, বিশেষ করে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় চরমপন্থী বিপ্লবীরা চিত্তরঞ্জনের বেঙ্গল প্যাক্ট ধ্বংস করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, প্যাক্ট কার্যকরী করবার প্রধান শর্ত ছিল মুসলমানেরা স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দিলে তবেই প্যাক্ট চালু হবে। যেহেতু মুসলমানেরা স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে না, অতএব প্যাক্ট বাতিল হয়ে গেছে। শরৎ চন্দ্র বসু প্যাক্ট বিরোধীদের নেতার স্থান নিয়েছিলেন।

১৯২৭-এর ২৩শে ডিসেম্বর জিন্না এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেনঃ 'মুসলমানরা আর কংগ্রেসকে বিশ্বাস করে না, কারণ গয়া কংগ্রেসে হিন্দু-মুসলমানের একটি সর্বভারতীয় চুক্তি স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েও কংগ্রেস তা

পালন করে নি।' (অমৃতবাজার পত্রিকা ১৫।১২।২৭—ইংরেজীর অনুবাদ)

গয়া কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন চিত্তরঞ্জন। গয়ায় নিজের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যই তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অপেক্ষা না রেখে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম চুক্তি সম্পাদন করে সারা দেশে এক নবযুগ সূচনার প্রয়াস করেছিলেন।

যে-লোকটি চিত্তরঞ্জনের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টকে সফল করবার জন্য লড়াই করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, সেই বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দাবিতে চিত্তরঞ্জন নিজেই কংগ্রেসের সকল দায়িত্বশীল পদ থেকে আগেই সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁদেরই দাবিতে ১৯২৬ সালে উত্তর মেদিনীপুর কেন্দ্রে গভর্নমেণ্টের মনোনীত মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সরকারী চেয়ারম্যান অর্ধশিক্ষিত ধনী জমিদার দেবেন্দ্রলাল খাঁকে কংগ্রেসের মনোনয়ন দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছিল, যাতে তিনি আইনসভায়ও ঢুকতে না পারেন। এই নির্বাচনের সময়ে বিপ্লববাদী নেতা উপেন ব্যানার্জি প্রকাশ্য সভায় মিথ্যা অভিযোগ করেছিলেন যে, বীরেন্দ্রনাথ শাসমলই সুভাষচন্দ্র বসুকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। মেদিনীপুরের কংগ্রেস নেতা উকিল উপেন মাইতি ও ডাক্তার শচীন সর্বাধিকারী ছাপানো ইস্তাহারে ঘৃণ্য অভিযোগ করেছিলেনঃ 'যে সকল মুসলমান হিন্দু রমণীর সতীত্ব নষ্ট করেছে ও হিন্দু মন্দির ধ্বংস বা অপবিত্র করেছে, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল নিজের বাড়িতে তাদের আশ্রয় দেন এবং তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন।' শচীন সর্বাধিকারী পরে বলেছিলেন তিনি ইস্তাহারে সই করেননি। চিত্তরঞ্জনের বিধবা পত্নীর নাম জাল করে একটি আবেদনও বীরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়েছিল।

চিত্তরঞ্জন-প্রবর্তিত হিন্দু-মুসলিম চুক্তি নিয়ে বাংলার কংগ্রেসী রাজনৈতিক মহল ১৯২৬-এর গোড়া থেকেই ছিল অতীব উষ্ণ। কংগ্রেসের পরিচালন ভার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের হাতে। তাঁরা একবাক্যে চান—চিত্তরঞ্জনের হিন্দু-মুসলমান চুক্তি যথাশীঘ্র বাতিল করে দেওয়া হোক। এই পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী বসলো ২২-এ মে। সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ছিলেন হিন্দু-মুসলিম চুক্তির প্রধান শক্তি-স্তম্ভ। সভার উত্তপ্ত আবহাওয়া দেখে ঠিক হলো যে, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রস্তাব আনবেনঃ 'চুক্তির প্রশ্নটি বিবেচনা এখন স্থগিত রাখা হোক।' সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এর বিরোধিতা করলেন। তাঁরা চান, চুক্তির প্রশ্নটি তুলে তখনই ওটি বাতিল করা হোক। উভয় পক্ষে সমান সমান ভোট হলো—সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ কাস্টিং ভোট দিয়ে প্রস্তাবটি পাশ করিয়ে দিলেন। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এইভাবে বিফল হয়ে তাঁর উপর সাংঘাতিক চটলেন। সভাপতি তাঁর

ভাষণে এক জায়গায় বলেছিলেন, 'যাঁরা ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করেন, তাঁদের কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতি থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত, কারণ কংগ্রেসের আদর্শ অহিংসা।' তিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের নিন্দাও করেছিলেন। এই মন্তব্যের জন্য সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা বীরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনলেন। নিন্দা প্রস্তাব পাশ হতে সভাপতি পদত্যাগ করে কৃষ্ণনগর ছেড়ে চলে গেলেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও অন্যান্য নেতারাও কৃষ্ণনগর ত্যাগ করলেন। তখন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা একজন সামান্য দর্শকমাত্র ব্যারিস্টার যোগেশ চৌধুরীকে (ক্যালকাটা উইকলি নোটসের প্রতিষ্ঠাতা) সভাপতি করে সম্মেলন বসালেন এবং চিত্তরঞ্জন-প্রবর্তিত হিন্দু-মুসলিম চুক্তি বাতিল করে দিলেন। (পরে যোগেশ চৌধুরীর এই সম্মেলন কংগ্রেসী সম্মেলন নয় বঙ্গীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ঘোষণা করেছিল। কারণ দেখা গিয়েছিল, যোগেশ চৌধুরী ডেলিগেটও ছিলেন না, অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যও ছিলেন না। সে সময়ে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা সভায় সভায় এই ধরণের বহু বাইরের লোক নিয়ে যেতেন, দরকার হলে তাঁদের কাজে লাগাতেন।)

কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলন সম্বন্ধে কমিউনিস্ট নেতা ও প্রাচীন বিপ্লবী নায়ক মুজফ্ফর আহমেদ লিখেছেনঃ 'কংগ্রেস কর্মীসংঘ দ্বারা সাম্প্রদায়িকতার কম ইন্ধন জোগানো হচ্ছিল না। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এই সংঘ গড়েছিলেন। এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁরা সি আর দাশের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টকে বাতিল করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, যা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারেরই সহায়ক হয়েছিল। কংগ্রেসের ভিতরে গঠিত স্বরাজ পার্টি চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে তিন বৎসর আগে সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মেলন হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করেছিল। এই প্রস্তাবে মুসলমানদের একটি বড় অংশ খুশী হয়েছিলেন। প্যাক্টে মুসলমানদের বেশি চাকরী পাওয়া ও আরও কি কি অধিকার পাওয়ার কথা ছিল। এই জিনিসটা হিন্দুদের খুব বেশিরভাগ লোক গ্রহণ করতে পারেন নি। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা 'কংগ্রেস কর্মী সংঘ' নাম দিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। প্যাক্টের বিরুদ্ধে তাঁরা যে প্রচার করেছিলেন, সেটা কেন সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়েছিল সে কথা আগে বলেছি। কৃষ্ণনগর সম্মেলনে প্যাক্ট নাকচ করবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজি দৈনিক 'ফরওয়ার্ডের' এ্যাসিস্ট্যাণ্ট এডিটর ছিলেন বলে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের অভিভাষণের কপি আগেই পেয়েছিলেন। কাজেই তিনি কলকাতা হতে তৈয়ার হয়েই গিয়েছিলেন যে, দরকার হলে কৃষ্ণনগরের সম্মেলন ভেঙে দেবেন। সি আর দাশের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট নাকচ করে দেওয়ার জন্য তিনি ও তাঁর বন্ধুরা বদ্ধপরিকর তো

ছিলেনই, তার উপরে বীরেন শাসমল তাঁর অভিভাষণে লিখে বসলেন, 'সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য।' (কাজী নজরুল ইসলাম—স্মৃতিকথা, ৩৫৯-৩৬৪ পৃঃ)

১৯২৬-এর ১লা জুন এক ইস্তাহারে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ঘোষণা করেছিলেনঃ 'কৃষ্ণনগরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, বেশ কিছু সংখ্যক কংগ্রেস-কর্মী যাঁরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যও বটে, তাঁরা হিন্দু-মুসলমান চুক্তিটি এবং কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে কংগ্রেসের কার্যক্রম যাতে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়, তার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কংগ্রেসের প্রতি এটি একটি জ্বলন্ত আনুগত্যহীনতা।'

কিন্তু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের ভয়ে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ১৯২৬-এর শেষের দিকে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিতে চিত্তরঞ্জনকে বাধ্য করেছিলেন ১৯২২ সাল থেকে। ১৯২৪-এ তিনি যখন মাসিক পাঁচশো টাকা মাসোহারায় কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসারের পদের জন্য প্রার্থী হয়েছিলেন, তখন সন্ত্রাসবাদীদের তরফ থেকে সুভাষচন্দ্রকে দাঁড় করিয়ে মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতনে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৬-এর সাধারণ নির্বাচনে তিনি যাতে আইন সভায় ঢুকতে না পারেন, তখন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দাবিতে মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সরকার মনোনীত চেয়ারম্যান দেবেন্দ্রলাল খাঁকে দাঁড় করিয়ে কংগ্রেস নেতারা বীরেন্দ্রনাথকে আইন-সভায় প্রবেশ করতে দিলেন না। কিন্তু বাংলার সাধারণ দরিদ্র সংগ্রামী কর্মীরা তাঁদের আপনজন বীরেন্দ্রনাথকে ভোলেন নি। তাঁরা এইবার তাঁকে ডেকে এনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদকের ভার দিলেন। তাঁর চেষ্টায় অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক নিযুক্ত হবার পর অমৃতবাজার পত্রিকা ২৩।১২।২৬-এর সম্পাদকীয়তে লিখেছিলঃ 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হিসাবে মিঃ বি এন শাসমলের নির্বাচন নিয়ে আমরা লিখেছিলামঃ যদি মিঃ শাসমল কর্মীদের মধ্যে অতীতকে ভুলে যাবার এবং ক্ষমার ভাব ফিরিয়ে আনতে পেরে থাকেন এবং কংগ্রেসের কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতির দায়িত্ব নিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর সেক্রেটারী নির্বাচন খারাপ হয়নি।

'.....আমাদের দেশের যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে বেশির ভাগ দেশময় ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টা পরিচালনার পরিবর্তে কাউন্সিলে নির্বাচিত হওয়া অধিকতর

বাঞ্ছিত মনে করেছেন। কর্মী হিসাবে মিঃ শাসমলের অভিজ্ঞতা অনন্য। কর্মকর্তা হিসাবে তাঁর নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কাউন্সিলের মাধ্যমে যতটা সম্ভব তার চেয়েও অধিকতর কার্যকরীভাবে যদি দেশকে বিদেশী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সংগঠিত করবার জন্য নিজেদের শক্তি নিয়োগ করে, তাহলে মিঃ শাসমল দেশের অদ্বিতীয় মঙ্গলের কাজটি করবেন। আমরা শুনেছি, তিনি কৃষ্ণনগরে তাঁর সভাপতির অভিভাষণে যে দুর্ভাগ্যজনক মন্তব্য-গুলি করেছিলেন, তার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে ভ্রম সংশোধন করেছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে তিনি যে আস্থা অর্জন করেছেন, তাঁকে এখন তার যথার্থ প্রমাণ করতে হবে। যে-সকল গোষ্ঠী তাঁর সঙ্গে যুক্ত, শুধু তাদের সাহচর্য দিয়ে তিনি এটা পারবেন না; তার জন্য তাঁর সকল শক্তি দেশের সেবায় উৎসর্গ করতে হবে।' (ইংরেজির অনুবাদ)

বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের সাহায্য নিয়ে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদল নিজেদের কর্মী ও নেতাকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত করিয়ে নিলেন—যাতে আগে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। তারপরেই তাঁরা নিজ মূর্তি ধরলেন। তাঁরা এক বিশেষ তলবী সভার নোটিশ দিলেন যাতে কিরণশংকর রায় প্রস্তাব করলেনঃ 'মিঃ বি এন শাসমল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাজ করছেন এবং তাকে সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে বলে, সমস্ত কার্যনির্বাহক সমিতির বিরুদ্ধে আমরা অনাস্থা জানাচ্ছি।'

এই নিয়ে লড়াই হোলো, তাতে বাংলার মুসলমান সমাজের প্রায় সমস্ত নেতা ও কর্মী এসে দাঁড়ালেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের পিছনে। ভারতের কমিউ-নিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্ফর আহমেদও সেদিন বীরেন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। একদিকে দেশসেবার কারণে নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত বীরেন্দ্র-নাথ, কংগ্রেসের দরিদ্র নিষ্ঠাবান কর্মীদল ও একজন বাদে সকল মুসলমান কংগ্রেস নেতা ও কর্মী--অনদিকে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বিধান রায়, শরৎ বসু, নলিনী সরকার, কিরণশংকর রায়, তুলসী গোস্বামী, নির্মল চন্দ্র, সুরেশ মজুমদার, অতুল গুপ্ত ও বাংলার সকল হিন্দু চরমপন্থী নেতা ও কর্মী। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ শাসমল হেরেছিলেন মাত্র চার ভোটে।

এই ভোটাভুটির পর ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৭-এর স্টেটসম্যান সম্পাদকীয়তে লিখেছিলঃ 'বাংলায় রাজনৈতিক চক্রটি আর এক পাক ঘুরে গেলো এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য-নির্বাহক সমিতি মোটামুটি সুচারুভাবে বিলীন হয়ে গেল। একটি অনাস্থা-জ্ঞাপক ভোটের ফলে সভাপতি মিঃ ব্যানার্জি ও মিঃ বি এন শাসমল পদত্যাগ

করেছেন এবং 'বিগফাইভ'* বাহ্যত আবার ক্ষমতায় আসীন হোলো। তাঁর কৃষ্ণনগর বক্তৃতার মূল্যবান অংশের বেশির ভাগই মিঃ শাসমল গলাধঃকরণের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু তা করেও সব রক্ষা করা যায় নি। এটা পরিষ্কার যে, তাঁর দলটি থেকে যাচ্ছে এবং আবার লড়াই শুরু করতে পারে, কারণ তাঁর দল মাত্র চারজনের সংখ্যালঘু। কিন্তু আরও সংঘর্ষ এই ধারণাকেই ঘনীভূত করবে যে, রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেস বাংলায় প্রকৃত কোনো প্রভাব হারিয়ে ফেলেছে।' (ইংরেজির অনুবাদ)

১৩ই ফেবুয়ারী 'দি বেঙ্গলী' প্রধান সম্পাদকীয়তে লিখলঃ 'বিগ ফাইভ' অথবা আমাদের বোধহয় বলা উচিত 'বিগ থ্রী', কারণ গত শুক্রবার গোষ্ঠী-প্রাধান্যের বেদীমূলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকারকে বলি দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল—আবার কুক্ষিগত করতে সক্ষম হয়েছে সেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে অর্থাৎ কমিটির সংগঠন কার্যক্রম এবং মর্যাদা বলতে এখনও যেটুকু অবশিষ্ট আছে।

'.....ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করবার এই ষড়যন্ত্রের চেয়েও বেশি আশ্চর্যজনক হচ্ছে যে, অনাস্থা প্রস্তাবটি পাশ করা হয়েছে একটি ব্যাপকতার ভিত্তিতে, প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি বা কর্মকর্তারা যার জন্য দায়ী, এমন কোনো বিশেষ কাজের জন্য নয়। মাত্র ক'মাস আগে প্রদেশ কংগ্রেস সমিটির সকল সদস্যের দ্বারা নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচিত হয়েছিল। এটা ধরে নিতে হবে যে, কার্যনির্বাহক সমিতিতে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা সমগ্র কমিটির পূর্ণতম আস্থার পাত্র ছিলেন। যদিও সেই কার্যনির্বাহক সমিতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবটি গত শুক্রবারের সভায় পাশ হয়েছে, তবুও এমন কোনো সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করা হয়নি, কি ক'রে সেই গভীর আস্থার হানি ঘটলো।

.....স্বরাজী নেতাদের কার্যকলাপ তাঁদের অতীত কীর্তি-ধারা এবং কোনো পদ্ধতিই 'অতীব গর্হিত নয়' তাঁদের ঘোষিত এই নীতির সঙ্গে সঙ্গতিসূচক। কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির আর একটি সদস্য গোষ্ঠীর কার্যকলাপ আরও ঢের বেশি লজ্জাজনক হয়েছিল। এই গোষ্ঠীটি দাবি করেছিলেন যে, তাঁরা প্রকৃত কর্মী এবং যোগ্য ব্যক্তির সমর্থক। মিঃ শাসমল যদি তাঁর কৃষ্ণনগর অভিভাষণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাহলে এঁরা তাঁকেই সমর্থন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে রকম নির্লজ্জভাবে নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

---

*বিগ ফাইভ বলতে—বিধান রায়, শরৎ বসু, তুলসী গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও নলিনী সরকার—লেখক।

করলেন তাতে এঁরা নির্ভেজাল সুবিধাবাদী এবং সুযোগ-সন্ধানী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইলেন (এঁরাই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল—লেখক)। এটা এখন পরিষ্কার যে, এঁদের সমস্ত বৃহৎ বুলি সত্ত্বেও এঁরা অভিজাত শ্রেণীর বিরক্তির পাত্র হবার সাহস রাখেন না এবং আদর্শ ও ফলাফলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে 'বিগ ফাইভ' যে সিদ্ধান্তই নিক না কেন এঁরা শেষ-মেশ সেইটাই সমর্থন করতে বাধ্য। এঁরা জানিয়েছিলেন যে, মিঃ শাসমলের বিরুদ্ধে এঁদের একটি আপত্তি আছে। কিন্তু সেই আপত্তির কারণটি যখন এঁদের দাবি অনুসারে দূরীভূত করা হোলো তখনও এঁরা মিঃ শাসমলের বিরুদ্ধেই ভোট দিলেন যার পরিষ্কার কারণটি হচ্ছে যে—এঁরা শুধু গ্রামোফোন মাত্র ছিলেন, যার কাজ হচ্ছে মনিবের কণ্ঠস্বরটি রেকর্ড করে রাখা। এঁরাও এইভাবে দেশপ্রেমের খেলাতে জমে গেলেন।

.....আমাদের রাজনৈতিক মতামত অধ্যাপক ব্যানার্জি বা মিঃ শাসমলের মতামতের সঙ্গে মেলে না এবং সেই কারণে ব্যক্তিগত ঈর্ষার যে ঘৃণ্য মনোবৃত্তি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে তার দুজন কর্মকর্তাকে অপদস্থ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে তার নিন্দা করতে আমরা অন্য সকলের চেয়েও স্বাধীন, বিশেষত—যখন এই দুজনের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয় নি বা প্রমাণিত হয় নি এবং এটা করলেন তাঁরাই, যাঁরা বিনা বিচারে বন্দী রাখার প্রতিবাদ করেন এবং প্রত্যেক সম্ভবজনক মুহূর্তে নিজেদের দেশপ্রেমের খেলাটি জাহির করেন।' (ইংরেজির অনুবাদ)

বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের সঙ্গে বিরোধে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী ও 'বিগ ফাইভে'র বিধান রায়, শরৎ বসু, তুলসী গোস্বামী, নলিনী সরকার এবং নির্মলচন্দ্র চন্দ্র এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। বিরোধের প্রধান কারণটি স্টেটস-ম্যান পত্রিকা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করেছিল ২৭ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী। স্টেটসম্যান লিখেছিলঃ 'কলকাতা কর্পোরেশনের আসন্ন নির্বাচন কলকাতার স্বরাজী সদস্যদের মধ্যে একটি ভাঙনের সৃষ্টি করেছে, যার ফলে দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী ইলেকশন বোর্ড স্থাপিত হয়েছে এবং এটাই সম্ভব যে, কংগ্রেসের ছাপ নিয়ে দুই প্রস্থ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী দাঁড় করানো হবে।'

.....'একথা সত্য যে, সম্প্রতি কমিটির এক সভায় মিঃ শাসমলের বিরোধী পক্ষ নিতান্ত সামান্য ভোটাধিক্যে কার্যনির্বাহক সমিতির উপর অনাস্থা প্রকাশ করে প্রস্তাব পাশ করেছিল। কিন্তু অচিরেই নানা অসুবিধা দেখা দিল। সভ্যরা খুব কমই পদত্যাগপত্র পাঠালেন এবং যদিও সভাপতি মিঃ জে এল ব্যানার্জি ও সম্পাদক মিঃ বি এন শাসমল পদত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের বিরোধী পক্ষের লোকেরাই পদত্যাগ করতে অনিচ্ছুক হলেন। ইতিমধ্যে নতুন কার্যনির্বাহক সমিতির নির্বাচন সাপেক্ষে সভাপতি কর্পোরেশন নির্বাচন

পরিচালনার ইচ্ছার কথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু এতে 'বিগ ফাইভের' অনুমোদন পাওয়া গেল না এবং তাঁরা দিল্লীতে অবস্থিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটির হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলেন।'

'দিল্লীর সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তার পর ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করলো যে, কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন পরিচালনা করবে কলকাতার বিভিন্ন জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির সভাপতি ও সম্পাদক নিয়ে গঠিত একটি সংগঠন। সেই অনুসারে মিঃ জে এম সেনগুপ্তকে সভাপতি ও জনৈক 'কর্মী' মিঃ সুরেশচন্দ্র দাশকে সম্পাদক করে একটি সংগঠন গঠিত হলো। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতির কর্মকর্তারা এটাকে কর্পোরেশন নির্বাচন পরিচালনায় তাঁদের ক্ষমতা দখল হিসাবে গণ্য করলেন এবং বিভিন্ন প্রস্তাব পাশ করে স্থানীয় ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক হস্তক্ষেপের অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন অভিযান চালিয়ে যাবেন।' (ইংরেজির অনুবাদ)

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী ও তাঁদের সহযোগী নেতাদের অনুরোধে ১৭ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এক জরুরী অধিবেশনে ঘোষণা করেছিল যে, কলকাতা কর্পোরেশনের আসন্ন নির্বাচন পরিচালনা করবে একটি ইলেকশন বোর্ড, যেটি গঠিত হবে কলকাতার বিভিন্ন জেলা কংগ্রেস কমিটি ও সম্পাদকদের নিয়ে এবং এঁরা অন্যান্য সদস্য কো-অপ্ট করবে। ওয়ার্কিং কমিটির এই জরুরী অধিবেশনে মাত্র পাঁচজন সদস্য উপস্থিত ছিলেনঃ মতিলাল নেহরু, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, সরোজিনী নাইডু, এ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ও টি প্রকাশম। গান্ধীজী সে সময়ে দিল্লীতেই ছিলেন, তাঁকে এই জরুরী সভায় ডাকা হয়নি। আর একজন সদস্য মৌলানা মহম্মদ আলিও দিল্লীতে ছিলেন। কিন্তু সভার নোটিশ তাঁর কাছে পাঠানো হয় সভা শেষ হয়ে যাবার পর।

স্টেটসম্যান যেমন লিখেছিল, এই নতুন ইলেকশন বোর্ডের সম্পাদক হলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস কর্মী সংঘের সম্পাদক শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাশ। এই কর্পোরেশন নির্বাচনে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের প্রতি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে যে ব্যবহার করা হয়েছিল ১৯২৭-এর ৮ই মার্চ স্টেটসম্যানে তার একটা বিবরণী দেওয়া হয়েছিল এই রকমঃ 'গুণ্ডামির পরিপ্রেক্ষিতে ইষ্টক বর্ষণের ফলে গতকাল সন্ধ্যায় মির্জাপুর পার্কে একটি নির্বাচনী সভা আচম্বিতে বন্ধ করে দিতে হয়। সভার সভাপতি ছিলেন মিঃ জে এল ব্যানার্জি এবং সভাটি ডেকেছিলেন মিঃ শাসমল এবং তাঁর দলের লোকেরা কর্পোরেশন নির্বাচনে তাঁদের মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারের জন্য'। (ইংরেজির অনুবাদ)

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিরুদ্ধতা ও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের গুন্ডামি সত্ত্বেও বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে ১১ জন কর্পোরেশনে নির্বাচিত হয়েছিলেন—সন্ত্রাসবাদী ও 'বিগফাইভের' প্রার্থীর নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৩২।

দিল্লীস্থিত কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ শুধু কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনের জন্য ইলেকশন বোর্ডটিকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কৌশলে এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদল ও তাঁদের সহযোগী নেতারা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কলকাতার অফিস বাড়িটি গায়ের জোরে দখল করে নিতে পারেন।

২২শে ফেব্রুয়ারী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে তার করলেন ঃ 'সম্ভব হলে শনিবার (২৬শে ফেব্রুয়ারী) আমার সঙ্গে দিল্লীতে দেখা করে মীমাংসার ব্যবস্থা করুন।' ওদিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হিসাবে নতুন কর্মকর্তা নির্বাচনের জন্য তিনি ২রা মার্চ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাধারণ সভা ডেকেছিলেন। যতক্ষণ নতুন কর্মকর্তা নির্বাচন না হচ্ছে ততক্ষণ তিনিই সম্পাদক থাকবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ২৬শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সঙ্গে দেখা করে ২রা মার্চ কলকাতায় ফিরে এসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে যোগদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না বলে তিনি ২রা মার্চের সভা স্থগিত থাকলো বলে ঘোষণা করে চতুর্দিকে চিঠি ও তারবার্তা প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু দিল্লী যাবার মুখে তিনি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের কাছ থেকে আবার তার পেলেন, যে ২রা মার্চের সভাটি স্থগিত রাখা চলবে না। কিন্তু তখন ২৭শে ফেব্রুয়ারী হয়ে গেছে এবং পুনরায় তারযোগে জানালেও গ্রামাঞ্চলের বহু কংগ্রেস সদস্য ২রা মার্চের সভাটি স্থগিত থাকছে না, এ সংবাদ ঠিক সময়ে না পেয়ে ২রা মার্চের সভায় যোগদান করতে পারবেন না—এই কারণে ২রা মার্চের সভা স্থগিতের ঘোষণাটি তিনি আর প্রত্যাহার করলেন না।

তখন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ঘোষণা করলেন যে, বঙ্গীয় কংগ্রেসের সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ২রা মার্চ যে সাধারণ সভা ডেকেছিলেন তাঁরাই সেই সভা পরিচালনা করবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে পদব্রজে সদলবলে বউবাজারে কংগ্রেসের অফিস বাড়িটি দখল করবার অভিযানে চললেন। গায়ের জোরে কংগ্রেস অফিস দখল করতে ব্যর্থ হয়ে তাঁরা সকলেই বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের উপর আরও প্রচন্ডভাবে চটলেন।

এই প্রসঙ্গে ৩রা মার্চ স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয়তে যা লেখা হয়েছিল তার বাংলা অনুবাদ এই ঃ

'পাঠকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের অবস্থা সঙ্গিণ। অবস্থা এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, প্রকাশ্যে লাঠি ঘোরানো হয়েছে এবং সদস্যরা নিজের আসন হারাবার ভয় ছাড়াও মাথা ফাটারও ভয় করেছেন। এক সাম্প্রতিক সভায় মিঃ ব্যানার্জি, মিঃ শাসমল ও অন্যান্য সদস্যদের পদত্যাগ করতে আহ্বানা জানানো হয়েছিল। যে লেখন থেকে আমরা উপরের উদ্ধৃতিটি দিয়েছি তাতে মিঃ ব্যানার্জি জানিয়েছেন যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে পদত্যাগ করেছেন কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুগামী হওয়ার দরুন যতক্ষণ তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত না হচ্ছে ততক্ষণ তিনি তাঁর পদে থেকে যেতে বাধ্য এবং সেই উদ্দেশ্যে এখনও কোনো সভা হয়নি। গতকালের তারিখে একটি সভা ডাকা হয়েছিল। কিন্তু যে ভদ্রলোক এই বিবাদে একটি শান্তি স্থাপকের কাজ করতে ব্যগ্র সেই মিঃ আয়েঙ্গারের সঙ্গে দিল্লীতে একটি সম্মেলনের কতিপয় বৃথা চেষ্টার পর সেই সভা স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু সভা স্থগিতের নোটিশ যখন দেওয়া হোলো তখন মিঃ সেনগুপ্ত এবং তাঁর বন্ধুরা সেটিকে নস্যাৎ করে দিলেন এই বলে যে, সেটি সম্পাদকের ক্ষমতার বাইরে এবং নিজেরাই সভা আহ্বান করলেন যাতে এক প্রস্থ নতুন কর্মকর্তা নির্বাচন করা যায়। তাঁরা ইতিমধ্যেই নিজেরা কতর্মকর্তার পদে এবং ক্ষমতায় আসীন হয়ে আছেন বলে ধরে নিলেন। পুরাতন কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক বাধাদানের কথা তাঁরা গণ্য করলেন না। পরের পর্যায়ের ঘটনা সম্পর্কে আমাদের বিভিন্ন প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে মিঃ শাসমল কমিটির অফিসে এবং অফিস বাড়ির প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দিয়ে কিছু হতভাগ্য ব্যক্তিকে বন্দীকে করে দিয়েছিলেন। তারপরে কি হোলো তার বিবরণ জানতে হলে আমাদের মিঃ সেনগুপ্তের সই করা প্রতিবেদনের সাহায্য নিতে হবেঃ 'সন্ধ্যে-বেলায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কোনো কোনো সদস্য যাঁরা উপর-তলায় গিয়েছিলেন নিচের গেট বন্ধ করে দিয়ে তাঁদের আটকিয়ে দেওয়া হয় এবং কিছু লাঠিধারী ব্যক্তি (যারা লাঠি ঘোরাচ্ছিল) তাঁদের নিষ্ক্রমণে বাধা দেয়। সারাদিন ধরে চাতালটি শিখ এবং ভিন্ন প্রদেশীয় দারোয়ানদের দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল। এই মুহূর্তে (রাত আটটা) ওই ভদ্রলোকদের আটক করে রাখা হয়েছে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অন্যান্য সভ্যদের ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। গেটের ঠিক পিছনেই মিঃ বসন্তকুমার মজুমদারকে দেখা গেছে।'

'সমস্ত ছোটোখাটো ঘটনার বিবরণ দেওয়ার বা উভয় গোষ্ঠী পরস্পরের বিরুদ্ধে পদ্ধতি সম্বন্ধীয় কূটতর্কের যে অবতারণা করেছেন সে নিয়ে আলোচনার জন্য যথেষ্ট জায়গা আমাদের নেই। তবে সর্বপ্রধান ঘটনা হচ্ছে

এই যে, মিঃ ব্যানার্জি ও তাঁর বন্ধুদের দখলেই অফিস বাড়িটি রয়েছে যেটিকে তাঁরা একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহের মধ্যে রেখে দেন এবং অন্য গোষ্ঠীর সভায় যাই ঠিক করা হোক না কেন সেই অনুসারে তাঁরা অফিস বাড়ি থেকে দখলচ্যুত হতে রাজি নন কারণ অপর গোষ্ঠীর দ্বারা সভা আইনসঙ্গতভাবে ডাকা হয়নি এবং সেই হেতু ওঁদের মতে, সেটা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাই নয়। যে সকল ঘটনা ঘটছে তাতে আমরা সকলেই দেখতে পাচ্ছি যে, বাংলায় স্বরাজ দল এক প্রচন্ড ভাঙনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মিঃ সি আর দাশ একটি শক্তিশালী সংগঠন রেখে গিয়েছিলেন বটে কিন্তু বাইরের পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে এমন কি মিঃ দাশের জীবিতকালেই ওই সংগঠনের ভিতরে ধ্বংসের বীজ নিহিত হয়েছিল।'

কংগ্রেস অফিস গায়ের জোরে দখল করতে না পেরে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল ও তাঁদের সহযোগী নেতারা নির্মলচন্দ্রের বাড়িতে সভা করে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করলেন। সভাপতি হলেন অখিল দত্ত ও সম্পাদক ডাঃ জে এম দাশগুপ্ত। ওদিকে ১৮ই মার্চ সাবেক বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাধারণ সভায় বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের কার্যনির্বাহক সমিতি আবার সর্বসম্মতক্রমে পুনর্নির্বাচিত হলো।

দুটো কমিটিই থেকে গেল এবং মীমাংসার কোন সম্ভাবনা না দেখে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে এই নির্বাচন সম্বন্ধীয় বিরোধের মীমাংসা প্রার্থনা করলেন এই বলে যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বলে দিক দুটি কমিটির মধ্যে কোনটি বৈধ। যদি তাঁর কমিটিকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি অবৈধ বলে ঘোষণা করেন তাহলে সেই কমিটি বাতিল হবে। তাঁর তরফ থেকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করবার ভার দিলেন তিনি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে। ডঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদের প্রস্তাবক্রমে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সমস্ত বিরোধটি মীমাংসার জন্য একটি আরবিট্রেশন বোর্ড গঠন করে দিল। ঐ আরবিট্রেশন বোর্ডে বীরেন্দ্রনাথের তরফে থাকলেন তাঁর পুরাতন বন্ধু মৌলানা মহম্মদ আক্রাম খাঁ এবং সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদল ও তাঁদের সহযোগী নেতাদের তরফে থাকলেন নির্মলচন্দ্র ও অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। বীরেন্দ্রনাথের দাবি ছিল একটি মাত্র—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ঠিক করে দিক বাংলার দুটি কংগ্রেস কার্য-নির্বাহক সমিতির মধ্যে কোনটি বৈধ ও যে কমিটি অবৈধ বলে ঘোষিত হবে সেই কমিটির বিলুপ্তি সাধন।

কিন্তু আরবিট্রেশন বোর্ড সেই দিকেই গেল না। বোর্ড বললো, দুটো কমিটিই বাতিল করে দেওয়া হবে এবং তার বদলে তারা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়ে যে সভ্য তালিকা তৈরী করেছেন সেই তালিকার সভ্যরাই

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নতুন কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হবেন। আরবিট্রেশন বোর্ড যে এইভাবে কাজ করবে এর জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকট প্রার্থনা জানানো হয় নি। মূল প্রশ্ন যেটি তাঁদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল সেটি হচ্ছে, ঘোষণা করতে হবে কোন কমিটি বৈধ। কিন্তু তবুও দেশের রাজনৈতিক মঙ্গলের জন্য বীরেন্দ্রনাথ শাসমল আরবিট্রেশন বোর্ডের প্রস্তাব মেনে নিয়ে তাঁর কমিটিকে বিলোপ করে দিলেন এই আশায় যে, আরবিট্রেশন বোর্ডের প্রস্তাব মেনে নিয়ে তাঁদের প্রস্তাবিত সভ্যতালিকা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল ও তাঁদের সহযোগী নেতারাও গ্রহণ করবেন এবং সকলে যুক্তভাবে কংগ্রেস কমিটিতে কাজ করবেন। ঠিক হয়েছিল ২৭ সালের ২৬শে জুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সভায় আরবিট্রেশন বোর্ডের প্রস্তাবিত সভ্য তালিকা একটি সীল-করা খামে পেশ করা হবে এবং সেই তালিকা অনুযায়ী সভ্যরা কার্যনির্বাহক সমিতিতে নির্বাচিত হবেন। এই সভায় ভোটাভুটির কোন প্রশ্ন থাকার কথা ছিল না কারণ বীরেন্দ্রনাথের কমিটি আরবিট্রেশন বোর্ডের সভ্য তালিকা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন এবং সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল ও তাঁদের সহযোগী নেতারা তালিকাটি গ্রহণ করলে কাজটি সর্বসম্মতিক্রমে সমাধা করা যেত। এই কারণে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও তাঁর বহু সহকর্মী ২৬শে জুনের সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সেই সুযোগে সন্ত্রাসবাদী দল ও তাঁদের সহযোগী নেতারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালেন এবং তাঁরা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দ্বারা নিযুক্ত আরবিট্রেশন বোর্ডের প্রস্তাবিত সভ্য তালিকা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং নিজেদের ইচ্ছামত বঙ্গীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করলেন, যা থেকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও তাঁর সকল সহকর্মীকে সমূলে বিদায় দেওয়া হলো। এই আরবিট্রেশন বোর্ড নিয়োগ করেছিল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও তার ওয়ার্কিং কমিটি। কাজেই আরবিট্রেশন বোর্ডের প্রস্তাব অমান্য করে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল ও তাঁদের সহযোগী নেতারা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকেই অমান্য করলেন। কিন্তু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই বিধি-বহির্ভূত কাজের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাইলেন না।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত আরবিট্রেশন বোর্ড সন্ত্রাস-বাদী বিপ্লবীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলো। কিন্তু নিখিল ভারত কংগ্রেসের কর্তারা নীরবে তাতে সম্মতি জানালেন। স্টেটসম্যান পত্রিকা ১৮ই জুন একটি স্মরণীয় প্রধান সম্পাদকীয় লিখেছিল তার বাংলা অনুবাদ তুলে দিলামঃ '(স্বরাজের অপসারণ)—বহু দেশে একটা গল্প চালু আছে, কেমন করে এক শেয়াল দুটি বিবাদমান জন্তুর মধ্যে সালিশীর কাজ করেছিল এবং

সালিশীর রায় অবশেষে যখন বেরোল তখন বিবাদের বস্তুটি কেমনভাবে শেয়ালের দখলেই থেকে গেল এবং বিবাদের কোন বস্তু আর না থাকায় কেমনভাবে দুই বিবাদী বিষাদের সঙ্গে বিদায় নিল। বাংলার দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী কমিটির মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত আরবিট্রেশন বোর্ডের মনে সেই ধরনের একটা স্মৃতি নিশ্চয় প্রভাবিত ছিল। তাঁরা বিবাদের কোনো মীমাংসা করতে পারেন নি কিন্তু কার্যকরীভাবে তাঁরা দুটি কমিটির মীমাংসা করে দিয়েছেন। 'আমাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, উভয় একজিকিউটিভ কাউন্সিল আর বিদ্যমান থাকবে না এবং উভয় দলের পদাধিকারীরা এই মুহূর্ত থেকে কার্যপরিচালনা হতে বিরত থাকবেন।' কিন্তু দুটি কমিটিকে এবং দুই প্রস্থ পদাধিকারীকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে অপসারিত করেও সন্তুষ্ট না হয়ে কে রাজা হবে আরবিট্রেটররা তাই ঠিক করবার কাজে নিজেদের নিয়োগ করলেন। একটি নতুন একজিকিউটিভ কাউন্সিল নির্বাচিত করবার জন্য কোনো সভা তো ওঁরা ডাকবেনই না পরন্তু জবরদস্তি করে নয়—পথপ্রদর্শক হিসাবে সভার সভাপতির হাতে তাঁরা একটি সীলকরা খাম দেবেন যাতে সেই সভ্যদের নাম থাকবে যাঁরা, ওঁদের মতে, নতুন একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করবেন। মনে হয়, এই ভদ্রলোকেরা যেন বিশ্বাস করেন ইংরেজি ভাষায় 'আরবিট্রেটর' এবং 'ডিক্টেটর' দুটি সমার্থক বাক্য। কিন্তু সত্য কথা বলতে—এই দুটি বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

.....পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কোনো ব্যক্তির মহত্বের মাপকাঠি হচ্ছে এই যে তিনি এমন কিছু রেখে গেছেন যা তাঁর মৃত্যুর পরেও অক্ষত থাকবে এবং মিঃ দাশের বেলায় গত বৃহস্পতিবার তাঁর স্মৃতির প্রতি যে-সকল শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে আমরা যদি তার যথার্থ বিচার করতে চাই তাহলে তাঁর শেষ জীবনের রাজনৈতিক কার্যাবলীর অন্তরে পর্যালোচনা করতে আমরা বাধ্য। তাঁর অনুগামীরা, যাঁরা কংগ্রেসকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন, তাঁদের এই নামে চিহ্নিত করা ঠিক হবে কিনা জানি না, এটা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে তিনি যা নির্মাণ করেছিলেন তার পাথরগুলি যেন একটির উপর কোনো আরেকটি কিছুতেই না থাকে। কোনো রাজার অশ্ব বাহিনী, কোনো রাজার সৈন্যবাহিনী, সকল আরবিট্রেশন কমিটিগুলি এই ভেঙ্গে পড়া বস্তুটিকে আবার দাঁড় করিয়ে দিতে পারবে না।

'আমাদের এই অভিমতে আমরা সমর্থন পাচ্ছি এমন একটি সূত্র থেকে যার সঙ্গে সাধারণত আমাদের মতের কোনো সহানুভূতি থাকে না। ইয়ং ইণ্ডিয়াতে দেখা যাচ্ছে মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন যে যতক্ষণ হিন্দু ও মুসলমানেরা নিজেদের মধ্যে শান্তি রক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টের মুখের দিকে চেয়ে

থাকবে ততক্ষণ স্বরাজের আশা করা অসম্ভব। মিঃ গান্ধী প্রচণ্ডভাবে সৎ এই জন্যে যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সকল বিবাদ শয়তান গভর্ণমেণ্টের দ্বারা উস্কানো হয়েছে নিম্ন স্তরের রাজনীতিকদের মধ্যে চালু এই প্রচার বাক্যটিতে তিনি সমর্থন দেন না। তিনি সকল বস্তুকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখেন এবং স্বীকার করেন যে, বিবাদমান দাবিদারদের উপর তথাকথিত নেতাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই এবং বলেনঃ 'এটা আমাদের চিরন্তন লজ্জা যে ঈদুল আযহার সময়ে গভর্ণমেণ্টকেই শান্তি রক্ষার ভার নিতে হয়েছে।' মিঃ গান্ধী মনে করেন যে 'দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় লড়াই করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখনই আমরা সম্বিত ফিরে পাব।' কিন্তু সেই পথে স্বরাজের প্রারম্ভকেই চিরদিনের জন্য অজানা দেশে অপসারণ করে দেওয়া হবে। এটা মনে করার কারণ নেই যে, বাংলায় কংগ্রেস দলের বর্তমান বিবাদ কোনো সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে প্রসূত। প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু গোষ্ঠীগুলির ব্যক্তিগত উচ্চাশা-জনিত পারস্পরিক শত্রুতা থেকেই তা উদ্ভূত। এই সত্যটি যদি হৃদয়ঙ্গম করা যায় তাহলে স্বরাজের স্বপ্ন আরও এক ধাপ পিছিয়ে গেল কারণ, হিন্দু নেতাদের প্রথমে নিজেদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে হবে, তার পরে তাঁরা মুসলমানদের সঙ্গে যুক্ত হবার স্তরে যেতে পারবেন। যতক্ষণ সেই সংযুক্তিকরণটি না হচ্ছে ততক্ষণ যেমন মিঃ গান্ধী বলেছেনঃ 'স্বরাজ চাওয়া অসম্ভব। এবং স্বরাজ পাওয়া তো আরও অসম্ভব।' মিঃ গান্ধী দুঃখ করেছেন যেঃ 'এমন কোনো নেতারা আমাদের নেই যাঁদের আমরা আরবিট্রেটর হিসাবে নিয়োগ করতে পারি।' বাংলায় আরবিট্রেশনের যে ফলাফল দেখা গেল তাতে একথা বলা যাবে না যে তাঁর এই ক্ষোভের কোনো সার্থকতা আছে।'

দিল্লীতে কংগ্রেসের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল ও তাঁদের সহযোগী নেতাদের অর্থাৎ 'বিগ ফাইভ'কে আগাগোড়া সমর্থন করতেন সে সম্বন্ধে স্টেটসম্যান পত্রিকার রাজনৈতিক ভাষ্যকার ২রা মার্চ লিখেছিলেন, 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ঝগড়া এক কলঙ্কময় রূপ পরিগ্রহণ করেছে। সর্বশ্রী ব্যানার্জি ও শাসমল তাঁদের অধিকৃত পদগুলি পরিত্যাগ করার কোনো লক্ষণই দেখাচ্ছেন না এবং 'বিগ ফাইভ' তথাকথিত 'কর্মীদের' সঙ্গে মিলিত হয়ে ততক্ষণ বিশ্রাম নেবেন না যতক্ষণ না ওঁদের বিতাড়িত করতে পারছেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির হস্তক্ষেপ ব্যাপারটিকে আরও জটিলতর করে তুলেছে। বর্তমানে যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কেউ যদি হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয় তাহলে আমরা আশ্চর্য হব না।' (ইংরেজির অনুবাদ)

স্টেটসম্যানের রাজনৈতিক ভাষ্যকারের মতে, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাস

আয়েঙ্গারের ইচ্ছা ছিল 'বিগ ফাইভের' হাতে বাংলার কংগ্রেসের কর্তৃত্ব তুলে দেওয়া! কিন্তু মনে রাখতে হবে, তখন কংগ্রেসের সর্বময় কর্তা ছিলেন স্বয়ং গান্ধীজী এবং তাঁর ডেপুটি ছিলেন মতিলাল নেহরু। কাজেই শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এই দুজন বড় কর্তার সম্মতি না নিয়ে যে 'বিগ ফাইভ'কে সমর্থন করতে চেয়েছিলেন এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ওদিকে 'বিগ ফাইভে'র বেশির ভাগ নেতাই তখন কংগ্রেসী রাজনীতিতে নবাগত ছিলেন। বিধান রায় তো ১৯২৬-এর শেষের দিকে কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন এবং শরৎ বসুর কংগ্রেসী অভিজ্ঞতাও ছিল খুব অল্প দিনের। কংগ্রেসের সাংগঠনিক কর্মী হিসাবে অন্য তিনজনের অভিজ্ঞতা একেবারেই ছিল না। কিন্তু 'বিগ ফাইভে'র সকল নেতার এবং এমন কি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বও নির্ভর করতো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের উপর। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী-দের দাবিতেই গান্ধীজী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে বাংলায় চিত্তরঞ্জনের উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্বাচিত করে যান। ১৯২৬-এর জুন মাসে এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে একদিকে 'বিগ ফাইভের নেতারা' অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের নেতারা একথা ঘোষণা করেছিলেন। কাজেই কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও মতিলাল নেহরু, যাঁদের সঙ্গে স্বয়ং গান্ধীজীও নিশ্চয়ই ছিলেন, যখন 'বিগ ফাইভে'র হাতে বাংলায় কংগ্রেসের কর্তৃত্ব তুলে দেবেন ঠিক করলেন—তখন তাঁরা প্রকারান্তরে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের হাতেই কর্তৃত্ব তুলে দিতে চাইলেন।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা নরহত্যা করে বা অন্যান্য হিংসামূলক পন্থায় ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন এবং তখন যে পন্থাকে তাঁরা ভালো মনে করেছেন সেই পন্থায় ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার অধিকার তাঁদের নিশ্চয়ই ছিল। আগে বলেছি, ১৯২৬-এর ফেব্রুয়ারী মাসে এক চিঠিতে মতিলাল নেহরু জওহরলালকে লিখেছিলেনঃ 'বাংলার রেভোলিউশনারীরা, দুর্ভাগ্যবশতঃ গভীরভাবে সাম্প্রদায়িক-মনোভাবাপন্ন'। মৌলানা আজাদ 'ইন্ডিয়া উইন্‌স্ ফ্রিডম' বইতে লিখেছেনঃ 'সকল শ্রেণীর রেভোলিউশনারীরা মুসলমান-বিরোধী ছিলেন।' সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা যে মুসলমান-বিরোধী ছিলেন সেটা তাঁরা প্রকাশ্যেই স্বীকার করতেন। এবং তাঁদের এই মুসলমান-বিরোধিতার জন্যও তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তাঁদের মতে ভারতের পক্ষে যে পন্থা মঙ্গলজনক ছিল তাঁরা সরল বিশ্বাসে সেই পন্থারই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু কংগ্রেসের উচ্চতর নেতারা এবং এঁদের মধ্যে স্বয়ং গান্ধীজীও ছিলেন—যাঁরা অহর্নিশ অহিংসার বুলি আউড়িয়ে দেশময় একটা প্রচারের বেড়াজাল তৈরি করেছিলেন এবং যাঁরা ঘন ঘন মুসলমান প্রেমের কথা জাহির করে মুসলমান সমাজের সমর্থন দাবি করতেন—

তাঁরা যে গোপন চক্রান্ত করে হিংসাপন্থী ও মুসলমান-বিরোধী বিপ্লবীদের হাতে বাংলার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, এর মধ্যে কোনো ভণ্ডামি ছিল কিনা, সে বিচারের ভার আমি ছেড়ে দিলাম ভবিষ্যত ইতিহাসের হাতে।

১৯২৬-এর সাধারণ নির্বাচনে যখন নাড়াজোলের জমিদার দেবেন্দ্রলাল খাঁকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের বিরুদ্ধে কংগ্রেসে মনোনয়ন দিয়ে দাঁড় করানো হলো, তখনও সেটা প্রধানত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দাবিতেই তা করা হয়েছিল। নাড়াজোলের এই দেবেন্দ্রলাল খাঁ ১৯২৫-এর ২৪শে জানুয়ারী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কর্তৃক কাউন্সিলে উত্থাপিত সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বাংলার সকল রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। ১৯২৫-এ বাংলার গভর্ণর লর্ড লিটন মেদিনীপুর সফরে গেলে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান বীরেন্দ্রনাথ শাসমল লর্ড লিটনকে অভ্যর্থনা জানাতে অস্বীকার করেন এই কারণে যে, লর্ড লিটন সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বাংলার বহু তরুণ কর্মীকে বিনা বিচারে বন্দী করে রেখেছিলেন। কিন্তু এই দেবেন্দ্রলাল খাঁ লর্ড লিটনকে তাঁর মেদিনীপুরের 'গোপ প্রাসাদে' নিমন্ত্রণ করে বিরাট ভোজসভায় আপ্যায়িত করেছিলেন। ১৯২৬-এর জুন মাসে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পুন-নির্বাচিত হলে বাংলা সরকার (সম্ভবত লিটনের প্রতি অপমানের প্রতিশোধ হিসাবে) তাঁর নির্বাচন নাকচ করে দেন এবং দেবেন্দ্রলাল খাঁকে জেলা বোর্ডের সরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। দেশের ও জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক এই দেবেন্দ্রলাল খাঁকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা দাঁড় করালেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের বিরুদ্ধে এবং যে সুভাষচন্দ্রের মুক্তির বিরোধিতা করে দেবেন্দ্রলাল খাঁ সরকার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তাঁরই পূজনীয় মেজদা শরৎচন্দ্র বসু দেবেন খাঁর প্রধান মুরুব্বি হয়ে দাঁড়ালেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আগে থেকে এই মনোনয়ন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকেই দিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু; সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দাবিতে সেই মনোনয়ন বদল করে যখন দেবেন্দ্রলাল খাঁকে দেওয়া হলো, তখন অনুরুদ্ধ হয়েও মতিলাল নেহরু এর বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেন।

এই প্রসঙ্গে ১৯২৬-এর ১১ই নভেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয়তে লিখেছিলঃ 'নির্বাচন নিকটবর্তী হচ্ছে এবং আগামী দু' সপ্তাহের মধ্যে নামের শেষে তিনটি আদ্যাক্ষর ব্যবহারের অধিকার লাভের অসুখকর রেষা-রেষির ইতি হবে। কিন্তু বাংলায় যেভাবে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে কংগ্রেসের মনোনয়ন বিলি করা হয়েছে সে প্রসঙ্গ বিনা মন্তব্যে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। সাধারণ বুদ্ধির কাছে এটি নিছক বিস্ময়কর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কংগ্রেসের পরিজ্ঞাত শত্রুকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র

কোনো কর্তার পছন্দসই নয়, সেই অপরাধে কাউকে কাউকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আরেক জায়গায় যে ব্যক্তি সরকারের দমনমূলক নীতিগুলি সমর্থন করেছিলেন, তাঁকে মনোনীত করা হয়েছে এবং যিনি কখনও তা করেন নি এবং সর্বক্ষণ জনসাধারণের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য কাজ করে এসেছেন তাঁর সঙ্গে শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করা হচ্ছে। সকল গ্রহেতেই দেবতাদের কার্যকলাপ রীতিমত রহস্যাবৃত।'

কংগ্রেস যে দেশের ও জাতির প্রতি একজন বিশ্বাসঘাতককে সমর্থন করবে, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছিলেন। ধনী জমিদারের বহু অবৈধ পন্থার কারণে এবং ছ বছরের ক্রমাগত অসহযোগের কারণে, তিনি তখন নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হওয়ায় ও ধনী জমিদারের সীমাহীন ধন-বিতরণের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারায় নির্বাচনে হেরে যান। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, ভবিষ্যতের ইতিহাস এটা কংগ্রেসের আদর্শচ্যুতির দৃষ্টান্ত হিসাবেই দেখবে এবং প্রকৃত কংগ্রেসের পরাজয় হিসাবেই গ্রহণ করবে এবং তিনি যে কংগ্রেসের এই আদর্শচ্যুতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, সেটাকে তাঁর নৈতিক জয় হিসাবে গণ্য করবে। আসলে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কংগ্রেস মনোনয়ন দেবেন খাঁকে বিক্রি করা হয়েছিল।

কৃষ্ণনগরের প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ নিয়ে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীরা অনেক বিষোদ্গার করেছিলেন এবং এখনও করেন। কিন্তু তাঁর অভিভাষণে তিনি যা বলেছিলেন, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা সেই আদর্শের কথাই গোপনে বলাবলি করতেন, যদিও প্রকাশ্যে বলতে সাহস করতেন না। অভিভাষণের ভাষা ছিলঃ 'নন-ভায়েলেণ্ট নন-কোঅপারেশনের দ্বারা ইউনিয়ন অটোনমি, ডিষ্ট্রিক্ট অটোনমি, প্রভিনসিয়াল অটোনমি এমন কি হয়ত ডোমিনিয়ন স্টেটাস বা ইকুয়্যাল পার্টনারশিপ উইদিন দি বৃটিশ এম্পায়ার লাভ হতে পারে, কিন্তু বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ইহার দ্বারা কিছুতেই অর্জন করা যাইবে না।...বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা টেরোরিজম বা এনার্কিস্ট কনস্পিরেসির দ্বারা কস্মিনকালেও অর্জিত হইবার সম্ভাবনা নাই। সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের লক্ষ্য প্রচলিত শাসন প্রণালীকে সংশোধন করা, তাহার আমূল উচ্ছেদ সাধন করা নহে। সুতরাং বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইলে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের দ্বারাও তাহা অর্জিত হইবে না! বাংলা তথা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিবার একটিমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা রহিয়াছে এবং তাহাকে লোকে চলতি ভাষায় রেভোলিউশন বা বিপ্লব বলে।... আমি বিশ্বাস করি যে, আমার পরাধীন জন্মভূমিকে স্বাধীন করিবার আমার যদি ডিভাইন রাইট থাকে, তবে রেভোলিউশনের সাহায্যে তাহা কার্যে পরিণত

করিবারও আমার ডিভাইন রাইট রহিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, রেভোলিউশন বা বিপ্লব হিংসামূলক কেননা ইহাতে রক্তপাত হয়, মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি হয়। বাংলার রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতিরূপে আমি আজ সবিনয়ে তাহার প্রতিবাদ করিতেছি। রক্তপাত হইলেই যে তাহা হিংসাপ্রসূত—ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে না।...রক্তপাত মাত্রই হিংসা-মূলক নহে। তারপর মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি হইলেই যে তাহা হিংসাপ্রসূত, তাহাই বা কেমন করিয়া বলি?

কোন পাষণ্ড যদি পথিপার্শ্বে কোন দুর্বল অবলাকে একলা পাইয়া তাহার উপর অত্যাচারের চেষ্টা করে এবং আমি যদি বিনা মারামারি বা কাটাকাটিতে তাহাকে সে কার্য হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারি, তবে আমার সেই মারামারি ও কাটাকাটিকে কেহ কি হিংসামূলক বলিবেন? হিংসার এইরূপ কদর্থে জগতের সৎ প্রবৃত্তিসমূহের যাবতীয় উৎস অচিরে শুষ্ক ও নীরস হইয়া যাইবে। ভিতরের উদ্দেশ্যকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া আমরা যদি কেবল বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে পদে পদে আমরা ভ্রমে নিপতিত হইব। আমি একথা শতবার স্বীকার করি যে, হিংসা ভারতের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কিন্তু সে কারণে রেভোলিউশন বা বিপ্লব হিংসামূলক কে বলিবে? কিম্বা তাহা ভারতের আদর্শবিরুদ্ধ হইবে কেন?...রেভোলিউশনের জন্য এ দেশকে প্রস্তুত করিতে হইলে আমাদের যে নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক শক্তির আবশ্যক হইবে, তদ্দ্বারা আমরা রেভোলিউশনের পরের সমস্ত সমস্যা সমাধান করিতে পারিব। অন্য সমস্ত পন্থাকে যে পরিমাণে ধ্বংস-মূলক বলা যায়, এই পন্থাকে তুলনায় তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে গঠনমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। কারণ শর্টকাটে পৃথিবীর কোন দেশে রেভোলিউশন কখনও জয়যুক্ত হয় নাই। এখানেও বিনা গঠনমূলক কার্যে তাহা হইবে না।'

পরবর্তী জীবনে ব্যারিস্টার হিসাবে বীরেন্দ্রনাথ বিনা পারিশ্রমিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার তিন প্রধান আসামী অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল ও গণেশ ঘোষকে সমর্থন করে তাঁদের ফাঁসি থেকে বাঁচিয়েছিলেন। এ ছাড়া স্টেটসম্যান-সম্পাদককে গুলী-মারা, ডগলাস হত্যা, আরামবাগ রাজনৈতিক ডাকাতি প্রভৃতি মামলায় তিনি বিনা পারিশ্রমিকে আসামীদের সমর্থন করে-ছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা এর জন্য তাঁর প্রতি এতটুকু কৃতজ্ঞতা দেখান নি বরং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার ইতিহাস থেকে তাঁর নাম সযত্নে বাদ দেওয়া হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা যে-আদর্শের প্রচারক বলে দাবি করতেন, বীরেন্দ্র-নাথ শাসমল কৃষ্ণনগর অভিভাষণে সেই কথাই বলেছিলেন। কিন্তু

সন্ত্রাসবাদের অন্য কর্মপন্থার সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেনঃ 'ক্রমাগত চুরি, ডাকাতি ও নরহত্যার কাজ নৈতিক অবনতির পথ খুলে দেয়। উন্মুক্ত বিপ্লবের পথে যে বীরত্বের প্রকাশ দেখা যায়, এই ধরনের গুপ্ত পথের কার্যাবলীতে বারংবার যাঁরা লিপ্ত থাকেন, তাঁরা অবশেষে সমাজ-বিরোধীদের চরিত্র গ্রহণ করেন।' সন্ত্রাসবাদীরা তাঁর এই মন্তব্যে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং ক্ষমা প্রার্থনার দাবি জানান। সরোজিনী নাইডুর বিশেষ অনুরোধে বীরেন্দ্রনাথ সভাপতির অভিভাষণ থেকে তাঁর এই মন্তব্যগুলি বাদ দিয়ে দেন এবং সেই কারণে পংক্তিগুলি পাঠে বিরত থাকেন।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এতে সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁদের দাবি ছিল, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এই সকল মন্তব্য প্রত্যাহারই করবেন না, তার জন্য তাঁকে ক্ষমাও চাইতে হবে। আমরা এর আগে দেখেছি অমৃতবাজার পত্রিকা ও বেঙ্গলী লিখেছিলঃ যদি কৃষ্ণনগরের মন্তব্যগুলি তিনি প্রত্যাহার করে নেন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাহলে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তাঁকে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সম্পাদকের পদে নির্বাচন সমর্থন করবেন। বীরেন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদীদের সন্তুষ্ট করবার জন্য লিখিতভাবে তাঁর কৃষ্ণনগরের সকল মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেন এবং তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। জাতীয় ঐক্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি নিজের ব্যক্তিগত মর্যাদাকে বলি দিতেও দ্বিধা করেন নি। কিন্তু তবুও সন্ত্রাসবাদীরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন এবং তাঁকে সমর্থন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কংগ্রেসের সাধারণ সভায় তাঁর বিরুদ্ধে এবং জমিদার অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধি বিগ ফাইভের পক্ষে ভোট দিলেন।

মুসলিম বিরোধীদের প্রাধান্য

এ সবের আসল কারণটি কি এবং তার সঙ্গে ভারত-বিভাগের সম্পর্ক কি—সেটাই এবার বলব। বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির ২৬শে জুন (১৯২৭)-এর সভায় সন্ত্রাবাদী বিপ্লবী দল ও তাদের সহযোগী নেতারা যখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি নিযুক্ত আরবিট্রেশন বোর্ডের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করলেন এবং নিজেদের ইচ্ছামত কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও তাঁর সহকর্মীদের সমূলে বিতাড়িত করলেন, তখন দি বেঙ্গলী লিখেছেনঃ 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ঝগড়া মিটে গেল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যেভাবে ঝগড়া মেটাতে চেয়েছিলেন সেভাবে হল না বটে, তবুও একটি প্রকাশ্য কেলেংকারির ইতি হল। মিঃ বি এন শাসমল এবং তাঁর সহকর্মীদের বঙ্গীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। এবং যে সকল কর্মকর্তা কিছু দিন আগে মিঃ নির্মল চন্দ্রের বাড়ির পর্দা—মিটিংয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁরাই পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।...বঙ্গীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির এই নবরূপায়ণের দুটি প্রত্যক্ষ ফল আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—শাসমলপন্থীরা কংগ্রেসের কার্যক্রম থেকে দূরে সরে দাঁড়াবেন এবং যে-সামান্য কয়েকজন মুসলমান কংগ্রেসের সঙ্গে এখনও জড়িত আছেন তাঁরা এবার কংগ্রেস ছেড়ে চলে যাবেন। মিঃ আক্রাম খাঁ যে কারণে কংগ্রেস ছেড়ে দেবেন বলে বলেছেন, তার সমর্থন না করলেও ঘটনা হিসাবে এটা থেকে যাবে যে, বঙ্গীয় কংগ্রেসের বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতি বাংলার মুসলমানদের কাছে টেনে আনার পরিবর্তে দূরে সরিয়ে দেবে অনেক বেশি।' (২৮.৬.২৭—ইংরেজী অনুবাদ)

স্টেটসম্যান লিখেছিলঃ 'যেমনটি আশা করা গিয়েছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যনির্বাহিক ও সাধারণ কমিটির নির্বাচন বিগ ফাইভের দল নিজেদের ইচ্ছামত চালনা করেছে এবং নিজেদের বাছাই করা লোক দিয়ে উচ্চ-পদগুলি পূরণ করতে পেরেছে। প্রসঙ্গত, আরবিট্রেটররা যে-কমিটি নিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তার প্রতি এঁরা কোন মর্যাদাই দেয়নি। আরবিট্রেটররা যে সভ্যতালিকা পেশ করেছিলেন সেটি শাসমলপন্থীদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল, কিন্তু ভোটগ্রহণের সময় এই তালিকা পরাজিত হয়। তবুও মনে হয়, আরবিট্রেটররা তাঁদের উদ্দেশ্যে সফল হয়েছেন। তাঁরা পুরনো কমিটি দুটিকে বাতিল করে দিয়েছেন। এঁদের প্রয়োজনীয়তা সেইখানেই শেষ হয়েছিল, কারণ

কংগ্রেসের বৃহত্তর দলটি যখন দেখতে পেল যে, তারা নিজেদের লোককেই নির্বাচিত করতে সক্ষম তখন এ'দের নিকট থেকে কোন উপদেশ গ্রহণ করতে তারা মোটেই ইচ্ছুক ছিল না। কংগ্রেসের দিক থেকে দুর্ভাগ্য হচ্ছে এইটাই যে, যে পদ্ধতিতে নির্বাচনগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে এর কর্মী-দলে একটি ব্যাপকতর এবং গভীরতর ভাঙ্গন এবং সমর্থক দল থেকে মুসলমানদের কার্যকরী অপনয়ন সুনিশ্চিত হল।' (২৮.৬.২৭—ইংরেজির অনুবাদ)

মুসলমান সমাজের বিশিষ্ট মুখপাত্র দি মুসলমান লিখেছিলঃ 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি পুনর্গঠিত হয়েছে এবং বাংলায় কংগ্রেসের দ্বন্দ্বময় অবস্থার ইতি হয়েছে। কোন আপসমীমাংসা সম্ভব হয় নি এবং আরবিট্রেশন ও তার আনুষঙ্গিকের কোন ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, একটি চিন্তাধারার কর্মীরা সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হয়েছেন এবং সেই চিন্তাধারার কর্মীরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটির সম্পূর্ণ দখল পেয়েছেন যাঁদের মধ্যে মুসলমান-বিরোধীদের প্রাধান্য রয়েছে।

খবর বেরিয়েছে যে, মৌলানা মহম্মদ আক্রাম খাঁ, যিনি এই রবিবার কার্যনির্বাহক সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি পদত্যাগ করেছেন এই কারণে যে, কার্যনির্বাহক সমিতিতে হিন্দু মহাসভাপন্থীদের প্রাধান্য বেশি। এটা লক্ষ্য করে প্রচুর আনন্দ হচ্ছে যে, তিনি অবশেষে এতদিন পরে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, বাংলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে এর কার্যনির্বাহক সমিতিতে, কোন সত্যকার জাতীয়তাবাদীর স্থান নেই।' (২৮.৬.২৭—ইংরেজির অনুবাদ)

সেই স্বদেশী যুগ থেকেই মুসলমানরা স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে দূরে সরে ছিল কারণ—তিলক, অরবিন্দ, বিপিন পাল স্বদেশী আন্দোলনকে উজ্জীবিত করবার জন্য হিন্দু ধর্মদর্শনের বহু আদর্শকে এর মধ্যে উপ্ত করেছিলেন। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন নিঃসন্দেহে মুসলমান-বিরোধী ছিল এবং সেই কারণে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বার বার লিখে গেছেন যে, মুসলমানরা এই আন্দোলনে যোগ দেয় নি। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতারা হিন্দু-মুসলমানের বাহ্যিক মিলনটাই বড় করে দেখেছিলেন। কিন্তু বঙ্গ বিভাগ হলে পূর্ব বাংলায় মুসলমানরা যে আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা প্রশস্ত সুযোগ পেত সে প্রশ্নটি তাঁরা বিচার করলেন না। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তখন থেকেই তাঁদের মুসলমান-বিরোধী চরিত্র পোষণ করে এসেছেন।

১৯২১-এ যখন কংগ্রেসের গান্ধীযুগ শুরু হল এবং গান্ধীজী স্বরাজ্য লাভের আন্দোলন শুরু করলেন, তখন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এর মধ্যে মিশে গেলেন এবং চিত্তরঞ্জনের সহায়তায় বাংলায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি দখল করে বসলেন। ফল এই হয়েছিল যে, মুসলমানরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

১৯২৭-এর এপ্রিলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর মাজু অধিবেশনে সভাপতি উত্তরবঙ্গের জননায়ক যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেনঃ 'অতীব দুঃখের সঙ্গে আমাকে আজ উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, দেশবাসীর গত চল্লিশ বছরের ঐকান্তিক সাধনায় যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, মুসলমানরা প্রায় সম্মিলিতভাবে তা ত্যাগ করে চলে গেছেন। জনসাধারণের বিভিন্ন গোষ্ঠী স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে যদি লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য পৃথক পৃথক পন্থা গ্রহণ করে, তাহলে আমাদের অভিযোগ করবার কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু যদি মুসলমানরা শুধু মুসলমানদের স্বাধীনতার জন্য ভাবিত হন এবং যদি হিন্দুরাও সেইভাবে এক হিন্দু স্বরাজের জন্য প্রচেষ্টা চালান, তাহলে এই পারস্পরিক সন্দেহ দূরীকরণের জন্য অভিযান চালাবার জরুরী প্রয়োজনীয়তা আছে। মুসলমানরা সদলবলে কংগ্রেস পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ায় কংগ্রেস মনোনয়নে মাত্র একজন মুসলমান বেঙ্গল কাউন্সিলে নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন। শুধু কংগ্রেসপ্রার্থী ছিলেন বলেই বহু খ্যাতনামা মুসলমান প্রার্থী সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন।' (১৭.৪.২৭ বেঙ্গলীতে ইংরেজি রিপোর্টের অনুবাদ)

এই নিরতিশয় বিপজ্জনক অবস্থার দূরীকরণের জন্য এবং বাংলায় এক সত্যকার গণতান্ত্রিক স্বরাজ প্রতিষ্ঠার কল্পনা নিয়ে চিত্তরঞ্জন ১৯২৩ সালে হিন্দু-মুসলিম চুক্তি বা বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদন করেছিলেন। হিন্দু-মুসলিম চুক্তির সমর্থনে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেনঃ 'যাঁরা এই হিন্দু-মুসলিম চুক্তির বিরোধিতা করছেন, তাঁরা বিদেশী সরকারের চর হয়ে কাজ করছেন।' কিন্তু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল ভারতের জাতীয় ইতিহাসে চিত্তরঞ্জনের এই বৃহত্তম অবদানটিকে ধ্বংস করবার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন এবং তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন চিত্তরঞ্জনের প্রিয় পঞ্চ শিষ্য—বিগ ফাইভঃ বিধান রায়, শরৎ বসু, তুলসী গোস্বামী, নির্মল চন্দ্র ও নলিনী সরকার। কৃষ্ণনগর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা সম্মিলিতভাবে সেই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সম্মেলন হঠাৎ ভেঙ্গে যাওয়ায় তাঁরা সেটা সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে পারলেন না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ১৩ই জুন ১৯২৬-এর সাধারণ সভায় শরৎচন্দ্র বসু প্রস্তাব করলেনঃ হিন্দু-মুসলিম চুক্তি আজ আর দেশবাসীর বিবেচ্য বিষয় নয়। (অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলতে চাইলেন যে, চুক্তিটি বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি সফল হলেন না।)

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ও তাঁদের সহযোগী নেতারা অচিরেই বুঝতে পারলেন যে, বাংলায় হিন্দু-মুসলিম চুক্তির প্রধান শক্তিস্তম্ভ হচ্ছেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। এবং দেখতে পেলেন, বাংলার প্রায় সমগ্র মুসলমান সমাজ তাঁর

এই চিন্তায় একতাবদ্ধ যে, দরিদ্র দেশবাসীর আহার্য লবনটুকু ট্যাক্সের আওতার বাইরে রাখা উচিত। গত পঁচিশ বছর ধরে অতীতের কংগ্রেসের প্রতিটি অধিবেশনে এই অভিমতই ঘোষণা করা হয়েছে। চার বছর আগে যখন সার বেসিল ব্ল্যাকেট লবন ট্যাক্স বাড়িয়ে মণপ্রতি আড়াই টাকা করেছিলেন তখন ভারতীয় জনমতের ক্ষোভ খুব প্রচন্ডভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। এবং এটাই কি সত্যি নয় যে, স্বরাজপন্থীরা গভর্ণমেণ্টের সমর্থকদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির বিরুদ্ধে এইটিকেই নির্বাচনী প্রশ্ন হিসাবে তুলে ধরে কাজে লাগিয়েছেন। ওদিকে ওই বছরেই এসেম্বলি এটি কমিয়ে দিয়ে মণপ্রতি দশ আনা করে দিয়েছিল। কিন্তু ফিনান্স বিল যখন কাউন্সিল অফ স্টেট থেকে এসেম্বলিতে ফিরে এল, তখন স্বরাজ পন্থীরা কি করলেন? মিঃ হর্ণিম্যান বলছেনঃ "লবন ট্যাক্স বর্দ্ধিত করে বিলটি পাশ হয়েছিল নয় ভোটের সংখ্যাধিক্যে এবং কংগ্রেস দলের বহু সদস্য লবন ট্যাক্স এবং কংগ্রেসের নির্দেশাবলীকে তাদের মাথার উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঠিক আগের দিনেই দিল্লী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।" কি করে এটা সম্ভব হয়েছিল?'

নৈতিক অধঃপতনের এই রাজনৈতিক আদর্শের সূত্রপাত এদেশে করেছিলেন দুই নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু। বাংলা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কাউন্সিলে ভোটে জয়লাভ করবার জন্য চিত্তরঞ্জন প্রয়োজনীয় সদস্যের ভোট নগদ টাকা দিয়ে কিনতেন অথবা কোনো কোনো দ্বিধাচিত্ত সদস্যদের নিকট তার কর্মী-বাহিনী পাঠিয়ে ভয় প্রদর্শন করে কংগ্রেস পক্ষে ভোট দিতে বাধ্য করতেন—চিত্তরঞ্জনের এই কর্মী বাহিনীর যাঁরা নেতৃত্ব করতেন তাঁরাই ছিলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল। ওদিকে মতিলাল নেহরু দলের জন্য নগদ টাকা নিয়ে কংগ্রেস মনোনয়ন বিক্রী করতেন দেবেন্দ্রলাল খাঁর মত বড় বড় জমিদারকে, যাঁদের অতীত রাজনৈতিক জীবন যথেষ্ট কলঙ্কময় ছিল। এমনকি শেষে, তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের সংগে গোপন বন্দোবস্ত করে লবন ট্যাক্স মণ প্রতি দশ আনা থেকে আড়াই টাকায় বাড়াতে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করেছিলেন।

ওদিকে ১৯২৮-এর বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন পাশ করার সময়ে সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি বাংলার কংগ্রেস নেতারা বাঙলা গভর্নমেণ্টের সংগে ভোট দিয়েছিলেন, কারণ এই আইনে প্রজা ও কৃষকের উপর অবাধ শোষণের অধিকার জমিদারকে দেওয়া হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি কংগ্রেস নেতারা এই আইন পাশ করবার জন্য গভর্ণমেণ্টের সংগে ভোট দিতে গেলেন দেখে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মুসলমান কৃষক বুঝতে পারলেন যে, কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফাঁকা বুলির ভিতরে কতখানি ভাঁওতা

পারি, দলে যে-ধরণের কাজ-কর্ম চলছে তা নিছক বিশ্বাসঘাতকতা, যদিও সেটা কংগ্রেসের অসহযোগনীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞতাপ্রসূতও হতে পারে।

কমিয়ে দেওয়া লবন ট্যাক্স বাড়ানোর ব্যবস্থা সম্বলিত ফিনান্স বিলটির তৃতীয় দফা পর্যালোচনার সময়ে আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে, আমাদের একজন তরুণ সদস্য নিজের বক্তব্য বলবার জন্য ছ'বার উঠে দাঁড়িয়েও স্পীকারের অনুমতি পাননি। তিনি অবশ্য দলনেতার (মতিলাল নেহরুর) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং তিনি যেন বক্তৃতা দিয়ে বিতর্ককে দীর্ঘায়িত করা থেকে বিরত থাকেন তার জন্য নেতার নিকট থেকে ঘন ঘন লিখিত নির্দেশ পেতে লাগলেন। যে সকল তরুণ সদস্য তাঁদের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য উদগ্রীব, তাঁদের এইভাবে নিরুৎসাহ এবং ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসের আদর্শকে রূপায়িত করবার প্রচেষ্টার এই প্রহসন শুধু এই ভয়ংকর ফলশ্রুতিতেই পৌঁছে দিল যে, সেই উৎসাহী তরুণ কংগ্রেস সদস্যটি যখন স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার আশায় ষষ্টতমবার উঠে দাঁড়ালেন, তখন কংগ্রেস দলের হুইপ এবং গভর্ণমেণ্ট হুইপ পূর্ব ব্যবস্থামত এক সংগে উঠে দাঁড়িয়ে বিতর্ক বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব করলেন।

কিন্তু আমার ভুল হয়েছিল। এইটিই শেষের কথা ছিল না। এর চেয়েও আরও বেশি ভয়াবহ কিছু ঘটেছিল। লবন ট্যাক্স বর্দ্ধিত করে যে ফিনান্স বিল আনা হয়েছিল সেটি শেষকালে নয় ভোটের সংখ্যাধিক্যে পাশ করানো হয়েছিল এবং কংগ্রেস দলের বহু সদস্য লবন ট্যাক্স ও কংগ্রেসের নির্দেশাবলীকে তাদের মাথার উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আগের দিনেই দিল্লী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। নৈতিক অধঃপতনের এই বিভ্রান্তিকর দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্যে রূঢ় বাক্য অপচয় করে লাভ নেই। আমাদের এখন শুধু এই প্রশ্নটিই বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, কংগ্রেস কোথায় নেমে চলেছে?...এসেম্বলি এবং কাউন্সিলগুলি এখন কংগ্রেসকে দখল করে বসে আছে এবং দেশে কোনো প্রকৃত কর্মপ্রচেষ্টার চিহ্নমাত্র নাই।"

বি. জি. হর্নিম্যানের উল্লিখিত প্রবন্ধের আলোচনায় ষ্টেটসম্যান পত্রিকার রাজনৈতিক তথ্যকার ১৯২৭-এর ৮ই এপ্রিল লিখেছিলেনঃ "কংগ্রেস নেতারা জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে মিঃ বি. জি. হর্নিম্যান কিছুদিন আগে বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান নিউজ হেরাল্ডে তাঁর স্বাক্ষরিত এক প্রবন্ধে প্রকটভাবে তারই বিবরণ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় এসেম্বলিতে লবন ট্যাক্সের উপরে বিতর্কের উল্লেখ করেছেন। লর্ড বার্কেনহেড, আমলা-তন্ত্র এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলির অভিমত যাই হোক না কেন—এটি একটি অবিসম্বাদিত সত্য যে, ভারতীয় জনগণের সকল দলের অভিমত

পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। সেই জন্য সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ও তাঁদের সহযোগী নেতারা ঠিক করলেন যে, বীরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনটি চির-দিনের জন্য ধ্বংস করে দিতে হবে। যাতে তিনি আর কোনোদিন মুসলমানদের হয়ে ওকালতি করতে না পারেন।

এই সত্যটি গোপন থাকলো না, প্রায় সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়লো।

সুদূর লাহোরের সিভিল এন্ড মিলিটারি গেজেট লিখলঃ 'কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটিগুলির পক্ষে আভ্যন্তরীণ কলহে বিদীর্ণ হওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। গত বছর পাঞ্জাব কমিটিতে এই ধরণের একটা সংঘাত বেধেছিল এবং বঙ্গীয় কমিটি এখন তার চেয়েও সঙ্গীন অবস্থায় পড়েছে। পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীগুলি হয় কমিটির অফিস-বাড়ি গায়ের জোরে দখল করার কাজে বা অপর পক্ষকে তালা বন্ধ করে বাইরে আটকে দেবার কাজে বেশি সময় ব্যয় করে বলে দেখা যাচ্ছে। বিরোধের সমস্ত সূত্র অনুসরণ করা কঠিন এই জন্য যে, দুই গোষ্ঠী সংবাদপত্রে পরস্পর বিরোধী বিবৃতি প্রচার করেছেন। কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার যে, বাংলায় স্বরাজ্য দলের প্রধান ব্যক্তিরা যে কোনো উপায়ে মিঃ বি এন শাসমলকে বিতাড়িত করতে বদ্ধপরিকর। গত কয়েক মাস ধরেই বিবাদটা চলছিল এবং তার ফলে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলেরও দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কার্যনির্বাহক সমিতির সৃষ্টি হয়েছিল। মিঃ শাসমলের অমার্জনীয় অপরাধ হচ্ছে এবং তাঁর সমাজচ্যুতির প্রধান কারণটি হচ্ছে গত প্রাদেশিক সম্মিলনীতে তাঁর সভাপতির অভিভাষণ, যাতে চরমপন্থী মতবাদের সমালোচনা করবার দুঃসাহস তিনি দেখিয়েছিলেন। একথা সত্য যে, তিনি পরে সেই আপত্তিজনক পংক্তিগুলি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এবং মোটামুটি নির্দোষ আভরণে ভূষিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু এই দুঃখ প্রকাশ স্পষ্টত তাঁর অপরাধ মোচনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না এবং তাঁর ও তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে আক্রোশ অখর্বিত উদ্যমের সংগে পোষণ করা হচ্ছে।' (স্টেটসম্যান ৮ মার্চ ১৯২৭ থেকে উদ্ধৃত —ইংরেজির অনুবাদ)

বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল হেরাল্ড লিখলেনঃ 'কংগ্রেসের ভবিষ্যত কোন পথে যাবে সে সম্বন্ধে বঙ্গদেশ শীঘ্রই সমগ্র দেশকে এক সুনিশ্চিত নেতৃত্বদানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কিছুদিন থেকে এটা ক্রমাগত পরিস্ফুট হয়েছে যে, নেতৃত্বদান বিষয়ে কংগ্রেস দুর্বল। কংগ্রেসের বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতি নিজেদের স্বৈরাচারমূলক নীতি এবং দুষ্টবুদ্ধিজনিত কারচুপির দ্বারা সাধারণ কর্মীদলের সমর্থন হারিয়েছে এবং তাদের আস্থা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। কিন্তু এসব কথার বিশেষ কোনো মূল্য নেই। এমনকি বহুদিন আগে মিঃ সি আর দাশের সময়তেই বাংলায় যুব সমাজের মধ্যে একটা গুঞ্জরিত

অসন্তোষ ছিল। শুধুমাত্র মিঃ দাশের প্রচন্ড ব্যক্তিত্বই তাদের লম্ফমান উচ্চাশাকে দাবিয়ে রাখতে এবং তাদের অসন্তোষকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে বাধা দিতে সক্ষম হয়েছিল।' (১৭.২.১৯২৭ স্টেটসম্যান থেকে)

১৯২৭-এর ২৩ জানুয়ারীর এক সমীক্ষায় স্টেটসম্যান পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা লিখেছিলেন যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সদস্য-দের মধ্যে এবং কার্যনির্বাহক সমিতিতেও ভূতপূর্ব রাজবন্দী অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সংখ্যা এত নগণ্য ছিল যে, দলগতভাবে তাঁদের একার পক্ষে কোনো কার্যক্রম সফল করার সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই তাঁরা যোগ দিলেন 'বিগ ফাইভের' দলের সঙ্গে যাতে বাংলায় কংগ্রেস কর্মীদের একক বৃহত্তম ও সুসংগঠিত দল অর্থাৎ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের দলটিকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করা যায়।

নিখিল ভারত কংগ্রেস নেতারা বিশেষ করে মতিলাল নেহরু ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সাহায্যপুষ্ট 'বিগ ফাইভের' দলকেই পেছন থেকে কলকাটি নেড়ে সমর্থন করতে লাগলেন। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কেন্দ্রীয় সংস্থা কংগ্রেস কর্মী সংঘ প্রস্তাব নিয়েছিল যে, ১৯২৬-এর সাধারণ নির্বাচনে যে সকল প্রার্থী চিত্তরঞ্জনের হিন্দু-মুসলিম চুক্তিকে সমর্থন করবেন, কর্মী সংঘ নির্বাচনে তাঁদের বিরুদ্ধে লড়বেন। তাঁদের দাবিতে যখন মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সরকারী চেয়ারম্যান ও লর্ড লিটনের বিভিন্ন দমনমূলক নীতির প্রকাশ্য সমর্থনকারী দেবেন্দ্রলাল খাঁকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হোল, তখন মতিলাল নেহরুও এই জমিদারের পক্ষে চলে গেলেন। মারা যাওয়ার আগে মতিলাল এই জমিদারের বাড়িতে চিকিৎসিত হয়েছিলেন।

১৯২৭-এ কর্পোরেশন নির্বাচনের মুখে কংগ্রেসের সম্পাদক হিসাবে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল যখন নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের কথা ঘোষণা করলেন, তৎক্ষণাৎ দিল্লীতে মতিলাল নেহরুর পরামর্শে জরুরী ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডেকে অগণতান্ত্রিকভাবে এক নতুন ইলেকশন বোর্ড গঠন করে দেওয়া হোলো যার সম্পাদক হলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কর্মী সঙ্ঘের সম্পাদক সুরেশচন্দ্র দাশ। ১৯২৬-এর জুলাই মাসে বগুড়ায় এক প্রকাশ্য জনসভায় সরোজিনী নাইডু বলেছিলেনঃ 'কংগ্রেস কর্মী সংঘের সভ্যদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশজন পুলিশের গুপ্তচর।' তিনিও মতিলালের সঙ্গে মিলে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন।

২৭-এর জুন মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা নিযুক্ত আরবিট্রেশন বোর্ড যেভাবে বঙ্গীয় কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব মীমাংসার নির্দেশ দিলেন, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল ও তাঁদের সহযোগী নেতারা তা মানলেন না এবং না মেনে নিখিল ভারত কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই গেলেন। সেই

বিধিবহির্ভূত কাজের দ্বারাই তাঁরা বঙ্গীয় কংগ্রেসের একক বৃহত্তম দলটিকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা করলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেসের নেতারা—মতিলাল নেহরু, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এমন কি গান্ধীজীও নীরবতার মাধ্যমে এতে তাঁদের সম্মতি জানালেন।

একটি অত্যন্ত সংখ্যালঘুদলকে অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলটিকে অগণতান্ত্রিক উপায়ে বাংলায় কংগ্রেসের সর্বময় কর্তা করে দিলেন দিল্লীতে কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাংলার সমগ্র মুসলমান সমাজ যেমন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের পেছনে দাঁড়িয়েছে তেমন প্রায় সমস্ত শিক্ষিত হিন্দু সমাজ দাঁড়িয়েছে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের পিছনে এবং তার কারণটি হচ্ছে যে, তাঁরা চিত্তরঞ্জনের হিন্দু-মুসলিম চুক্তির বিরোধী ছিলেন।

এ সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকা পরিষ্কার করেই লিখেছিলঃ ভারতের প্রত্যেকটি লোক জানে এই চুক্তির দ্বারা কত বিরাট ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। মুসলমানেরা আগে কখনও মসজিদের সামনে বাজনা বাজালে আপত্তি করত না। এই চুক্তিতেই এই প্রশ্ন প্রথম তোলা হোলো এবং একে গুরুত্ব দেওয়া হোলো। হিন্দু সমাজের একটি প্রভাবশালী অংশ তাঁদের এই অধিকার দিতে প্রস্তুত হওয়ায় তাঁরা তৎক্ষণাৎ এটিকে তাঁদের একান্ত অধিকার হিসাবে গ্রহণ করেছে। ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রতিনিধিত্ব ও সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের প্রশ্নেও একই ব্যাপার। কিন্তু এর দ্বারা দেশে মুসলিম রাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। এই চুক্তির সাহায্যে কয়েকটি মুসলমান ভোট অবশ্য জোগাড় করা হয়েছিল এবং ডায়ার্কিকে কবরস্থ করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কি স্বরাজ আমাদের এতটুকু নিকটস্থ হয়েছে?' (৪।১১।২৬ ইংরেজির অনুবাদ) বাংলার প্রায় সমস্ত হিন্দু সংবাদপত্র দাবি তুলেছিলেন যে, চুক্তিটিকে বাতিল করা হোক।

(হিন্দু-মুসলিম চুক্তির একটি প্রধান শর্ত ছিল, ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও সরকারী চাকুরীতে সংখ্যানুপাতিক হারে নিয়োগ অর্থাৎ শতকরা ৫৫ ভাগ—এইটাই বাংলার শিক্ষিত হিন্দু সমাজকে চঞ্চল করে তুলেছিল সবচেয়ে বেশি। 'মোচলমানে' সব চাকরী নিয়ে নেবে, দেশে মোচলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে—এই আতংকে শিক্ষিত হিন্দু সমাজ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। শিক্ষিত হিন্দু সমাজের এই ভয়টি অপনোদনের জন্য লড়াইতে নামলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদল। দিল্লীতে কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে মতিলাল নেহরু এঁদের আশীর্বাদ জানালেন।

আমাকে নিশ্চয়ই বলা হবে—শিক্ষিত হিন্দু সমাজের স্বার্থ উপেক্ষা করে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল যে মুসলমান সমাজকে সমর্থন করে তাদের সামাজিক

দাবী ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন, এতে তিনি দেশের অমঙ্গলই করেছেন। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ শাসমল কপটতা বা ভণ্ডামি জানতেন না। কংগ্রেসের বহু বিঘোষিত মূলনীতি ছিল হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এবং বাংলায় সংখ্যাগুরু মুসলমানদের গণতান্ত্রিক অধিকারে তাদের সরকারী চাকরী এবং কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্বের যতটুকু ন্যায্য দাবি ছিল, সেটুকু মেনে নিতে আদর্শগত দিক থেকে আমরা বাধ্য ছিলাম। ইংরেজরা যখন এদেশ অধিকার করে তখন হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করে সভ্যজীবনের পথে অনেক দূর এগিয়ে যায়, কিন্তু মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করে অনেক পিছনে পড়ে থাকে। উভয়ের মধ্যে সামাজিক মিলনের প্রধান বাধাটি ছিল এইখানে। কাজেই তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পুষ্ট না করতে পারলে বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথ ছিল দুরাগম্য। তাদের সেই গণতান্ত্রিক অধিকারকে পুষ্ট করবার প্রধান পথ ছিল—কাউন্সিলে তাদের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারী চাকরীতে তাদের নিয়োগ সংখ্যানুপাতিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া। কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতিও তাই ছিল। কিন্তু বিঘোষিত নীতি হবে এক আর কাজের বেলা হবে অন্য কথা, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের এই কপটতা বীরেন্দ্রনাথ কোনোদিন সহ্য করতে পারেননি। অবশ্য তাঁর জীবন দিয়ে তাঁকে এর মূল্য দিতে হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁর জন্য শোকপ্রকাশ করে তাঁকে জাতীয় নেতার সম্মান দিয়েছিল এবং তখনকার কংগ্রেস সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেনঃ তিনি বেঁচে থাকলে কংগ্রেসের শক্তিস্তম্ভ হতেন। কিন্তু তাঁর জীবিতকালে চক্রান্ত করে কংগ্রেস তাঁর রাজনৈতিক জীবনটি ধ্বংস করে দিয়েছিল। অবশ্য বাংলার কোনো কংগ্রেস নেতা তাঁর জন্য এক লাইন শোক প্রকাশ করেননি এবং কেউ তাঁর শবযাত্রায় যোগ দেননি।

১৯৩৪ সালের ১০ অক্টোবর বীরেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেছিলেন—নির্বাসিত জননায়ক সুভাষচন্দ্র বসুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করা হোক। বঙ্গীয় কংগ্রেসের কোন্দল মেটাবার জন্য ১৯৩৪-এ যখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মাধব শ্রীহরি আনেকে সালিশিকার বা আরবিট্রেটর নিযুক্ত করে বাংলায় পাঠান তখন শ্রীযুক্ত আনে বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি তৈরি করে দেন এবং তাতে বীরেন্দ্র-নাথ শাসমল কংগ্রেস ছেড়ে চলে যাওয়া সত্ত্বেও শ্রীআনে তাঁকে সেই কমিটির সভ্য করেছিলেন। তখন অবশ্য সুভাষচন্দ্রের পুরাতন সহকর্মী এবং সন্ত্রাস-বাদী বিপ্লবীদের পুরাতন মুরুব্বি ডাঃ বিধান রায় নিজেই সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়ে দাঁড়ান এবং তিনি সুভাষচন্দ্রকে পরাজিত করে বঙ্গীয়

কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিধান রায় পেয়েছিলেন ১১৭ ভোট ও সুভাষচন্দ্র ৮৬ ভোট। নির্বাসিত সুভাষচন্দ্রের প্রতি সামান্য সৌজন্যবোধটুকু বিধান রায় সেদিন বিসর্জন দিয়েছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ যে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদে সুভাষচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করেছিলেন তার একটা গূঢ় কারণ ছিল। সুভাষচন্দ্রের মহত্তর গুণটি ছিল যে, তিনি কপটতা জানতেন না। ১৯৩৪-এই বীরেন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে বলেছিলেনঃ 'আপনি দু নৌকায় পা দিয়ে চলেন। সেই কারণে আজ থেকে বিশ বছরের মধ্যে এদেশ থেকে গান্ধীবাদ লুপ্ত হয়ে যাবে। এবং তার জন্য আপনি নিজেই দায়ী।'

কিন্তু সুভাষচন্দ্র কখনও দুনৌকায় পা দিয়ে চলেননি। ১৯২৪-এর এপ্রিল মাসে কলকাতা করপোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হওয়ার পরই তাঁর প্রথম বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেনঃ ইয়োরোপের বর্তমান ফ্যাসিজম ভারতের লক্ষ্য হওয়া উচিত।' এ সম্বন্ধে তাঁর প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ শিশিরকুমার বসু লিখেছেনঃ 'সুভাষচন্দ্র দেশ গঠনের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের আদর্শকে সমর্থন করতেন।.....তিনি বলেছিলেন, ইংলন্ডের রাজকীয় গণতন্ত্র একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। মিলিটারী বা আধা-মিলিটারীর সাহায্যে অনুশাসনের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলেছিলেন।' (দক্ষিণী-বার্তা, নেতাজী জয়ন্তী সংকলন ১৯৭৬, ৯৩ পৃঃ) এই কারণেই ১৯৩৭-৩৮ এ নাৎসী জার্মানী যখন ইহুদি নিধন যজ্ঞে লক্ষ লক্ষ নিরীহ ইহুদিকে হত্যা করতে শুরু করে, তখনও সুভাষচন্দ্র নাৎসী জার্মানীর নিন্দা করতে রাজী হননি। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মতাদর্শের সংগে বীরেন্দ্রনাথ শাস-মলের গভীর পার্থক্য ছিল। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন, গান্ধীবাদী নেতাদের গভীর কপটতার জন্য এদেশে গান্ধীবাদ জন্মাবার আগেই মরে গেছে। নিজের জীবনের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েও তিনি গান্ধীবাদী নেতাদের কপটতা থেকে মুক্ত করতে পারেননি। সেই কারণে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের আদর্শকে সফল করে তুললে, সেটা কপটতার চেয়ে ভাল হবে বলে তিনি মনে করতেন।

বীরেন্দ্রনাথকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহক সমিতি থেকে সরিয়ে দিয়ে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা বোধহয় ভেবেছিলেন যে, দেশে এবার বিপ্লববাদের প্রসার হবে, এবং সেই বিপ্লববাদের প্রথম পদক্ষেপ ছিল পল্লী বাংলার শ্রেষ্ঠ কর্মী বীরেন্দ্রনাথকে কংগ্রেস থেকেও সরিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল—তিনি যে কৃষক গ্রামবাসীদের নিয়ে বিরাট কর্মী সংগঠন সৃষ্টি করতে চেয়ে-ছিলেন তার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া। তৃতীয় পদক্ষেপ ছিল, হিন্দু-মুসলিম চুক্তির সমর্থনে তিনি যে কঠিন সংগ্রাম করেছিলেন সেটিকে কবরস্থ করা। এই

তিনটি পথেই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা সফল হলেন বটে, কিন্তু তখন ভারতের ভাগ্যবিধাতা বোধহয় অলক্ষ্যে একটু হাসলেন। যেদিন বীরেন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাংলায় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হোলো, সেইদিনই তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী মৌলানা মহম্মদ আক্রাম খাঁ কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করলেন। এই আক্রাম খাঁ পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি হয়েছিলেন এবং 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার মাধ্যমে পাকিস্তানের পক্ষে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে দেশবিভাগকে সফল করে তোলেন।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রচেষ্টায় বীরেন্দ্রনাথের অবদান কতখানি ছিল সেকথা স্বয়ং গান্ধীজী স্মরণ করেছিলেন ১৯৪৭ সালের ৯ই আগস্ট সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে তাঁর প্রার্থনা সভায়। তখন সারা ভারত হিন্দু মুসলমানের হানাহানিতে উন্মত্ত। আমি তখন সোদপুরে গান্ধী শিবিরের কর্মী।

৯ই আগস্ট অতি প্রত্যুষে মধ্য কলকাতার একটি দাঙ্গা পীড়িত অঞ্চলে আমার গাড়ীতে গুলি করা হয়। ১৪টি গুলি আমার গাড়ি ছাঁদা করে দিয়েছিল এবং আমার ধুতির ভেতর দিয়েও গুলি চলে যায়, কিন্তু গায়ে লাগেনি। সোদপুরে পৌঁছতেই খবর পেয়ে গান্ধীজী আমায় ডেকে পাঠান ও বলেনঃ 'সত্যি সত্যি গায়ে কোনো গুলি লেগেছে কিনা ভালো করে দেখো।' বিকেলে তাঁর দৈনন্দিন ভ্রমণের সময়ে হঠাৎ গিয়ে আমার গুলি বিধ্বস্ত গাড়িটি দেখে আসেন। তারপর তাঁর প্রার্থনা সভায় এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেনঃ 'বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এক বহুত বাহাদুর আদমি থা। সে যদি আজ বেঁচে থাকতো তাহলে নিজের প্রাণ দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের এই উন্মত্ত হানাহানি রোধ করবার চেষ্টা করতো।'

শিক্ষিত বাঙালীরা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সম্বন্ধে চিরদিন অত্যন্ত ঈর্ষা-কাতর। তাই গান্ধীজীর বাঙালী সেক্রেটারী অধ্যাপক নির্মল বসু গান্ধীজীর বক্তৃতার বীরেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত অংশটুকু সংবাদপত্রে ছাপতে দেননি, কেটে দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী যে বীরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ঐ কথা বলেছিলেন তার সাক্ষীদের মধ্যে এখনও আছেন অন্যান্যদের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির দৌহিত্রী শ্রীমতী সাধনা ব্যানার্জি ও কানু গান্ধীর পত্নী শ্রীমতী আভা গান্ধী। শ্রীমতী আভা, গান্ধীজীর পাশে বসে তাঁর সমস্ত বক্তৃতাটি স্বকর্ণে শুনেছিলেন এবং সভা-শেষে গান্ধীজীকে তাঁর ঘরে পৌঁছে দিয়েই সেই ভিড়ের মধ্যে আমাকে খুঁজে বার করে গান্ধীজীর বক্তৃতার কথা আমাকে জানিয়েছিলেন। তিনি না জানালে গান্ধীজীর ঐ বক্তৃতার কথা আমি জানতেই পারতাম না। বাঙালীর মেয়ে হয়েও শ্রীমতী আভা গান্ধী আমার প্রতি যে উদারতা দেখিয়েছিলেন তার জন্য আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, ১৯৪৫-এর নভেম্বরে

গান্ধীজী যখন মেদিনীপুর সফরে যান তখনও কাঁথির বক্তৃতায় তিনি বীরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছিলেন। অধ্যাপক নির্মল বসু সেটাও কাগজে ছাপতে দেননি। অমৃতবাজার পত্রিকার কালিপদ বিশ্বাস নিজ দায়িত্বে সেটা অমৃত বাজারে ছাপিয়েছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মুসলমান সমাজের প্রিয় ছিলেন, শুধু এই অপরাধে তাঁকে বাঙালী কংগ্রেস নেতাদের হাতে যে লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করতে হয়েছিল তা লক্ষ্য করে বাংলা ও ভারতের মুসলমান সমাজ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯২৬-এ গৌহাটি কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সভার একটি ঘটনায় ব্যাপারটি বোঝা যাবে। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বক্তৃতার সময়ে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল একটি আইনগত প্রশ্ন তুলে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাতে যতীন্দ্রমোহন রাগত স্বরে বলে ওঠেন, 'সভা এখন আমার দখলে আছে। মিঃ শাসমলের এইভাবে আমাকে বাধাদানের কোনোই অধিকার নেই।' অমনি প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলি বলে ওঠেনঃ 'মিঃ সেনগুপ্ত মগজ না খাটিয়ে গলাই ফাটালেন (মিঃ সেনগুপ্ত একসারসাইজড্ মোর লাঙ্গস্ দ্যান ব্রেইনস্)।'

সেনগুপ্ত সাহেব তখন বললেন, 'আপনার এই উক্তি প্রত্যাহার করা উচিত, আমি ত' কারও প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিনি।' মহম্মদ আলি বললেন, আপনি মিঃ শাসমলকে এই কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করুন।' (দি বেঙ্গলী, ২৭-১২-২৬, ইংরেজির অনুবাদ)।

এখানে আমার বলা কর্তব্য যে, বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস-বাদী বিপ্লবীদের প্রধান উস্কানিদাতা ছিলেন ডাঃ বিধান রায়। বীরেন্দ্রনাথ বাংলায় কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে বহিষ্কৃত হবার পর এই বিধান রায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের উস্কানি দিয়ে ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে যতীন্দ্রমোহন সেন-গুপ্তকেও বঙ্গীয় কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতি থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন এবং এই লোকটির চক্রান্তে ১৯৩১ সালের কলকাতা কর্পোরেশন কাউন্সিলের নির্বাচনে যতীন্দ্রমোহন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মনোনয়ন লাভে বঞ্চিত হন এবং তাঁকে সরকারী কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে হয়েছিল। ১৯২৮-এ কলকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক হিসাবে বিধান রায় বহু টাকার হিসাব দেননি এবং সমিতির সভাপতি যতীন্দ্রমোহন হিসাব চাইলে বিধান রায় তাঁর প্রতি অপমানজনক ব্যবহার করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির দুই সভ্য গান্ধীবাদী নেতা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও ভূতনাথ মুখার্জি সংবাপত্রে যে ইংরেজি বিবৃতি দিয়েছিলেন তার বাংলা অনুবাদ এখানে তুলে দিলামঃ

'অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যবৃন্দের প্রতিঃ গত ৯ই ডিসেম্বর ইণ্ডিয়ান এসো-সিয়েশন হলে কলকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির একটি সভা হয়েছিল। সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সভা কর্তৃক অনুমোদনের জন্য একটি হিসাবের বিবরণী পেশ করেন। হিসাবের ছাপানো প্রতিলিপি উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল, পরে তা সংবাদপত্রে ছাপানোও হয়েছে। যদিও ডাঃ রায় সেদিন হিসাবের বিবরণীটি সভায় পাশ করিয়ে নিতে চেয়ে-ছিলেন, তবুও একজিকিউটিভ কমিটির কাছে এটা ফেরত পাঠানো হয় এই নির্দেশ দিয়ে যে, এসেট্‌স্‌ এবং লায়েবিলিটির একটি শিডিউল তৈরি করে দেওয়া হোক।

অভ্যর্থনা সমিতির পরবর্তী সভাটি আজ (১৭ই ডিসেম্বর ১৯২৯) অনুষ্ঠিত হবে ওই হিসাবের বিবরণী বিবেচনা করবার জন্য। সম্পাদক (ডাঃ রায়) যে হিসাবের বিবরণ পেশ করেছেন তাতে বহু ত্রুটি দেখা গেছে, যেগুলো আমরা সকলের সামনে তুলে ধরতে চাই। এ সম্বন্ধে আপনাদের সতর্কতার এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন আছে।

কোনো এসেট দেখানো হয়নি; বহু দ্রব্য বিনা অনুমতিতে এবং বিনা নোটিশে বিক্রী করা হয়েছে।

একোমোডেশন কমিটির হিসাবে আমরা ব্যয়ের ভাগে দেখছি যে, ৫০০০৲ টাকার ক্যাম্প খাট কেনা হয়েছিল। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এই খাটগুলি মাত্র ২০০০৲ টাকায় বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই ২০০০৲ টাকা একোমোডেশন কমিটির হিসাবে ক্রেডিট করা হয়নি। প্যাণ্ডেল কমিটির হিসাবে আমরা দেখছি ৬০০০৲ টাকার চেয়েও বেশি মূল্যের খদ্দর কেনা হয়েছিল। সম্পাদক বলেছেন, এই খদ্দর সব বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হিসাবে কোথাও সেই খদ্দর বিক্রীর টাকা জমা দেখানো হয়নি।

কিচেন কমিটির হিসাবে আমরা দেখছি ৫০০০৲ টাকার খাদ্য দ্রব্য কেনা হয়েছিল। কিন্তু মাত্র ১২৫০৲ টাকা আদায় দেখানো হয়েছে। ডেলিগেটকার্ড না দেখালে ডেলিগেটদের খাদ্য পরিবেশন করা হোতো না এবং প্রত্যেকের খাদ্যমূল্য দশ আনা হিসাবে আদায় করা হোতো। মনে হচ্ছে, এই হিসাব তৈরি করতে কোনো ত্রুটি রয়ে গেছে এবং আমাদের মনে হয় এই হিসাবটি গভীরভাবে খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

ভলানটিয়ার কমিটির হিসাবে ২৮৪৩ টাঃ ১১ আঃ ৬ পঃ দিয়ে একটি মোটরগাড়ি কেনা হয়েছিল। গাড়িটি ছিল একটি শেভ্রলে, ৪-সিলিণ্ডার গাড়ি যার তখনকার কলকাতা ডেলিভারি রাস্তায় চলার উপযুক্ত দাম ছিল ২৪৭৫ টাকা।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, কেবল নেতাদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের খরচ ধরা

হয়েছে ৭৬৮০৲ টাকা যার মধ্যে আছে ইম্পিরিয়াল রেস্টোরেন্টের বিল বাবদ ৩৮৮০৲ টাকা। অভ্যর্থনা সমিতি কতজন নেতাকে কতদিন ধরে খাইয়েছিল? কংগ্রেসের মাত্র কয়েকদিনের অধিবেশনের জন্য নেতাদের খাওয়াবার কারণে যে এই বিরাট পরিমাণ টাকা খরচ করা হয়েছিল এতে আমরা নিছক স্তম্ভিত হয়েছি। ওই সামান্য কয়েকদিনের জন্য নেতাদের আসবাবপত্র খাতে ৪০০০৲ টাকা খরচ করা হয়েছে এবং ১০৯৫৲ টাকা নেতাদের বাসস্থান মেরামতের জন্য খরচ করা হয়েছে।

উপরে লিখিত ঘটনাগুলি এটাও পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে, হিসাবের বিবরণী পাশ করবার আগে এ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁজ নেওয়া দরকার।' (দি বেঙ্গলী ১৮-২-২৯)

১৯৩০ সালে রেঙ্গুন পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়ে বিচারের জন্য রেঙ্গুন যাত্রার প্রাক্কালে বাঙালী জাতির উদ্দেশ্যে এক বাণীতে ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বলেছিলেনঃ 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতিকে আপনারা এখনই বাতিল করে দিন এবং তার বদলে এমন সভ্যদের নিয়ে নতুন সমিতি গঠন করুন যাঁরা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব স্বীকার করেন। এক চিরন্তন কলঙ্কের মধ্যে বাংলার সুনামকে আপনারা ডুবিয়ে দেবেন না।' (দি বেঙ্গলী, ১৬-৩-৩০ অনুবাদ)

১৯২৭-এর ২৪শে মার্চ বাংলার উদারনৈতিক দলের নেতা স্যার প্রভাস-চন্দ্র মিত্র লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বক্তৃতায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেনঃ 'আজ যদি মিঃ বি এন শাসমল এই সভায় থাকতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই জনস্বাস্থ্যের মঙ্গলের জন্য তাঁর সহযোগিতা থেকে আমাদের বঞ্চিত করতেন না। আমি পদাধিকার নির্বিশেষে সকল জাতীয়তাবাদী নেতার ও নেতৃত্বাভি-লাষীদের কাছে বিশেষ করে, ডাঃ বি সি রায়ের কাছে, আবেদন জানাচ্ছি যে, তাঁরা যেন নিজেদের ব্যক্তিগত বিবাদ মিটিয়ে ফেলে এই (জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে) সম্মিলিত প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন।

'ডাঃ রায়—আমি মন্ত্রীপদপ্রার্থীদের একজন নই।'

'স্যার প্রভাস—আমি তা বলিনি। আমি বলেছিলাম, তিনি নেতৃত্বপদের প্রার্থী।'

'ডাঃ রায়—আমি তা নই।'

'স্যার প্রভাস—তিনি 'বিগ ফাইভের' একজন এবং আমি ডাঃ রায়ের কাছে বিশেষভাবে আবেদন জানাবো যে, তিনি নেতৃত্বলাভের প্রচেষ্টায় কম মনোযোগ দিয়ে যে বিষয়ে তিনি সত্যভাবে অবহিত সে বিষয়ে বেশি মনোযোগ দিন।... ডাঃ বি সি রায়ের মত যাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে

রাজনীতি থেকে তাড়িয়েছেন, তাঁদের নাম লোকে গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করবে না।'

'সভার এই দিকের সভ্য হিসাবে আমরা চাই সকলের নিকট হতে মিলিত কর্মবিধি এবং তা চাই স্বরাজ্যদলের নেতাদের নিকট থেকে এবং যাঁরা নেতৃত্ব-পদলাভের জন্য কোন্দল করছেন তাঁদের নিকট থেকে। 'বিগ ফাইভের' আর একজন হচ্ছেন মিঃ শরৎ সি বোস। (একজনঃ তিনি ত' আপনার ভাগিনেয়)। তিনিও নেতৃত্বপদলাভের একজন দাবিদার এবং স্বরাজ্য দলের উপর তাঁর বেশ কিছু প্রভাব আছে। আমি আশা করবো, শুধুমাত্র দলের মধ্যে নিজের প্রাধান্য কায়েম করবার জন্যই তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি ব্যয় করবেন না।' (বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ইংরেজি বিবরণী থেকে অনুদিত)

এই প্রসঙ্গে বিধান রায়ের আর একটি কীর্তির কথা এখানে উল্লেখ না করলে আমার কর্তব্যহানি হবে। ১৯৩২-এ কলকাতার মেয়র থাকাকালীন তিনি ইংরেজ পুলিশ কমিশনারের হুকুমে ভারতের জাতীয় পতাকা কলকাতা করপোরেশন ভবন থেকে টেনে নামিয়েছিলেন। সেই সময়কার এই কলংকময় ঘটনা নিয়ে জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেনঃ 'এই সময়ের মধ্যে একদিন খুব ব্যথা অনুভব করেছিলাম। যেটি হচ্ছে, বিভিন্ন মিউনিসি-প্যালিটি এবং বিশেষ করে যেখানে কংগ্রেস সদস্যদের সংখ্যাধিক্য আছে বলে বলা হয় সেই কলকাতা করপোরেশন কর্তৃক আমাদের জাতীয় পতাকা টেনে নামানো। গভর্নমেণ্ট এবং পুলিশের চাপে পতাকা টেনে নামানো হয়েছিল এবং তাদের আদেশ অমান্য করলে কঠিন শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছিল। এই পতাকা আমাদের বহু প্রিয় আদর্শের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এর ছায়াতলে দাঁড়িয়ে আমরা বহুবার শপথ নিয়েছি যে, আমরা পতাকার মর্যাদা রক্ষা করবো। নিজের হাতে বা অপরের হাত দিয়ে সেই পতাকা টেনে নামিয়ে দেওয়াতে শুধুমাত্র সেই শপথ ভঙ্গই হয়নি—এতে যেন একটি ধর্ম-দ্রোহ হয়েছিল। এতে হয়েছিল অন্তরাত্মার নতিস্বীকার, আত্মার সত্ত্বাকেই এতে অস্বীকার করা হয়েছিল এবং অধিক ক্ষমতাশীল পশুশক্তির চাপে মিথ্যাকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। যাঁরা এইভাবে নতিস্বীকার করে-ছিলেন তাঁরা জাতির মনোবলের ও জাতীয় মর্যাদার হানি ঘটিয়েছিলেন।' (অটোবায়োগ্রাফি, পৃঃ ৩৩৩-৪, ইংরেজির অনুবাদ)

বিধান রায় জওহরলালের পারিবারিক বন্ধু ছিলেন, তাই তিনি এই নিন্দা ঘোষণার মধ্যে বিধান রায়ের নামটি করেন নি। কিন্তু জাতীয় পতাকার এই অপমান সহ্য করতে না পেরে নেলি সেনগুপ্তা গর্জে উঠেছিলেনঃ 'গত ১৪ মাসে ডাঃ বি সি রায়ের কার্যকলাপ কখনও কংগ্রেসের উপযুক্ত হয়নি। কলকাতার তথাকথিত 'কংগ্রেসী' মেয়র হিসাবে প্রত্যেক সম্ভবময় মুহূর্তে

তিনি কংগ্রেসকে অস্বীকার করেছেন। তিনি শুধু কংগ্রেসেরই অপমান করেননি, যে করপোরেশনের তিনি নেতা বলে প্রচার করেন তাকেও তিনি ডুবিয়ে দিয়েছেন। করপোরেশন ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন সম্পর্কে মেয়র ও চিফ একজিকিউটিভ অফিসারকে সতর্ক করে দিয়ে গভর্নমেণ্টের চিঠি এবং এই মেয়রের তাতে লজ্জাজনক আত্মসমর্পণ এই ব্যাপারটিকে পরিষ্কার করে দেবে। ডাঃ বি সি রায়কে ওজন করে দেখা হয়েছিল এবং তাতে তিনি ওজনে কম পড়ে গেছেন।...কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসী মেয়রের নিকট নেতৃত্ব আশা করে—পলায়ন আশা করে না। সেনাধ্যক্ষের পলায়নের সঙ্গে তাঁর পলায়নের পর সেনাদলের দুর্বলতার তুলনা করা চলে না। কংগ্রেসী মেয়র হিসাবে ডাঃ বি সি রায়ের সকলের আগে কর্তব্য ছিল করপোরেশনের মর্যাদা রক্ষা করা। কংগ্রেসী মেয়র হিসাবে তাঁর কর্তব্য ছিল করপোরেশনের পাশে এসে দাঁড়ানো। কংগ্রেসী মেয়র হিসাবে তাঁর কাজটি, যার দিকে সমস্ত ভারত চেয়ে থাকে সেই কলকাতা করপোরেশনের শুধু নয়, পরন্তু ভারতের সকল স্বয়ং-শাসিত প্রতিষ্ঠানের আত্মমর্যাদার হানি ঘটালো।' (এডভান্স, মার্চ ২৫ ও ২৮, ১৯৩২—ইংরেজির অনুবাদ)

মতিলাল নেহরুর প্রত্যক্ষ সাহায্যে এবং গান্ধীজীর গোপন আশীর্বাদে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে কর্তৃত্ব দখল করবার পর তাদের স্বৈরতান্ত্রিক চেহারাটির স্বরূপ খুলে গেল। যে সকল কংগ্রেস সেবক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সংগে একমত ছিলেন না, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি থেকে তাঁদের বিতাড়িত করবার কাজে প্রবৃত্ত হয়ে উঠলেন সন্ত্রাসবাদীরা। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি করায়ত্ত করার কিছুদিন পরেই কমিটির যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোলো সে সম্বন্ধে ১৯২৭-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর বেঙ্গলী সম্পাদকীয়তে লিখলঃ '(বি,পি,সি,সি নির্বাচন) জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলিতে প্রথাগত বাৎসরিক অশোভন দ্বন্দ্ব-কোলাহল পুনরায় আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রসঙ্গটি হচ্ছে—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচন করা—আজ পর্যন্ত শুধু সেইটুকু কাজই জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলি বরাবর করে এসেছে। স্বরাজ্য দলীয় গোঁড়ামি এবং একদেশ-দর্শিতা এখানে নিতান্ত বিষাক্তরূপে খেলায় নেমেছে কারণ, স্বরাজ্যদলের অস্তিত্ব আর রাজনৈতিক বা সামাজিক সেবার কর্মসূচীতে নিয়োজিত কোনো কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে না, যতটা নির্ভর করে স্বরাজ্যদলের নীতিতে। তারা বিশ্বাস করে শুধু এই দাবিটুকু জাহির করবার ক্ষমতার উপর। সমস্ত নির্বাচনটি কার্যত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির কলিকাতাস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আদেশ অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বরাজ্যদলের সংগে

ভিন্নমতপোষণকারী বা যাদের সেইভাবে সন্দেহ করা হয়েছে, সেই সকল স্থানীয় অধিবাসীদের ইচ্ছার কোনো মূল্য এই নির্বাচনে দেওয়া হয়নি। অসাধুতা, ভীতিপ্রদর্শন, অসৎ কৌশল অবলম্বন, অন্যায় প্রভাব, মনোনয়ন পত্রগুলির খেয়ালখুশিমত গ্রহণ বা বাতিলকরণ এবং এই ধরণের বহু পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে শুধুমাত্র পঞ্চ বৃহৎ নেতার (অর্থাৎ বিধান রায়, শরৎ বসু, নির্মল চন্দ্র, নলিনী সরকার ও তুলসী গোস্বামী—লেখক) মতাবলম্বী গোঁড়া স্বরাজপন্থীদের বিরুদ্ধে যাঁরা মতপ্রকাশ করেছেন অথবা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন অথবা যাঁরা উপদলীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধতা করেছিলেন ও কোনো প্রকাশ্য দলীয় আনুগত্যের বন্ধনে বাঁধা না থাকে কেবলমাত্র হুকুম-শাহীর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবার স্বাধীনতা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন, তাঁদের যাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি থেকে বাইরে রাখা যায়।

'.....এই সকল হীন কৌশল অবলম্বন করা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, দেশের সাধারণ মানুষ এবং এমনকি কংগ্রেস সেবকদের একটা বিরাট অংশ কংগ্রেস ও তার কার্যাবলী সম্বন্ধে চরম ঔদাসীন্য দেখাতে আরম্ভ করেছে। এই মুহূর্তে প্রত্যেক জেলায় এমন অত্যন্ত বৃহৎ সংখ্যক কংগ্রেস সেবক আছেন যাঁরা স্বরাজদলের কলাকৌশলের প্রতি এত বেশি বিরূপ হয়ে উঠেছেন যে, প্রদেশ কংগ্রেসের নির্বাচন সম্বন্ধে কোনো ঔৎসুক্য দেখাতেই তাঁরা আর প্রস্তুত নন। বিশেষত তাঁরা যখন বুঝতে পেরেছেন, কংগ্রেস আর এমন একটি প্রতিষ্ঠান নয় যা জনসাধারণের প্রকৃত মঙ্গলার্থে কোনপ্রকার কাজ-কর্ম করতে ইচ্ছুক।'

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র বসু (ইনি তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি) কি পদ্ধতিতে বাংলায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা করতেন, তার স্বরূপ প্রকাশ পেল ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে যার সভাপতি ছিলেন স্বয়ং মতিলাল নেহরু। ১৯২৮-এর এই কলকাতা কংগ্রেস সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ১৯২৯-এর ১০ই জানুয়ারির "ইয়ং ইন্ডিয়াতে" গান্ধীজী লিখেছিলেনঃ '(ভয়ংকর অবাস্তবতা) গত বছরের কংগ্রেস অধিবেশনটি একাধিক কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। ডেলিগেটদের, দর্শকদের এবং আগন্তুকদের উপস্থিতির কারণে এটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল এবং নেতারা যে-সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং ভঙ্গ করেছিলেন তার জন্যও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। এই কংগ্রেসে বাস্তবতা ও প্রচন্ড অবাস্তবতা উভয়ই ছিল। কিন্তু অবাস্তবতার অন্তরালেও সেখানে জাতির পক্ষে মহত্তম সম্ভাবনা প্রদর্শিত হয়েছিল। যে জনসাধারণ এই অবাস্তবতার কথা কিছুই জানতো না তাদের প্রাণবন্ত উৎসাহ নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, তাদের যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হোত এবং তাদের কর্মশক্তি যদি

ফলদায়ক পথে নিয়োজিত হোতো তাহ'লে সমগ্র জাতির কি না করা যেতে পারতো!

পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর ভাষণটি ছিল প্রখ্যাতরূপে ব্যবহারিক। নেহরু কমিটির রিপোর্টকে যে সাহসিকতার সংগে তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং নির্ভেজাল উত্তেজনাসৃষ্টির দাবি সত্বেও তিনি জাতির কাছে যে একটি উত্তেজনাবিহীন অথচ সত্যকার কার্যক্রম উপস্থাপিত করেছিলেন, তাতে এটিকে মহানও বলা চলে। কিন্তু মতিলাল নেহরুর ভাষণ সেখানে সাহসিকতার সংগে গঠনমূলক ছিল। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ভাষণটি ছিল কার্যকরী-ভাবে ধ্বংসমূলক এবং ভাবালুতাপূর্ণ...কিন্তু উভয় ভাষণ থেকেই এটা বোঝা গেল যে, সমান্তরাল সামাজিক অগ্রগতি ছাড়া কোনো রাজনৈতিক অগ্রগতি হতে পারে না। এবং রাজনৈতিক অগ্রগতি যদি সম্ভব হয়, যা একদিন নিশ্চিতভাবে হবেই, তাকে যদি প্রকৃত হতে হয় তাহ'লে তা সম্ভব হবে একমাত্র আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টার দ্বারা, ভারতবাসীর "প্রার্থনার" উত্তরে ব্রিটিশ "ন্যাসরক্ষক"দের কারুণ্যের দ্বারা নয়।

তা'হলে প্রাথমিক গুরুত্বের প্রথম নিরূপকটি দাঁড়াচ্ছে এই যে, কংগ্রেসকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। আমারই ব্যস্ততাময় মুসাবিদার জন্য কংগ্রেসের পুনর্গঠনের প্রশ্নটি আমার দ্বারা উপস্থাপিত দ্বিতীয় প্রস্তাবটির তালিকায় পঞ্চমস্থান লাভ করেছে। নিজের গুরুত্বেই তালিকায় এটির প্রথম স্থান লাভ করা উচিত ছিল। কারণ, কংগ্রেসকে সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ না করতে পারলে আর কোনো কাজই করা যাবে না। কংগ্রেস যেখানে লবনস্বরূপ—তারই যদি স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, তাহ'লে কি দিয়ে তাকে আর লবনাক্ত করা যাবে। কংগ্রেস হচ্ছে সেই শক্তিকেন্দ্র যার থেকে অন্যান্য সকল কাজের শক্তি আহরণ করতে হবে। সেই শক্তিকেন্দ্র যদি পচনশীল হয়ে যায়, তাহ'লে সকল জাতীয় কার্যক্রমও তাই হয়ে যাবে।

এই কংগ্রেসের ডেলিগেটরা প্রায় সকলেই স্ব-নির্বাচিত ছিলেন। কংগ্রেস সংবিধানে ডেলিগেট নির্বাচনের যে পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে—দেখা গেল যে তাকে ধ্বংস করা হয়েছে। এই মহান বাৎসরিক সম্মেলনের এইটিই ছিল এর ভয়ংকর অবাস্তবতাগুলির অন্যতম। পূর্ণ স্বাধীনতা তো ডোমিনিয়ন স্টেটাস—যে রূপেই আমরা স্বরাজের ব্যাখ্যা করতে চাই না কেন, তাকে যদি মজবুত ও প্রকৃত করতে হয় তাহলে কংগ্রেসের পুনর্গঠনের কাজে ওয়ার্কিং কমিটিকে প্রথমেই মনোনিবেশ করতে হবে। কোনো কিছুই গোপন করে রাখা ঠিক হবে না। সব কিছু গোপন করে রাখার নীতি গ্রহণ করে আমাদের কোনোই লাভ হবে না। রোগ নিরাময় সম্বন্ধে সফলতার সংগে ব্যবস্থা নেবার আগে কংগ্রেসের মধ্যে সর্বত্র রোগের কথাটি ব্যাপ্ত করে দেওয়া

দরকার। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে জীবন্ত থাকতে হলে তার উন্নয়ন প্রতীয়মান হওয়া চাই। কিন্তু কংগ্রেস আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের কবলে পড়েছে। যক্ষ্মা রোগের রোগীর দেহে সময়ে সময়ে যেমন রক্তিম আভা এবং সুডৌল দেখা যায় তেমনি কংগ্রেসও প্রতি বছর এক যক্ষ্মারোগীর ন্যায় রক্তিম আভা ও সুডৌল প্রদর্শন করেছে বটে, কিন্তু তার দ্বারা আসন্ন ধ্বংসের সুনিশ্চিত চিহ্নগুলি ফুটে উঠেছে। কংগ্রেস এখন যেমনভাবে গঠিত আছে তাতে এর পক্ষে কোনো প্রকৃত সংঘবদ্ধ এবং চ্যুতিহীন প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কলকাতার প্রদর্শনী যদি বাস্তব হোতো তাহ'লে সম্মিলিত সেই বিরাট জনমণ্ডলীর দ্বারা অনিচ্ছুক সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে না পারার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু আগত দর্শকেরা বীর্যবত্তা প্রদর্শন করতে যাননি, তাঁরা গিয়েছিলেন ঠিক যেমন দর্শকেরা কোনো সার্কাস দেখতে যায়। এবং খুব আশ্চর্যের মনে হতে পারে যে কংগ্রেস মণ্ডপটিকে যেন ফিলিসের সার্কাসের এক বৃহত্তর সংস্করণের মধ্যস্থলে যেন তারই পরিপূরক হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল।

পরের বছরের কংগ্রেসে আমরা যদি বাস্তবতাকে দৃশ্যমান করে তুলতে চাই, তাহলে এসবের পরিবর্তন করতে হবে। আমার মতে, বিদেশী পোষাকে স্বেচ্ছাসেবকেরা কলকাতায় এক দুঃখময় দৃশ্যের অবতারণা করেছিল এবং এই খাতে খরচের বহর ছিল জাতির কপর্দকহীনতার সংগে একেবারেই সামঞ্জস্য-হীন। দেশের শক্ত এবং রুক্ষ কাজের মানুষ কৃষককুলের প্রতিনিধি এরা একেবারেই ছিল না।

অর্থোপার্জনের পথ হিসেবে কংগ্রেসকে কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি টাকা কখনও উদ্বৃত্ত হয় তা যেন উদ্বৃত্ত হয় এই দরিদ্র জাতির দরিদ্র সাধারণের বিনীত উপহার থেকে—যাঁরা এই বাৎসরিক সম্মেলনে আসবেন অলস দর্শক হিসাবে নয়, পরন্তু সৈনিক হিসাবে বাৎসরিক হিসাব-নিকাশের মধ্য দিয়ে নিজেদের যাচাই করতে এবং যখনই সুযোগ আসবে তখনই নিজেদের কৃতবিদ্যতার পরিচয় দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে।

সকল প্রকার আভ্যন্তরীণ কলহ ও দ্বন্দ্বের অবসান ত্বরান্বিত করতে হবে।' (ইংরেজির অনুবাদ)

কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের বক্তৃতায় গান্ধীজী বলেছিলেনঃ 'যখন আমি শুনতে পেলাম যে, ডেলিগেটদের প্রবেশ-পত্র হাত-বদল হয়ে শেয়ার বাজারের মত প্রকাশ্যে বিক্রি হয়েছে এবং যতদিন যেতে লাগলো ততই তার দাম বাড়তে বাড়তে শেষে এক টাকার প্রবেশ-পত্র পনেরো টাকায় বিক্রি হোলো, তখন আমি খুব আঘাত পেয়েছিলাম। এটা কংগ্রেসের পক্ষে লজ্জা-জনক এবং আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে, এই সকল পন্থায় আপনারা কোনোদিন

স্বাধীনতা লাভ করবেন না। পক্ষান্তরে, আপনারা নিজেরাই নিজেদের শিকল গড়ে তুলছেন যার থেকে আপনারা কোনোদিন মুক্তি পাবেন না, কারণ সেটা আপনাদের নিজেদের ইচ্ছায় তৈরী।'

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই—কলকাতা কংগ্রেসে তাঁর উল্লিখিত বক্তৃতায় এবং তাঁর উল্লিখিত প্রবন্ধে আন্তরিকতার যে-অভাব গান্ধীজী দেখিয়েছিলেন তার তুলনা নেই। কংগ্রেসের মধ্যে সকল রকমের দুর্নীতি যে প্রচণ্ডভাবে দানা বেধে উঠছে সে সম্বন্ধে তাঁর চেয়ে আর কেউ বেশি জানতো না। কিন্তু ১৯২৭-এর জুনে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা যখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিযুক্ত সালিশী বোর্ডের রায় অন্যায়ভাবে অগ্রাহ্য করে নিজেদের খুশিমত সভ্য দিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক কমিটিকে করায়ত্ত করেছিলেন এবং তার থেকে বহু নিষ্ঠাবান সৎ এবং ত্যাগী কংগ্রেস কর্মীর নাম অন্যায়ভাবে কেটে দিয়েছিলেন এবং এমন কি যাঁর সম্বন্ধে ১৯৩৪-এ কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র-প্রসাদ বলেছেনঃ 'তিনি বেঁচে থাকলে কংগ্রেসের শক্তিস্তম্ভ হতেন' সেই বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নামটিও কার্যনির্বাহক কমিটি থেকে কেটে দেওয়া হয়েছিল, তখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও কংগ্রেসের মহত্তম নেতা গান্ধীজী তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো প্রয়োজন বোধ করেননি।

চিত্তরঞ্জন দাশ বা মতিলাল নেহরু এবং এমন-কি সুভাষচন্দ্র বসুও মনে করতেন যে, রাজনীতি ও দুর্নীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং সেই কারণে এঁরা প্রত্যেকেই গোপনে এবং কোনো ক্ষেত্রে প্রকাশ্যেই রাজনৈতিক দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এঁরা যে চেয়েছিলেন, মুসলমান বিরোধী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা বাংলায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি দখলে রাখুক—তার কারণটি এই যে, মারামারি গুণ্ডামি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দুর্নীতিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এবং শুধু সেইজন্যই তাঁদের সকলে ভয় করতেন। তাই এই সকল নেতার পক্ষে রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার না হওয়াটা কোনো আদর্শগত বিচ্যুতি ছিল না। কিন্তু গান্ধীজী বার বার বলেছেন এবং লিখেছেন যে, লক্ষ্য মহৎ হলেও দুর্নীতিমূলক পন্থায় সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করা চলবে না। তিনি বারবার বলেছেন, কংগ্রেস দুর্নীতিতে ভরে উঠেছে, কংগ্রেসের পরিশোধন প্রয়োজন। কিন্তু কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দূর করবার জন্য বা কংগ্রেসের পরিশোধনের জন্য তিনি কখনও কোনো কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করতে রাজি হননি। কংগ্রেস পরিশোধনের প্রস্তাব করে তিনি কয়েকবার প্রবন্ধ লিখেছিলেন বটে, কিন্তু সারা জীবনে কখনও এমন কিছু করবার কণামাত্রও চেষ্টা করেন নি যাতে কংগ্রেসের ক্রমবর্দ্ধমান আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দূর করা সম্ভব হয়। মতিলাল

নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ বা সুভাষচন্দ্র বসুর মত তিনি যদি কংগ্রেসের ক্রমবর্দ্ধমান আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি সম্বন্ধে নীরব থাকতেন এবং বার বার বিভিন্ন প্রবন্ধে কংগ্রেস পরিশোধনের প্রশ্নটি না তুলতেন, তাহলে সেটাই তাঁর পক্ষে বেশি সততাপূর্ণ হোত। কারণ এই সম্বন্ধে বার বার লেখালেখি করলেও তিনি আন্তরিকভাবে কোনোদিন চেষ্টা করেননি যাতে কংগ্রেস দুর্নীতিমুক্ত হয়। কংগ্রেসকে দুর্নীতিমুক্ত করবার চেষ্টা সুরু করলেই তিনি সফল হতেন সেকথা আমি বলছি না, কিন্তু সে সময়ে তিনি কংগ্রেসের একচ্ছত্র অধিপতি বললেও ভুল বলা হবে না এবং সেইহেতু এ বিষয়ে তাঁর কোনো কার্যকরী প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই কংগ্রেসসেবকদের মনে গভীর রেখাপাত করতো। অথচ তিনি এ বিষয়ে কখনও কোনো কার্যকরী প্রচেষ্টা শুরু করতে চাননি।

অথবা তিনি কি ভেবেছিলেন যে, যেহেতু তাঁর মত একজন মহাত্মার হাত থেকে কংগ্রেস পরিশোধনের প্রস্তাব করে দু' একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে, তখন সকল কংগ্রেস-সেবী স্বেচ্ছায় সকল প্রকার দুর্নীতি পরিহার করে একেবারে সদ্য-ফোটা ফুলের মত শুদ্ধ-পবিত্র হয়ে উঠবে এবং অতএব দু'একটি প্রবন্ধ লেখা ছাড়া তাঁর আর অন্য কিছু করণীয় ছিল না? সে যাই হোক্, গান্ধীজীর ঐচ্ছিক অথবা অনৈচ্ছিক ঔদাসীন্যের ফলে তাঁর নেতৃত্বের কাল থেকেই কংগ্রেসের মধ্যে আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ক্রমশঃ বিপুলভাবে বেড়ে উঠতে লাগল এবং এইভাবে বাড়তে বাড়তে রাজনৈতিক দুর্নীতি আজ এমন জায়গায় পেঁাছেছে যে, দেশকে এর হাত থেকে উদ্ধার করবার আর কোনো উপায় আছে কিনা আমার জানা নেই।

১৯৩৪-এ গান্ধীজী যখন কংগ্রেসের চার-আনারও সভ্যপদ ত্যাগ করলেন, তখন তিনি জানিয়েছিলেন যে, কংগ্রেসের ক্রমবর্দ্ধমান আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি তাঁর কংগ্রেস ত্যাগের অন্যতম কারণ। কিন্তু এ পথ দিয়ে আসল সমস্যা সমাধানের চেষ্টামাত্র না করে, পালিয়ে গিয়ে নিজের বিবেককে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি পালিয়ে গেলেন কেন? পলায়নবৃত্তি যার পক্ষে সাজে সেইরূপ একজন দুর্বল-চরিত্রের গান্ধীজী নিশ্চয়ই ছিলেন না। তিনি যে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দূর করবার চেষ্টা না করে কংগ্রেস ছেড়ে পালিয়ে গেলেন তার প্রধান কারণটি এই যে, তিনি বুঝেছিলেন, কংগ্রেসের দুর্নীতি দূর করবার চেষ্টা করতে গেলে কংগ্রেস একেবারে ভেঙে যাবে এবং বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই একমাত্র হাতিয়ারটি তখন অকেজো হয়ে যাবে। গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—বিদেশী সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া এবং জাতীয়তাবাদের উগ্র বিষ তাঁদের এমন অন্ধ করে দিয়েছিল যাতে তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, ইংরেজ যদি ক্রমবর্দ্ধমান দুর্নীতিপূর্ণ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের

হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দিয়ে ভারত ত্যাগ করে, তাহ'লে এদেশে একটি সুস্থ রাজনৈতিক সমাজ কোনোদিন গড়ে উঠবে না। গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল—কোনো প্রকারে ইংরেজকে ভারত থেকে তাড়ানো। ভারতবর্ষে একটি সুস্থ স্ব-নির্ভর আত্মসম্মানে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সমাজ গড়ে উঠুক, এই বিরাট প্রশ্নটির প্রতি তাঁরা একেবারেই নজর দেননি। এই ধরণের কংগ্রেস নেতাদের মনোবৃত্তি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুর পরিচালনাধীন দৈনিক "ফরোয়ার্ড" পত্রিকার তখনকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে। ফরোয়ার্ডের সম্পাদক সুভাষচন্দ্রের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সত্যরঞ্জন বক্সী ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজীর সমালোচনা মূলক বক্তৃতাকে বিদ্রূপ করে লিখেছিলেনঃ 'স্বাধীনতা সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে কংগ্রেস একশো'টা মহাত্মার চেয়েও মহত্তর।' গান্ধীজী ভয় পেতেন যে, কংগ্রেসকে পরিশুদ্ধ করবার চেষ্টা আরম্ভ করলে এই ধরণের নেতারা কংগ্রেস পরিত্যাগ করতে পারে অথবা এমন-কি তাঁকেই কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করতে পারে। অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মত গান্ধীজীও হয়ত ভাবতেন যে, কোনো রকমে একবার ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়াতে পারলে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সকল দুর্নীতির বীজ ফুৎকারে উড়ে গিয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে। এই ভুল ধারণাটির জন্য দুর্নীতির দুষ্ট কীট যে একদিন সমস্ত জাতির চরিত্রে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করবে, এই নিরতিশয় বিপজ্জনক সম্ভাবনাটির প্রতি সকল নেতাই মুখ ফিরিয়ে রইলেন। এই দুর্নীতিপরায়ণ কংগ্রেস দলের হাতে ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের ক্ষমতা পড়লে দেশের কি দুরবস্থা হবে, সেটা বুঝতে পেরেও গান্ধীজী বুঝতে চাইলেন না, সেটাই তাঁর চরম দুর্ভাগ্য।

বাংলায় বীরেন্দ্রনাথ শাসমল কিন্তু নিজের দায়িত্বে কংগ্রেস থেকে কিভাবে দুর্নীতি উচ্ছেদ করা যায় সে সম্বন্ধে কয়েকটি কার্যকরী এবং বিশেষ উপযোগী প্রস্তাব রেখেছিলেন এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় ১৯২৭-এর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মিলনীর মাজু অধিবেশনে সেই প্রস্তাবগুলি উত্থাপিত হয়েছিল। (প্রসঙ্গত, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মিলনীর মাজু অধিবেশনটি ছিল সমগ্র ভারতের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সম্মিলন যা ডাকা হয়েছিল সুদূর পল্লী অঞ্চলে। গান্ধীজী এর ন' বছর পরে ফৈজপুর কংগ্রেসে গাঁও-কা-কংগ্রেসের ডাক দিয়েছিলেন।) মাজু অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি ছিল এই—প্রথম প্রস্তাবঃ 'যেহেতু কংগ্রেস দলের সদস্যরা সকল প্রাদেশিক আইনসভায় এবং কেন্দ্রীয় এসেম্বলিতেও সংখ্যালঘু, সেই হেতু তাঁরা একদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় দাবিগুলি মেনে নিতে আমলাতন্ত্রকে বাধ্য করতে পারেন না এবং অন্যদিকে আইনসভাগুলির অভ্যন্তরে থেকে ক্রমাগত

সুষ্ঠু এবং একনিষ্ঠ বাধাদানের নীতি পরিচালনা করতে পারেন না এবং যেহেতু পৌনপুনিক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে ভারতের বিভিন্ন আইনসভাগুলির এমনকি প্রচণ্ডভাবে সংখ্যাধিক্যের ভোটে পাশ করা প্রস্তাব-গুলিও দেশের শাসক সরকার কোনোমতেই মানতে বাধ্য নয় এবং বাস্তবিক পক্ষে সেগুলি ঘৃণা ও অবজ্ঞার সংগে অগ্রাহ্য করে এবং যেহেতু এটা ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে, কাউন্সিল-প্রবেশের এই বিফল কার্যক্রমের প্রতি আকর্ষণ মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কর্মপন্থার সফল প্রয়োগের প্রচেষ্টা থেকে জাতীয় কর্মীদের উদ্দীপনাকে গভীরভাবে বিচ্যুত করেছে, সেই হেতু এখানে এই সম্মেলন প্রস্তাব করছে যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যেন নিজেরই উদ্যোগে অথবা জাতীয় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করে কান-পুর এবং গৌহাটি কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলির অদল-বদল সাধন করে এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কাউন্সিল-প্রবেশের নীতি একেবারে বর্জন করা হোক ও গঠনমূলক কর্মপন্থাকে সফল করে তোলার জন্য সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা হোক এবং ইতিমধ্যে বিভিন্ন আইনসভাগুলি থেকে সকল কংগ্রেস সদস্যকে পদত্যাগ করতে নির্দেশ দিক।' সম্মেলনে এই প্রস্তাবটি পাশ হয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ছিল দুটি ভাগে—'(ক) যেহেতু প্রদেশের বিভিন্ন স্বয়ং-শাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব অধিকারের সংগ্রামে কংগ্রেস কর্মীদের ভিতর অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে, যার ফলে প্রচণ্ড সংঘাত এবং উপদলীয় কোন্দলের সৃষ্টি হয়েছে এবং যেহেতু ত্রুটিপূর্ণ আইন প্রণয়নের দরুণ ও স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে প্রকৃত ক্ষমতার অভাবের দরুণ ওই সকল প্রতিষ্ঠান অধিকারে সফল হওয়া সত্ত্বেও দেশের জনগণের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করা সম্ভব হয়নি এবং যেহেতু এই সকল স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে পৃষ্ঠপোষকতার যে ক্ষমতা বিদ্যমান, তার প্রয়োগের ক্ষেত্রটি কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে এক মারাত্মক দুর্নীতির উৎস হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেই হেতু এই সম্মেলন এই অভিমত পোষণ করে এবং প্রস্তাব করছে যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি শহরে কিম্বা গ্রামাঞ্চলে স্বয়ং-শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকার করবার প্রয়াস পরিত্যাগ করুক।

(খ) ইতিমধ্যে এবং যতক্ষণ না স্বয়ং-শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকার করবার প্রয়াস থেকে বিরত থাকার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না হচ্ছে, এই সম্মেলন প্রস্তাব করছে যে, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড সমূহের কর্মচারীরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য হবার অধিকারী হবেন না।'

প্রস্তাবের (ক) অংশটি পাশ হয়েছিল বটে, কিন্তু স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান-

গুলির হাতে অর্থলাভে পৃষ্ঠপোষকতার যে ক্ষমতা বিদ্যমান ছিল তা কংগ্রেস কর্মীদের এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যে, সম্মেলনে প্রস্তাবের (খ) অংশটি পাশ করা যায় নি। তবু বীরেন্দ্রনাথ শাসমল নিজের বিবেকবুদ্ধির নির্দেশে যা করা উচিত তাই করেছিলেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গীয় কংগ্রেস পরিশোধন দল (বেঙ্গল কংগ্রেস রিফর্ম পার্টি) বলে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের ছক ও কার্যক্রম প্রস্তুত করেছিলেন। বাংলার নিষ্ঠাবান কংগ্রেসকর্মীরা চেয়েছিলেন—তিনি কংগ্রেস পরিশোধনের দাবি নিয়ে কংগ্রেসের উচ্চতম মহলে আন্দোলন করুন। তাই তাঁরা ১৯২৬-এ গৌহাটি কংগ্রেসে প্রস্তাব করেছিলেন যে, তাঁকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য নির্বাচিত করা হোক। কিন্তু গান্ধীজী ও মতিলাল নেহরুর বাধাদানের ফলে তাঁদের সে আশা পূর্ণ হতে পারেনি। আমি আগে দেখিয়েছি, গান্ধীজী ও মতিলাল নেহরুর পরোক্ষ সাহায্যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তাঁকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য হতে দেননি। গান্ধীজীও এই ভয়টি করতেন কংগ্রেসে দুর্নীতি দূর করার প্রস্তাব নিয়ে দু'একবার লেখালেখি করলেও গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে, এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করতে গেলে তাঁকেও কংগ্রেসের নেতৃপদ থেকে বিতাড়িত করা হবে। ১৯৩৪-এ নিজের বিবেকের কাছে সাধু সাজবার ইচ্ছায় তিনি কাগজে-কলমে কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু কার্যত জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই কংগ্রেসের অপ্রতিহত নেতা হিসাবে কাজ চালিয়ে গেছেন।

১৯২৭-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীতে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের অনুপ্রেরণায় প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল যে, করপোরেশন মিউনিসিপ্যালিটি-গুলি অধিকার করার প্রয়াসে যে উপদলীয় কোন্দলের সৃষ্টি হয় এবং এই সকল স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্থকরী পৃষ্ঠপোষকতার যে অবাধ সুযোগ থাকে, সেইটি করায়ত্তের প্রয়াসে দুর্নীতির যে পাপচক্র সৃষ্টি হয় তা থেকে কংগ্রেসকর্মীদের রক্ষা করবার জন্য এই সকল স্বয়ং-শাসিত প্রতিষ্ঠান-গুলির সংগে যাঁরা কোনো প্রকারে জড়িত তাঁদের কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য হতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর "ইয়ং ইণ্ডিয়াতে" ঠিক বিপরীত প্রস্তাব করেছিলেন। বিভিন্ন স্বয়ং-শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে কংগ্রেস-কর্মীদের আরও বেশি করে ঢুকে পড়া উচিত—এই প্রস্তাব সমর্থন করে তিনি লিখেছিলেনঃ 'স্বীয়-স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে এবং দলের গঠনমূলক কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করবার জন্যে গত চার বছর যাবত কংগ্রেস বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি ও পৌর সংস্থাগুলি অধিকার করবার ব্যবস্থা নিয়েছিল। এবং এই অধিকার প্রচেষ্টার পেছনে আসল উদ্দেশ্যটি ছিল, অধিকতর রাজ-নৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা, পৌর স্বাস্থ্যব্যবস্থার অধিকতর উন্নতিবিধান নয়।

এই অভিলাষের মধ্যে দোষের কিছু ছিল না। পৌর স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি বিধানের পরিবর্তে তার সৃষ্ট এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলিকে গভর্নমেণ্ট নিজেই আপন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার এবং স্বীয় মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কাজে লাগিয়েছে। আমি জানি, লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিলের নির্বাচনেও রাজনৈতিক ভিত্তি নিয়ে লড়াই হয়ে থাকে। এবং ইংল্যাণ্ডে যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে কাজে লাগানো প্রয়োজনীয় মনে করা হয়ে থাকে, তাহলে যেখানে সমগ্র দেশটি অন্য দেশের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীন সেখানে এই রকমটি আরও বেশি প্রয়োজনীয়। যদি গভর্নমেণ্ট-সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজে লাগানো উচিত বলে মনে করা হয়ে থাকে, তাহলে অধিকতর রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকার করা এক অত্যাবশ্যকীয় পদক্ষেপ। দেশবন্ধু কলকাতা করপোরেশন সেই উদ্দেশ্যেই অধিকার করেছিলেন এবং কংগ্রেসের অথবা বাংলায়—যা প্রায় একই বস্তু অর্থাৎ স্বরাজ্য দলের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সুসংহত করার কাজে এটিকে খুব সফলতার সংগে কাজে লাগিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি করে কি তিনি করপোরেশনের স্বার্থের অবহেলা করেছিলেন? আমি খুব জোরের সংগে বলতে পারি যে, তা হয় নি। বরঞ্চ তাঁর পৌর উচ্চাভিলাষ রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের সমান-সমান ছিল।'

করপোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে এইভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করবার সোপান হিসাবে ব্যবহার করতে হবে বলে গান্ধীজী এই যে নির্দেশ দিলেন—এতে দেশের, বিশেষ করে দল হিসাবে কংগ্রেসের, যে কত মারাত্মক ক্ষতি হোলো তিনি সেটা বুঝেও বুঝলেন না। ১৯২১-এর অসহ-যোগ আন্দোলনে দেশের বহুলোক চাকরী ইত্যাদি ছেড়ে এসেছিল, বহু বালক-যুবক স্কুল-কলেজ ছেড়ে এসেছিল। হঠাৎ গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এই সব অসহযোগী কর্মীরা কর্মহীন হয়ে পড়লেন। তখন এইসব অসহযোগী কর্মীদের ভরণ-পোষণের জন্য 'তিলক স্বরাজ ফাণ্ড' বা কংগ্রেসের অন্যান্য ধন-ভাণ্ডার থেকে মোটা টাকা খরচ করতে হোতো। এবং অনেক সময়ে এইসব অসহযোগী কর্মীদের চাহিদা মেটাতে অন্যান্য এমনকি অবাঞ্ছনীয় সূত্র থেকেও সাহায্য পাবার জন্য নেতারা চেষ্টা করতেন। কিছু পেটুয়া কর্মীর জীবিকা-নির্বাহের সুবন্দোবস্ত করে দেবার জন্য তাঁদের করপোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি বা জেলা বোর্ডে চাকরীর ব্যবস্থা করে দেওয়াও হোলো। এই সকল কর্মীকে করপোরেশন বা মিউনিসি-প্যালিটিতে চাকরী দেওয়া হোলো বটে, কিন্তু গান্ধীজীর উপরিলিখিত নির্দেশ মত আশা করা হোতো যে, করপোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির বেতন-ভোগী এইসব কর্মচারী করপোরেশন বা অন্যান্য পৌর-প্রতিষ্ঠান থেকে বেতন

নেবেন কিন্তু কাজ করবেন কংগ্রেসের হয়ে যাতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করার পথ সুগম হয়। অনেক সময়ে কংগ্রেসের সেবা করার নামে এই সকল কর্মী কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষমতাসীন দলটির সেবা করতেন, তা না হ'লে তাঁদের চাকরীর নিরাপত্তা থাকতো না। এমনকি করপোরেশন বা পৌর-প্রতিষ্ঠানের বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে নিজের মাসিক বেতন থেকে বিশেষ কোনো দলীয় ফান্ডে মাসিক অর্থসাহায্যও করতে হোতো। যেমন করতেন সুভাষচন্দ্র বসু। আই, সি, এস অফিসার হিসাবে তাঁর প্রারম্ভিক বেতন হোতো মাসিক ৫০০ টাকা। কিন্তু তাঁকে তার তিন গুণ বেশি মাসিক ১৫০০ টাকায় কলকাতা করপোরেশনের চিফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসারের পদে নিযুক্ত করা হোলো এই শর্তে যে, তিনি তাঁর মাসিক বেতনের অর্ধেক ৭৫০ তাঁর পছন্দমত এক বিশেষ সন্ত্রাসবাদী দলের হাতে তুলে দেবেন। এ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র তাঁর বাল্যবন্ধু হেমন্তকুমার সরকারকে যে চিঠি দিয়েছিলেন সেটি এইঃ '(১০/৩/২৪) হেমন্ত, আমি বুঝতে পারলাম না, কাউন্সিলের সঙ্গে করপোরেশনের ও মন্ত্রীদের সঙ্গে চীফ একজিকিউ-টিভ অফিসারের তুলনা তুমি কেমন করে করলে? প্রথম কার্যক্ষেত্রে আমরা ধ্বংসের পক্ষপাতী, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা গঠনমূলক কার্যে ব্রতী। মন্ত্রীদের বেতন না-মঞ্জুর করা হয়েছে ধ্বংসমূলক কার্যের নীতিতে, তাদের গুণাগুণ দিয়ে নয়। গুণ বিচার করলে মন্ত্রীদের বেতন ১৫০০ বা ৩০০০ টাকা ধার্য করা হোতো। আমার মতে এক্‌জিকিউটিভ অফিসারের মাইনে ১০০০ টাকা হওয়া উচিত, কিন্তু পার্টিতে আমাদের মত গৃহীত হয় নাই এবং ১৫০০ টাকা বেতন ধার্য হয়।

আমি কি বলেছি যে, দেড়হাজার টাকা আমি নিজের জন্য নেবো? আমি নিজের জন্য কতটা রাখবো এখনও স্থির করিনি।

অবশ্য তোমার মত ছিল—আমার এই পদ গ্রহণ করা উচিত হয়নি। আমি সিভিল সার্ভিস পাশ করার সময় যে কথা লিখেছিলে তা তোমার মনে আছে। সে যাই হউক, আমি তোমার নদীয়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ার প্রস্তাব সমর্থন করি। কিন্তু তুমি কি ভোটার? আশা করি ভালো আছো। ইতি—সুভাষ'

অবশ্য চিত্তরঞ্জন প্রথমে মনস্থ করেছিলেন যে, কলকাতা করপোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসারের পদটি মাসিক ৫০০৲ টাকা ভাতায় (বেতন নয়) বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে দেবেন। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে সুরেন ঘোষ (মধু ঘোষ) তাঁর কাছে এসে প্রস্তাবও করেছিলেন যে, তিনি মাইনে হিসাবে যদি বেশি টাকা নেন এবং তাঁর মাসিক মাইনের অর্ধেক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের হাতে তুলে দেন, তাহলে তাঁরা তাঁকেই চিফ একজি-

কিউটিভ অফিসার করে দেবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ তাতে রাজী হলেন না। ফলে কি হোলো সে সম্বন্ধে হেমন্ত কুমার সরকার লিখেছেনঃ

'কিন্তু এই কথা প্রচার হইবা মাত্র কলকাতায় দলের মধ্যে ভীষণ ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়া গেল। "মেদিনীপুরের ক্যাওট" এসে কলকাতায় রাজত্ব করবে?—একথাটাও দলের একজন পান্ডার মুখে শোনা গেল। (এই পান্ডাটির নাম নির্মল চন্দ্র চন্দ্র—লেখক)। শাসমলকে হঠাইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রকে নানা ফিকিরে খাড়া করা হইল। পার্টিতে ভোটের সময়ে শাসমলের নাম টিঁকিল না। দল ভঙ্গের ভয়ে দেশবন্ধুও বেশি জোর করিতে পারিলেন না।' (দেশবন্ধু স্মৃতি ৫০ পৃঃ)

কংগ্রেস দল কলকাতা করপোরেশন দখল করবার পর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের শুধু চাকরী দেওয়াই হোতো না, বড় বড় কণ্ট্রাক্টও দেওয়া হোতো। অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির বেঙ্গল বেল্টিং কোম্পানীকে ও সুরেশচন্দ্র দাশের ফার্নিচার কোম্পানিকে বড় কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল। করপোরেশনের বা মিউনিসিপ্যালিটির টাকা দিয়ে দল বা দলের কর্মী পোষণ করা যে কতখানি গর্হিত সে সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি লিখেছিলেনঃ "স্বরাজপন্থী দলটি করপোরেশনের সদস্যদের অধিকাংশ পদ অধিকার করেছেন এবং দেখা যাচ্ছে যে, দলীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁরা তাঁদের সংখ্যাধিক্যকে কাজে লাগাচ্ছেন। এই ধরনের নীতি হয়ত স্বাভাবিক—কিন্তু এটি ন্যায়সংগত নয়, কারণ মনুষ্য সমাজের পরিচালনার ব্যাপারে নীতিবোধ ও ন্যায়-বিচারের প্রাধান্য থাকে এবং এর থেকে কোনো প্রকারের বিচ্যুতি জনস্বার্থের হানিকারক যা অবশেষে দলের উপরেই প্রত্যাঘাত করে। যাঁরা ক্ষমতাসীন তাঁরা ক্ষমতার মদগর্বে হয়ত সেই দেয়ালের লিখনটিকে পড়তে পারছেন না.....কিন্তু লেখাটি রয়েছে, যার কার্যগতি মহান ও মৌলিক জাগতিক নিয়মগুলির মতই অমোঘ।" (এ নেশন ইন মেকিং ৩৬৩ পৃঃ)

বিভিন্ন করপোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলি অধিকারের ব্যাপারে, বিশেষ করে, বাংলায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরাই প্রধান অংশ নিতেন এবং ফলে তাঁরাই করপোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদিতে চাকরী বা কণ্ট্রাক্টের সিংহভাগ চাইতেন ও পেতেন, কিন্তু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ছিলেন সাধারণভাবে মুসলমান-বিরোধী। সেই হেতু মুসলমানের ভাগে তাঁদের সংখ্যানুপাতিক ভিত্তি অনুসারে চাকরী বা কণ্ট্রাক্ট যাতে না পড়ে সেদিকে তাঁরা প্রখর দৃষ্টি রাখতেন। স্বভাবতই এতে মুসলমানদের অসন্তোষ অত্যন্ত তীব্র ও ব্যাপক হয়ে উঠলো এবং তাঁরা ভাবলেন, কংগ্রেসের সংগে থাকলে তাঁরা তাঁদের এই সব বিষয়ে ন্যায্য পাওনা কোনোদিনই পাবেন না। তাই তাঁরা প্রায় সমগ্রভাবে কংগ্রেসের শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। মৌলানা আক্রাম খাঁর চেষ্টায় মুসলমান

প্রজাদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে এই সময়ে বাংলায় প্রজা সমিতি গঠিত হয়েছিল। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এর প্রতিষ্ঠাতা সহকারী সভাপতি ছিলেন। এই প্রজা সমিতি পরে কৃষক-প্রজা দলে রূপান্তরিত হয়ে বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে অপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল।

এটা খুবই দুঃখের কথা যে, গান্ধীজী সহ এই সকল বৃহৎ কংগ্রেস নেতারা দুর্নীতি, কপটতা এবং দুরাচারের চোরাবালির উপর স্বাধীন ভারতের নতুন সমাজ-সৌধের ভিত্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এবং দেশের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এই যে, গান্ধীজী অন্যান্য বহু বৃহৎ কংগ্রেস নেতার বহু দুর্নীতি-দুষ্ট রাজনৈতিক কার্যাবলীর পরোক্ষভাবে প্রশংসা করে গেছেন। একথা সকলেই জানেন যে, ভারতের রাজনীতিতে দুর্নীতির প্রথম অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। সেই কারণেই বিলাতের কি শ্রমিক দল, কি রক্ষণশীল দল—উভয় দলের নেতারা হাউস অফ লর্ডস্-এ প্রকাশ্যে চিত্তরঞ্জনকে নীতিজ্ঞানহীন রাজনীতিক (আনস্ক্রুপুলাস পলিটিসিয়ান) বলে অভিযুক্ত করেছিলেন। এমন কি, ১৯২৫-এ চিত্তরঞ্জনের দিক থেকে যখন ইংরেজ সরকারের সংগে একটা আপোষের প্রস্তাব তোলা হয়েছিল, তখন চিত্তরঞ্জনের নীতিজ্ঞানহীনতার জন্যই ইংরেজ সরকার সে প্রস্তাব বিবেচনা করতেও রাজি হননি। ইংরেজ সরকারের মন্ত্রীরা তখন একবাক্যে বলেছিলেন যে, চিত্তরঞ্জনকে তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেন না। কিন্তু ১৯২৭-এ মাদ্রাজ শহরে চিত্তরঞ্জনের এক প্রতিকৃতি উন্মোচন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে গান্ধীজী বলেছিলেনঃ "চিত্তরঞ্জন এক মহান ধর্মগুরু ছিলেন।"

লবন ট্যাক্স-এ বৃদ্ধি ও জমিদার-তোষণ নীতি

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য ব্যাপার হচ্ছে যে, ১৯২৭-এ সেই বছরের ফিনান্স বিল পাশ করতে গিয়ে ভারত সরকারকে সমর্থন করে মতিলাল নেহরু দরিদ্র ভারতীয়ের লবন ট্যাক্স মণ প্রতি দশ আনা থেকে বাড়িয়ে মণ প্রতি আড়াই টাকা ধার্য করতে সরকারকে প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেস দলের হয়ে সাহায্য করেছিলেন। ভারত সরকার যাতে এই ফিনান্স বিলটি পাশ করিয়ে লবন ট্যাক্স দশ আনা থেকে বাড়িয়ে আড়াই টাকায় দাঁড় করাতে পারে তার জন্যে মতিলাল নেহরুর ব্যবস্থাপনায় ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য ভোটের ঠিক আগের দিন দিল্লী ত্যাগ করে যান এই কারণে যে, তাঁদের অনুপস্থিতিতে গভর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় ভোটাধিক্যে ফিনান্স বিলটি পাশ করিয়ে নিতে পারবে। এবং এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রটি যে গান্ধীজীর অজ্ঞাত-সারে করা হয়েছিল তা বিশ্বাস করা চলে না। কিন্তু গোপন ষড়যন্ত্রের কথা চাপা থাকেনি—প্রকাশ হয়ে পড়েছিল এবং তখন গান্ধীজী এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ বা নিন্দার কথা জানান নি।

দরিদ্র ভারতবাসীর লবন ট্যাক্স মণ প্রতি দশ আনা থেকে আড়াই টাকায় বাড়িয়ে দেবার জন্য ১৯২৭-এ ফিনান্স বিলটি পাশ করাতে ভারত সরকারকে সাহায্য করে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা মতিলাল নেহরু দেখিয়েছিলেন যে, তিনি কতখানি নীতিজ্ঞানবিবর্জিত। এই নীতিজ্ঞান-বিবর্জনের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন গান্ধীজী তাঁর নীরবতার মধ্য দিয়ে। জাতির প্রতি এই ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার সমালোচনা করে প্রকাশ্যভাবে সংবাদপত্রে লিখেছিলেন বোম্বাই-এর 'সংগ্রামী' সাংবাদিক বি. জি. হর্নিম্যান। লবন ট্যাক্স মণ প্রতি দশ আনা থেকে আড়াই টাকায় বাড়িয়ে দিতে কংগ্রেস নেতারা যে ভারত সরকারকে সাহায্য করেছিলেন তার উল্লেখ করে বি. জি. হর্নিম্যান তাঁর কাগজ ইণ্ডিয়ান নিউজ হেরাল্ডে লিখেছিলেনঃ "(আমরা কোথায় চলেছি?) দূর থেকে যা দেখেছি তাতে এই সুগভীর ধারণা নিয়ে আমি দিল্লী গিয়েছিলাম যে, কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে একটা অত্যন্ত প্রচণ্ড গোঁজামিল রয়েছে। সেই ধারণাতে বদ্ধমূল হয়ে আমি দিল্লী থেকে ফিরে এসেছি। গত কয়েকদিন ধরে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন লক্ষ্য করে আমি এই দুঃখময় সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বাধ্য হয়েছি যে, কংগ্রেস দল গভর্নমেণ্টের সংগে সহযোগিতার জালে বাঁধা পড়ে গেছে। আমি এটা সুনিশ্চিতভাবে বলতে

রয়েছে। কৃষক ও প্রজার উপর শোষণ-তন্ত্র চাপিয়ে দিতে যারা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সংগে প্রকাশ্যে হাত মিলাতে লজ্জা পায় না, তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে সমগ্র মুসলমান সমাজ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। বাংলার মুসলমান কৃষক সবিস্ময়ে দেখলেন যে, দরিদ্র প্রজা ও কৃষকের উপর অত্যাচার ও শোষণের নিষ্পেষণ চালাবার জন্য সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ কংগ্রেসের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতারা বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বড় বড় আমলা ঝানু ইংরাজ আই, সি, এস-দের সংগে এক দরজায় ভোট দিতে মোটেই লজ্জিত নন। বাংলার কৃষককুল সভয়ে দেখতে পেল যে, কংগ্রেসের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি যে আইন পাশ করতে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের সংগে ৪২ বার ভোট দিয়েছেন, সেই আইনে তাদের সামান্যতম অধিকারটুকুও কেড়ে নেবার ব্যবস্থা হয়েছে। দরিদ্র কৃষকের জমি বিক্রয়, হস্তান্তর, দান বা উপঢৌকনের সময়ে জমিদারকে উচ্চহারে সেলামি দেবার ব্যবস্থা হোলো এই আইনে। এমন-কি, এই সেলামির টাকা জমিদারের ঘরে পেঁাছে দেবার খরচ দিতেও দরিদ্র প্রজাকে বাধ্য করা হোলো। সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা প্রথমে সরকার প্রস্তাবিত জমির মূল্যের শতকরা ২৫ ভাগ সেলামিতেই সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ ও মুসলমান সদস্যদের বিরোধিতায় সেলামির ভাগ কমিয়ে শতকরা ২০ ভাগে আনা হয়। মুসলমান সদস্যরা সেলামি দেবার বিরোধিতা করেছিলেন, পরে শতকরা ৬¼ ভাগের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাঁরা সংখ্যাল্প থাকায় তাঁদের প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। এই আইনের বলে সমস্ত বর্গাদারকে দিন-মজুরে পরিণত করে তাকে উচ্ছেদের পথ জমিদারের খেয়াল-খুশির উপর ছেড়ে দেওয়া হোলো। প্রজাদের দখলি জমিতে পাকা বাড়ি তৈরি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোলো, এমন-কি তার দখলি জমিতে তার নিজের পোঁতা গাছ কাটবার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হলো। সর্বোপরি প্রজার জমি হস্তান্তর বা বিক্রয়ের বেলায় জমিদারকে অগ্রাধিকার (রাইট অফ প্রি-এম্পশান) দেওয়া হোলো, যাতে প্রজা ইচ্ছামত তার জমি বিক্রয় করে উচিত মূল্য না পেতে পারে। কংগ্রেস যখন কাউন্সিল-প্রবেশ নীতি গ্রহণ করে তখন কংগ্রেস নেতারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁরা কোনো দিন কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রশ্নে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে ভোট দেবেন না। কংগ্রেস দলের সেই বিঘোষিত নীতির প্রতি অমর্যাদা করে সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা এই কালা আইন পাশ করবার জন্যে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে একযোগে ৪২ বার ভোট দিলেন।

বাংলার বিক্ষুব্ধ মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে এই আইন পাশের বিরোধিতা করে বিখ্যাত আইনবিদ স্যার আবদুর রহিম কাউন্সিলে বলেছিলেনঃ "এক্ষেত্রে আমরা আইন-প্রণয়নের কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং

মৌলিক নীতি লঙ্ঘন করেছি। দরিদ্র বর্গাদারদের সম্বন্ধে বলতে গেলে, আমরা তাদের পথে সকল রকমের বাধা সৃষ্টি করেছি। সাক্ষ্য আইনের সকল রকম সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত করেছি। এই কাউন্সিল অর্থাৎ এই কাউন্সিলের অধিকাংশ সভ্য যথা গভর্ণমেণ্টে এবং তাদের সমর্থনকারী বিরাট স্বরাজদলের যোগসাজসে বর্গাদারদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে—যে বর্গাদাররাই হচ্ছে জমির প্রকৃত কৃষক। উপরোক্ত শক্তিশালী জোট—যার সঙ্গে রায়তের স্বার্থে যাঁরা কাজ করতে চান তাঁরা লড়াই করে সফল হতে পারবেন না—এখন একে একে রায়তের অন্যান্য অধিকারগুলি কেড়ে নিতে আরম্ভ করেছে। এই আইনটি সম্পূর্ণভাবে বে-আইনী। এই আইনের দ্বারা একেবারে বিনা কারণে একশ্রেণীর জনসাধারণের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তারা করেছে কি? তারা রাজদ্রোহ করেছে? জনসাধারণের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেবার কি অধিকার এই কাউন্সিলের আছে?" (কাউন্সিলের বিবরণী থেকে ইংরেজির অনুবাদ)

ফজলুল হক বলেছিলেনঃ "ভোটের তালিকা থেকেই দেখা যাবে যে, আমরা এক সহানুভূতিহীন সংখ্যাগুরুদলের দয়ার পাত্র হিসাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। আমরা মনে করি যে, মুসলমান আইনের একটি প্রধান বিধান লংঘিত হয়েছে এবং আমরা এই সভা পরিচালনায় আর অংশ গ্রহণ করতে রাজি নই। এই সম্বন্ধে বিতর্কের পথে আমরা এক চরম সংঘাতপূর্ণ স্থলে এসে দাঁড়িয়েছি। বোধ হয় আমি এটা বাড়িয়ে বলছি না যে, এই কাউন্সিলের বিতর্কের ফলাফল এবং এই সকল বিতর্কের শেষে বিলটি যে আকারে রূপ পরিগ্রহ করবে, তা সমগ্রভাবে ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে সুগভীরভাবে প্রভাবিত করবে। এই সভায় যে বিলটি আনা হয়েছে সেটি হচ্ছে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে গত অর্ধশতাব্দীতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যত আইন পাশ হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম। আমরা এই কাউন্সিলে যে সকল লোকের ভোটে সভ্য হতে পেরেছি তাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ হচ্ছে রায়ত এবং অবস্থাটা এই দাঁড়িয়েছে যে, হয় আমরা তাদের দাবি নিয়ে দাঁড়াবো, না হলে আমাদের এই কাউন্সিলের সভ্যপদ ত্যাগ করতে হবে। যে অগণিত লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের ভোটটি আমাদের দিয়েছিল এই বিশ্বাসে যে, আমরা তাদের বলবার কথাটুকু এই কাউন্সিলে তুলে ধরবো, এখানে আমরা যদি তাদের দাবি নিয়ে না দাঁড়াই তাহ'লে আমাদের এই কাউন্সিলে থাকবার কিছুমাত্র অধিকার থাকবে না।" (ইংরেজির অনুবাদ)

খান বাহাদুর (পরে স্যার) আজিজুল হক বলেছিলেনঃ "আপনারা যদি এই আইনটি পাশ করেন তাহলে জেনে রাখুন—এবং আমি গভর্ণমেণ্টের মেম্বার-দেরও জানাচ্ছি যে—এর ফলে অন্ততঃ বাংলায় জনসাধারণকে বিদ্রোহের পথে

ঠেলে দেওয়া হবে। জনসাধারণ এখনও ইংরেজ রাজত্বের পক্ষেই আছে এবং তারা চায় যে, ইংরেজরাও ভারতে আরও কিছুদিন থাকুক। কিন্তু আপনারা যদি এই আইন পাশ করেন তাহ'লে আমার নম্র ভাষায় আমি বলবো যে, স্বরাজদল যেমন দেশের বুদ্ধিজীবীদের বিদ্রোহের প্রতীক তেমনি এই আইন বাংলার সাধারণ মানুষের বিদ্রোহের পথ খুলে দেবে। আমার বন্ধুরা আমাকে "কোশ্চেন" করছেন এটা ঠিক কিনা জানবার জন্যে। আমি তাঁদের ভোটকেন্দ্রে গিয়ে খোঁজ করতেও রাজি আছি এবং আমি আবার নিশ্চিতভাবে বলছি যে, এটি সাধারণ মানুষের বিদ্রোহের পথ খুলে দেবে। এবং তার কারণটি হচ্ছে, আজ হোক কাল হোক এর ফলে দেশের সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি এই সতর্কীকরণ করছি, একজন অসহযোগী হিসাবে নয়, বরং গভর্ণমেণ্টের এমন একজন সমর্থক হিসাবে যে গভর্ণমেণ্টের সকল বিধানকে ভালোমন্দ বিবেচনা না করেই সমর্থন করে এসেছে ('শ্যেম শ্যেম' ধ্বনি)। কিন্তু যে সকল বন্ধু এখন 'শ্যেম' 'শ্যেম' বলে চিৎকার করছেন তাঁরা নিজেদের অপরিসীম লজ্জা ও অপমানের বোঝা নিয়ে আজ সেই গভর্ণমেণ্টের সঙ্গেই পবিত্র বন্ধনে বাঁধা পড়েছেন যে গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা এখানে এসেছিলেন। আমরা যদি বলশেভিক বা কমিউনিস্ট হয়ে যাই, তাহলে তাঁদের পক্ষে কিছু বলা শোভা পাবে না।" (ইংরেজির অনুবাদ)

চিত্তরঞ্জন প্রবর্তিত হিন্দু-মুসলিম চুক্তিটি যাতে বাতিল হয়ে যায় তার জন্য বাংলার পঞ্চ বৃহৎ নেতা বিধান রায়, শরৎ বসু, তুলসী গোস্বামী, নির্মল চন্দ্র ও নলিনী সরকার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সংগে মিলিত হয়ে একযোগে ষড়যন্ত্র করেছিলেন যাতে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম চুক্তির শক্তিস্তম্ভ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে বাংলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়িত করা যায়। আবার অন্য দিকে বাংলার চাষী, বিশেষ করে মুসলমান চাষীদের সর্বনাশকারী ১৯২৮-এর বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন যাতে গভর্ণমেটেণ্র সংগে সহযোগিতা করে বিনা বাধায় কাউন্সিলে পাশ করা যায়, তার জন্য বাংলার কংগ্রেস নেতারা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সংগে মিলিত হয়ে ঠিক করলেন যে, বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে তাঁরা বঙ্গীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কিছুতেই ঢুকতে দেবেন না। কারণ, তিনি থাকলে এই কৃষক-বিরোধী আইনটি পাশ হতে প্রাণপণে বাধা দিতেন। ১৯২৬-এর সাধারণ নির্বাচনে উত্তর মেদিনীপুর নির্বাচন কেন্দ্রে তাঁরা মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সরকার মনোনীত চেয়ারম্যান জমিদার দেবেন্দ্রলাল খাঁকে বীরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন। অত্যাচারী গভর্ণর লর্ড লিটনের এই প্রিয়পাত্রটি হঠাৎ বাংলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের নয়নের মণি হয়ে উঠলেন এবং তাঁরা ঠিক করলেন, বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের বদলে তাঁকেই তাঁরা তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে কাউন্সিলে পাঠাবেন।

"মানি-ব্যাগের" এমনি প্রভাব যে, অত্যাচারী লিটনের স্নেহের দুলাল দেবেন্দ্রলাল খাঁ রাতারাতি স্বয়ং মতিলাল নেহরুরও স্নেহের দুলাল হয়ে উঠলেন। বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের বিরুদ্ধে এই নির্বাচনে দেবেন্দ্রলাল খাঁ বহু রকমের জাল জুয়াচুরি করেছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য হচ্ছে—দেশবন্ধুর বিধবা পত্নী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর নাম জাল করে দেবেন্দ্রলাল খাঁর পক্ষে ভোট দেওয়ার একটি আবেদনপত্র প্রচার। এই ছাপানো আবেদনপত্রে কোনো প্রেসের নাম ছিল না। আবেদনপত্রটি এই ছিলঃ "হিন্দু সাবধানঃ আমার স্বর্গীয় স্বামী ক্ষমতাশালী আমলাতন্ত্রের সংগে সংগ্রামরত অবস্থায় দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। নিজের জীবন দিয়ে তিনি কংগ্রেসকে দেশবাসীর জাতীয় মহাসংঘে পরিণত করে গিয়েছেন। সেই কংগ্রেস আজ গৃহশত্রুদের আক্রমণে আক্রান্ত হয়েছে। তাঁর শক্তিধর সহকর্মী কংগ্রেসের নাম নিয়েই আমার স্বামীর বুকে ছুরিকা নিবদ্ধ করতে উদ্যত। এই ব্যক্তি এখন কংগ্রেস প্রার্থী দেবেন্দ্রলাল খাঁর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছেন। মেদিনীপুরের অধিবাসীগণ, দেশবন্ধুর প্রিয় কংগ্রেসকে ধ্বংস করবার জন্য এইসব ব্যক্তির দ্বারা প্ররোচিত হবেন না। কারণ, কংগ্রেসই দেশবাসীর একমাত্র সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। দেবেন্দ্রলালের পক্ষে ভোট দিয়ে কংগ্রেসকে রক্ষা করুন। ইতি—দেশবন্ধুর হতভাগিনী পত্নী বাসন্তী দেবী।"

দুঃখের সঙ্গেই বলতে হবে, এই আবেদনপত্র সম্বন্ধে বাসন্তী দেবী এক অদ্ভুত মনোভাব নিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রলাল খাঁর পক্ষ থেকে তাঁর সমর্থকরা যখন হাজারে হাজারে এই জাল আবেদন বিলি করছিল, তখন কুমিল্লার প্রখ্যাত কর্মী বসন্ত মজুমদার (এই নির্বাচনে বসন্তবাবু ও তাঁর পত্নী হেমপ্রভা মজুমদার নিজেদের জীবন বিপন্ন করে বীরেন্দ্রনাথের হয়ে লড়াই করেছিলেন) টেলিগ্রাম করে বাসন্তী দেবীর নিকট জানতে চেয়েছিলেন যে, এই আবেদনপত্রে তিনি সই করেছেন কিনা। কিন্তু বাসন্তী দেবী বসন্ত মজুমদারের টেলিগ্রামের কোনো জবাব দেন নি। কিন্তু দেবেন্দ্রলাল খাঁ নির্বাচনে জিতে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তী দেবী ঘোষণা করলেন যে, তাঁর নামে দেবেন্দ্রলাল খাঁর পক্ষে নির্বাচনে যে আবেদনপত্র বেরিয়েছে সেটি জাল।

বাংলা তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কংগ্রেস নেতাদের এই নির্লজ্জ ধনিক-তোষণ নীতিও দেশের মুসলমান সমাজকে কম শঙ্কিত করে নি। বাংলায়, বিশেষত পূর্ব বাংলায়, জমিদার শ্রেণী বেশির ভাগ হিন্দু ও চাষীরা প্রধানত মুসলমান। আইনের সাহায্যে জমিদারের হাতে বেশি ক্ষমতা চলে গেলে তারা যে সেই ক্ষমতা কৃষকদের উপর অত্যাচারের জন্যই কাজে লাগাবে, এই কথা ভেবে মুসলমান চাষী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। কংগ্রেস নেতাদের এই ধনিক-তোষণ নীতির কারণেই তাঁরা ১৯২১-এর মেদিনীপুর ইউনিয়ন-বোর্ড

বিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। এবং এই কারণেই বাংলার এই প্রথম গণ-আন্দোলনের কথা দেশের কোনো ইতিহাসে সামান্য-মাত্রও উল্লেখ নেই। কংগ্রেস নেতাদের ও গান্ধীজীর আসল ভয়টি ছিল যে, গ্রামের চাষীদের সংগঠিত করে তুললে তারা ভবিষ্যতে একদিন জমিদারের বিরুদ্ধে শক্তি অর্জন করবে এবং সেইটি এড়াবার জন্যই গ্রামের লোকেদের সংগঠিত করবার সকল প্রচেষ্টা গান্ধীজী প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা বাধা দিয়েছিলেন। মেদিনীপুরের গ্রাম্য চাষীদের ইউনিয়ন-বিরোধী আন্দোলনকে তাই তাঁরা সুনজরে দেখলেন না। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল যখন নিজের নামে নিজ দায়িত্বে এই আন্দোলন চালালেন এবং সমগ্র মেদিনীপুর জেলা থেকে ২২৭টি ইউনিয়ন বোর্ড তুলে নিতে লর্ড লিটনের গভর্নমেণ্টকে বাধ্য করলেন, তখন গান্ধীজী লিখেছিলেনঃ "বাংলার বিদ্রোহীরা সাফল্যের সংগে তাঁদের বিদ্রোহের যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছেন।" (ইংরেজির অনুবাদ, অমৃতবাজার পত্রিকা ২৫.১১.৪০)

কংগ্রেস নেতারা ও গান্ধীজী যে ইউনিয়ন-বোর্ড বিরোধী গ্রাম্য চাষীদের আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, তার কারণটি জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেনঃ "কংগ্রেস ছিল সামগ্রিকভাবে একটি জাতীয়তাবাদী সংগঠন এবং এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বহু মাঝারি স্তরের জমিদার এবং এমন কি কয়েকজন বড় জমিদারও। কংগ্রেসের নেতারা সাংঘাতিকভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন যেন এমন কিছু না করা হয় যাতে শ্রেণী-বিন্যাসের প্রশ্নটি প্রাধান্য লাভ করে কিম্বা কংগ্রেসের জমিদার গোষ্ঠী রুষ্ট হয়ে পড়ে। সেই কারণে (১৯৩০-এর) আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম সম্পূর্ণ ছ'টি মাস তাঁরা গ্রামাঞ্চলে একটি পূর্ণাঙ্গ কর-বন্ধ আন্দোলনের প্রারম্ভকে এড়িয়ে চলেছিলেন, যদিও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এইরূপ আন্দোলন আরম্ভের পক্ষেই ছিল।" (ইংরেজির অনুবাদ)

জমিদার-গোষ্ঠী ও তাদের বশংবদ কংগ্রেস নেতারা কংগ্রেসের উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব চালাবার কি প্রচণ্ড ইচ্ছায় চালিত হতেন, সেটা আরও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছিল চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর। চিত্তরঞ্জনের শেষ যাত্রা সম্পন্ন করে গান্ধীজী কলকাতায় থেকে গেলেন চিত্তরঞ্জনের জায়গায় কে বাংলার নেতা হবেন, সেটা ঠিক করে দেবার জন্য। তখন গান্ধীজী কংগ্রেসের সভাপতিও ছিলেন। কলকাতায় থাকার সময়ে তিনি প্রায়ই যেতেন তখন কংগ্রেসের নেতা এবং ১৯৩৭-এ বাংলার মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার হিন্দু অর্থসচিব ও ১৯৪২-এর "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের সময়ে বড়লাট লিনলিথগোর শাসন-পরিষদের সদস্য তাঁরই স্নেহধন্য নলিনী সরকারের পুরানো বাড়ি 'সমবায় ম্যানসনে।'

অনেকদিন ধরে শলা-পরামর্শ চললো। দাশ সাহেবের ভবানীপুরের

বাড়িতেও সভা হোতো। চিত্তরঞ্জন একাধারে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি, কাউন্সিলে নেতা ও কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন। প্রশ্ন উঠলো—একজনকেই তিনটি পদ দেওয়া হবে, না বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন পদে দেওয়া হবে। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত একাই তিনটি পদ পাবার দাবি জানালেন। মেয়র পদের আরও দু'জন দাবিদার হলেন—শরৎচন্দ্র বসু ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। নির্মল চন্দ্র সম্বন্ধে গান্ধী বললেনঃ "উনি বড় আরামপ্রিয় লোক, ওঁকে দিয়ে কাজ হবে না।" শরৎ বসু সম্বন্ধে বললেনঃ "উনি যোগ্য আইনবিদ হতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেসের কাজে ওঁর কোনোই অভিজ্ঞতা নেই।" দুজনেরই দাবি নাকচ হয়ে গেল। ত্রি-মুকুট অর্থাৎ তিনটি পদই যতীন্দ্রমোহনকে দেওয়া উচিত বলে গান্ধীজী মন্তব্য করলেন।

তখন যশোরের প্রতিষ্ঠাবান নেতা অতুল সেন বললেনঃ "যতীন্দ্রমোহনকে কর্পোরেশনে মেয়র এবং কাউন্সিলে নেতা করা যেতে পারে, কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি তাঁকে করা উচিত নয়। গ্রাম বাংলায় কংগ্রেস প্রায় মৃত, সেই কংগ্রেসকে সঞ্জীবিত করবার ক্ষমতা যতীন্দ্রমোহনের নেই। কারণ, তিনিঃ ১. নিয়মিত মদ্যপানে অভ্যস্ত (হ্যাবিচুয়েটেড্ টু ড্রিংকিং) ২. অসহযোগের সময়ে ব্যারিস্টারি প্র্যাকটিস না ছেড়ে নিয়মিত প্র্যাকটিস করেন ৩. (সৌখিন ক্লাবগুলিতে) ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে "হব্-নব্" করেন।"

অতুল সেনের যুক্তি খণ্ডন করে গান্ধীজী বললেনঃ "১. মদ্যপানে কোনো দোষ নেই, মতিলাল নেহরু ও অনেক নো-চেঞ্জাররাও মদ্যপান করেন (দেয়ার ইজ নাথিং রং ইন্ ড্রিংকিং, মতিলাল নেহরু এণ্ড মেনি নো-চেঞ্জারস অলসো ড্রিংক্) ২. কংগ্রেস ব্যারিস্টারি প্র্যাকটিসের অনুমতি দিয়েছে ৩. 'হব্-নব্' করাও বিন্দুমাত্র অন্যায় নয়।"

তখন যশোরের অতুল সেন, ঢাকার শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, কুমিল্লার বসন্ত মজুমদার, বাঁকুড়ার বিজয় চ্যাটার্জি, নদীয়ার হেমন্ত সরকার ও মেদিনীপুরের রামসুন্দর সিং বললেন, যতীন্দ্রমোহনকে কর্পোরেশনে মেয়র ও কাউন্সিলে নেতা করা হোক কিন্তু, গ্রামবাংলার প্রায়-মৃত কংগ্রেসকে সঞ্জীবিত করতে পারে একটি মাত্র লোক—বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, তাঁকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক করাও বিন্দুমাত্র অন্যায় নয়।"

গান্ধীজী বললেন, "শাসমল দেশবন্ধুর শেষ-যাত্রায় যোগ দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুরে ফিরে গেছে। আপনারা যদি তাঁকে চান তাহলে তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে সত্যাগ্রহ করবো।" তখন গ্রাম-বাংলার কংগ্রেস-কর্মীদের চাপাচাপিতে বাধ্য হয়ে গান্ধীজীকে মত দিতে হোলো যে, বীরেন্দ্রনাথকেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি করা হবে এবং

তাঁকে তিন'শ টাকা মাসোহারা দেওয়া হবে। গান্ধীজী রামসুন্দর সিংকে মেদিনীপুরে পাঠিয়ে দিলেন বীরেন্দ্রনাথকে ধরে আনবার জন্য।

কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ জানতেন, গান্ধীজীর আহ্বান অকৃত্রিম ছিল না। তিনি জানতেন, গান্ধীজী জমিদার-গোষ্ঠী ও তাদের বশংবদ কংগ্রেস নেতাদের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারবেন না, কারণ এ'দের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরাও যোগ দিয়েছিলেন। তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করলেন। জমিদার গোষ্ঠীকে চটাতে গান্ধীজী ভয় পেতেন এবং সেই হেতু তিনি এক অত্যন্ত অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে চলেছেন এবং তা থেকে গান্ধীজীকে বাঁচাবার জ্যনই বীরেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যারা নেতা হতে চায়, প্রেসিডেণ্টের চেয়ারে বসতে চায় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করা তাদের পক্ষেই প্রয়োজন।

বীরেন্দ্রনাথ গান্ধীজীর কাছে প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন না দেখে গান্ধীজীও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। "শাসমলের বাড়িতে সত্যাগ্রহের" কথা তিনি আর তুললেন না। তিনি জোরালো বক্তৃতা দিয়ে যতীন্দ্রমোহনের নামই বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি, কাউন্সিলে নেতা ও কর্পোরেশনের মেয়র হিসাবে ঘোষণা করে দিলেন।

কিন্তু, প্রদেশ কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব কোলাহল মেটাতে ব্যর্থ হয়ে যতীন্দ্রমোহন এক বছরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯২৬-এর শেষের দিকে সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন। তখন পল্লীবাংলার নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মীরা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে ডেকে এনে তাঁর হাতে কংগ্রেসের ভার তুলে দিলেন। তাঁদের ইচ্ছা ছিল, তিনিই প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করুন। কিন্তু তিনি নিজে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করে বাসন্তী দেবীকে সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য তাঁর বাড়িতে গিয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। বাসন্তী দেবী রাজি না হওয়ায় অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জিকে সভাপতির পদ দেওয়া হোলো।

পল্লী বাংলার কংগ্রেস কর্মীগণ ভাবলেন যে, বীরেন্দ্রনাথকে সংগে নিয়ে তাঁরা এবার এক নতুন কংগ্রেস গড়ে তুলবেন। কিন্তু তাঁরা কংগ্রেসের জমিদার-গোষ্ঠীর কথা ভাবেননি—ভাবেননি যে, কংগ্রেসের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতারা, মতিলাল নেহরু এবং গান্ধীজী একদিকে জমিদারদের অন্যদিকে মুসলমান-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলের কতখানি ক্রীড়নক ছিলেন। পল্লীবাংলার কংগ্রেস কর্মীদের চেষ্টায় গৌহাটি কংগ্রেসে (১৯২৬) নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য করবার জন্য বীরেন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাবিত হোলো। মতিলাল নেহরু ও ভিতরে ভিতরে গান্ধীজী প্রমাদ গণলেন। তাঁদের মিলিত চেষ্টায় বীরেন্দ্রনাথ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচনে ভোটে হেরে গেলেন।

এই গৌহাটি কংগ্রেসে গান্ধীজীর মনোনীত বাংলার নেতা যতীন্দ্রমোহন

সেনগুপ্ত তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেনঃ "জমিদারদের দেওয়া টাকাতেই কংগ্রেস সাম্প্রতিক নির্বাচনে জিততে পেরেছে।" তাঁর বক্তৃতা শুনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অনেক সদস্য "শ্যেম শ্যেম" বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। তখন যতীন্দ্রমোহন বললেনঃ 'শ্যেম শ্যেম' বলুন, সত্যটা থেকেই যাবে।" (দি বেঙ্গলী ২৬.১২.২৬)

গৌহাটি কংগ্রেসে সর্বভারতীয় নেতারা যে স্বৈরতান্ত্রিক মনোবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন তার সমালোচনায় বোম্বাইয়ের মহান সাংবাদিক বি. জি. হর্নিম্যান ১৯২৭-এ কেরল জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণে অভিযোগ করেছিলেন যে, কংগ্রেসকে এইভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন নেতার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা হচ্ছে।

গৌহাটিতে মতিলাল নেহরু এবং ভিতরে ভিতরে গান্ধীজী বীরেন্দ্রনাথের উপর যে বিরূপতা দেখিয়েছিলেন, তার অনেকগুলি কারণ ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে আইনসভাগুলিতেও অসহযোগ নীতি সফল করে তুলে কিভাবে আইনসভাগুলির অস্তিত্ব ব্যর্থ করে দেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে যখন নিখিল ভারত স্বরাজ্য দল গঠিত হোলো, তখন চিত্তরঞ্জন তার সভাপতি হলেন এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন মতিলাল নেহরু, বীরেন্দ্র-নাথ শাসমল, বিঠলভাই প্যাটেল ও চৌধুরী খালিকুজ্জমান। এই স্বরাজ্য (বা স্বরাজ) দল সম্বন্ধে জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেনঃ "জলের জীবনকে হাঁস যেমন গ্রহণ করে আমার বাবা এসেম্বলির কাজও সেইরকমভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আইন ও সংসদ সম্বন্ধীয় শিক্ষাগ্রহণের সংগে এটা খুব ভালোভাবে খাপ খেয়েছিল এবং সত্যাগ্রহ ও তার আনুষঙ্গিক সম্বন্ধে যেমন নয় তেমন এই ব্যাপারের বিধানগুলি সম্বন্ধে তিনি সুপরিজ্ঞাত ছিলেন। তিনি তাঁর দলটিকে কঠোরভাবে শৃংখলাবদ্ধ রেখেছিলেন এবং এমনকি অন্যান্য দলগুলিকে ও ব্যক্তিবিশেষকে তাঁকে সমর্থন জানাতে প্ররোচিত করতেন। কিন্তু শীঘ্রই নিজের দলের লোকের নিকট থেকেই তাঁকে বিপদের সম্মুখীন হতে হোলো। স্বরাজ দলের প্রারম্ভের সময়তেই কংগ্রেসের নো-চেঞ্জারদের সঙ্গে এদের বোঝাপড়ায় আসতে হয়েছিল এবং কংগ্রেসের ভিতরে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে দলে নেওয়া হয়েছিল। তারপরে নির্বাচন এসে গেল এবং তার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়লো, যা পাওয়া যেত কেবল ধনশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকেই। অতএব, এইসব ধনশালী ব্যক্তিদের প্রচুর তোয়াজে রাখতে হোলো এবং এঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে নির্বাচনে স্বরাজ দলের প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে বলা হোলো।

এইসব লোক স্বরাজ দলকে একেবারে গোড়া থেকেই দুর্বল করে দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে কাজ করতে গিয়ে

অন্যান্য ও অধিকতর নরমপন্থী দলগুলির সঙ্গে নিত্য আপোষ করতে হোতো এবং এই সবের জন্য সংগ্রামশীলতার পবিত্রতা ও আদর্শনিষ্ঠা খুব বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। ধীরে ধীরে দলের মধ্যে মানসিকতার ও শৃংখলার অবনতি ঘটতে আরম্ভ করলো এবং দুর্বলচিত্তের লোকেরা ও স্বার্থান্বেষীরা যথেষ্ট বেগ দিতে লাগলো। স্বরাজ দল আইনসভাগুলিতে ঢুকেছিল "আভ্যন্তরীণ অসহযোগের" নীতি ঘোষণা করে। সামান্যসংখ্যক লোক দিয়েই যখন খেলা চালানো যেত তখন গভর্নমেণ্ট ঠিক করলো, স্বরাজী-দের মধ্যেই বিরোধের এবং বিবাদের সৃষ্টি করে একহাত নেবে। স্বরাজীদের সাধারণ মান অনেক নিচে নেমে গেল। এখানে ওখানে দলের লোকেরা সরকার পক্ষে যোগ দিতে লাগলো। আমার বাবা অনেক চিৎকার করলেন ও হুংকার দিলেন এবং বলতে লাগলেন যে, তিনি 'রোগগ্রস্ত অঙ্গগুলি' কেটে ফেলে দেবেন। কিন্তু এই ভয় প্রদর্শনের বিশেষ কোনো মূল্য থাকলো না, কারণ "অঙ্গগুলি" নিজেরাই হেঁটে চলে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। কোনো স্বরাজী মন্ত্রী হলেন, পরে কেউ কেউ বিভিন্ন প্রদেশে গভর্নরের একজিকিউ-টিভ কাউন্সিলের সদস্য হলেন।" (১৩১-১৩২ পৃঃ, ইংরেজির অনুবাদ) আর এক জায়গায় জওহরলাল লিখেছিলেনঃ "কাউন্সিলের মাধ্যমে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে বহু জীবিকা-সন্ধানী ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি স্বরাজ দলে জুটে গিয়েছিল।"

জওহরলাল যখন এসব কথা লিখেছিলেন তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছে। পিতার জীবিতকালে জওহরলালের এসব কথা বলার বা লেখার সাহস হয়নি। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ এই দুঃসাহসিক কাজটি করেছিলেন। তিনি চিত্তরঞ্জন, মতিলাল, এমনকি গান্ধীজীর কাছেও বহুবার এইসব অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের স্বরাজ দলে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ও ধনী জমিদারদের নিকট থেকে টাকা নিয়ে কংগ্রেস মনোনয়ন বিক্রি করার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়েছিলেন। তিনি নেতাদের এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, এইভাবে দলকে ও দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মতিলালের চেয়ে তিনি বিশ বছরের ছোটো ছিলেন, গান্ধীজী ও চিত্তরঞ্জনের তুলনায় ছিলেন দশ বছরের ছোটো। একজন বয়ঃকনিষ্ঠ ও গান্ধী, চিত্তরঞ্জন ও মতিলালের খ্যাতির তুলনায় খ্যাতি-হীন বীরেন্দ্রনাথ যে তাঁদের মত বৃহৎ নেতাদের এইভাবে সতর্ক করে দিতেন, এতে তাঁরা মনে মনে বীরেন্দ্রনাথের উপর প্রচণ্ড চটতেন। ১৯২৫-এর ১৯শে জুলাই গান্ধীজী মতিলালকে এক চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, স্বরাজ দলের কর্মপন্থাই কংগ্রেস এবার গ্রহণ করবে। অর্থাৎ, তিনি এইসব স্বার্থান্বেষী ও অবাঞ্ছিত লোকে ভরা স্বরাজদলের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করলেন।

ব্যাপারটা খুব প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৯২৪-এর নভেম্বর মাসে। ২৪শে

অক্টোবর গভীর রাত্রে সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর সংগে প্রায় একশত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হোলো। খবর পেয়ে গান্ধীজী কলকাতায় ছুটে এলেন। কয়েকদিন চিত্তরঞ্জনের সংগে শলা-পরামর্শ চললো। তারপর ৬ই নভেম্বর একদিকে গান্ধীজী ও অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন ও মতিলালের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হোলো। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে গিয়ে গান্ধীজী বলেছিলেনঃ "বাংলা সরকার যাঁদের গ্রেপ্তার করেছে তা কোনো হিংসাপন্থী দলকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে নয়—এর উদ্দেশ্য স্বরাজ্য দলের বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে রুদ্ধ করে দেওয়া।"

গান্ধীজীর এই কথাটিতে অসত্য ভাষণ হয়েছিল। হয়ত চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই গান্ধীজী এই কথাগুলি বলেছিলেন। কিন্তু অসত্য সর্বদাই অসত্য। মহাত্মা গান্ধীর মুখ থেকে বেরোলেও তা অসত্য। কারণ, যাঁরা সেদিন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী দলের সংগে হয় সক্রিয় কর্মী হিসাবে না-হয় কোনো-না-কোনো প্রকারে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের নেতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। কাজেই তাঁদের গ্রেপ্তারকে "হিংসাপন্থী দলকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে নয়", একথা বলে গান্ধীজী অসত্য ছাড়া আর কিছুই বলেন নি।

এঁদের মধ্যে অনেককেই চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসে বা স্বরাজ্যদলে এনেছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য হতে পারে এই ভেবে। তাছাড়া, চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্ব বাংলার রাজনীতিতে যে নির্ভেজাল গুণ্ডামির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল, তারই প্রয়োজনে তিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কংগ্রেসে এনেছিলেন। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রায় সকলেই প্রকাশ্যভাবে মুসলিম-বিরোধী ছিলেন বলে বাংলার রাজনীতিতে এঁদের প্রাধান্য সাধারণভাবে মুসলমানদের ও বিশেষভাবে মুসলমান কংগ্রেস কর্মীদের মনে প্রভূত পরিমাণ ভীতি ও আশংকার সঞ্চার করেছিল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজের শত্রু ছিলেন, একথা সত্যি। কিন্তু তাঁরা অহিংস-পন্থায় বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা অসহযোগের পথে, গণ-আন্দোলনের পথে গঠনমূলক কর্মপদ্ধতিতে বিশ্বাস করতেন না। কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতি ছিলো অহিংস গণ-আন্দোলন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য অহিংস গণ-আন্দোলন নয়, উদ্দেশ্য ছিল—হত্যাকান্ড এবং অন্যান্য হিংসামূলক গুপ্তপন্থায় ত্রাস সৃষ্টি করে ইংরেজকে ভারত ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য করা। কংগ্রেস যখন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের গুপ্তহত্যার পথ গ্রহণ করেনি এবং সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরাও কংগ্রেসের অহিংস গণ-আন্দোলনের পথ গ্রহণ করেনি, তখন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা কংগ্রেসে এসে কংগ্রেসের আদর্শের ক্ষতি করবে এবং নিজেদের কল্পিত বিপ্লবের আদর্শেরও ক্ষতি করবে, সেই কারণে অনেকে প্রথমেই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের

কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতিতে অনুপ্রবেশের বিরোধী ছিলেন।

কিন্তু গান্ধীজী যখন বললেন যে, স্বরাজদল বা কংগ্রেসকে যাতে এঁরা সাহায্য না করতে পারেন সেই কারণে এই সকল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীকে বাংলা সরকার গ্রেপ্তার করেছে, তখন তিনি প্রকাশ্যভাবে গুপ্তহত্যায় বিশ্বাসী ও মুসলমান-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কংগ্রেসে বা স্বরাজ্যদলে অনুপ্রবেশ অনুমোদন করলেন। ওদিকে এতদিন তিনি চেয়েছিলেন যে, কংগ্রেস সদস্যরা নিজের হাতে সুতো কেটে মাসিক ২০০০ গজ সুতো চাঁদা হিসাবে কংগ্রেসে জমা দেবেন। এই চুক্তিতে ঠিক হোলো, যারা চরকায় বিশ্বাস করে না তারা অপরের হাতে কাটা সুতো চাঁদা হিসাবে কংগ্রেসে জমা দেবে। এখানেও গান্ধীজী চিত্তরঞ্জন ও মুসলমান-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সন্তুষ্ট করবার জন্য চরকা সম্বন্ধে নিজের এতদিনের সনাতন আদর্শ থেকে সরে দাঁড়ালেন।

কিন্তু গান্ধী-দাশ-নেহরু চুক্তির সবচেয়ে মারাত্মক শর্তটি ছিল এই যে, দেশের আইন-সভাগুলিকে ফলপ্রসূ করে তুলতে হবে। আইন-সভায় নির্বাচিত হবার সময়ে স্বরাজ্য (বা স্বরাজ) দলের প্রত্যেক নির্বাচন-প্রার্থীকে শপথ নিতে হোতো যে, তাঁরা নির্বাচিত হোলে আইন-সভাকে অচল বা ধ্বংস করে দেবেন। আইন-সভাকে ফলপ্রসূ বা পারপাসফুল করবার দায়িত্ব নিলে সেই পূর্বের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হয়। গান্ধীজী ও চিত্তরঞ্জন ৬ই নভেম্বরের চুক্তি দ্বারা স্বরাজ্যদলের সদস্যদের তাঁদের পুরাতন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে আহ্বান জানালেন। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হতে চাইলেন না এবং ১৫ই নভেম্বর আইন-সভার সভ্যপদ ত্যাগ করলেন। তিনি যতদিন কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন, সরকারী ভাণ্ডার থেকে ভ্রমণ ব্যয় বাবদ তাঁর প্রাপ্য টাকার এক পয়সাও গ্রহণ করেনি এবং এইভাবে তখনকার বাংলা সরকারকে তাঁর প্রাপ্য বাবদ প্রায় ৬০০০ টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, যে আইন-সভাকে তিনি ধ্বংস করতে এসেছেন, সেই আইন-সভার সদস্য হিসাবে সরকারী কোষ থেকে টাকা নেওয়াটাও প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের সামিল।

তিনি অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই নতুন শর্তটি এখন স্বরাজ্য দলের আদর্শাবলীর মধ্যে ঢোকানো হচ্ছে কংগ্রেসের জমিদার-গোষ্ঠী ও তাদের বশংবদ নেতাদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে যাঁরা সরকারের সংগে আপোষ করে কিছুটা ক্ষমতা দখলের জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। আইন-সভার সভ্যপদ ত্যাগ করেছেন বলে তাঁকে চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে "বিদ্রোহী" আখ্যা দেওয়া হোলো। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা বললেন "বিশ্বাসঘাতক"—কেউ কেউ এখনও বলেন। গান্ধীজী, মতিলাল ও চিত্তরঞ্জনের এই নীতিভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে ও

জমিদার-গোষ্ঠীর নিকট আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে মৌন প্রতিবাদে তিনি আইন-সভা ত্যাগ করেছিলেন বলেও এই তিন নেতা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, ১৯২৪-এর ৬ই নভেম্বরের চুক্তিতে গান্ধীজী সেই নেতৃত্বের নিকট নতজানু আত্মসমর্পণ করলেন, যে নেতৃত্ব জওহরলাল যেমন লিখেছেন, বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে দলে প্রাধান্য দিয়েছিল এবং ধনী জমিদার-দের নিকট থেকে নগদ টাকা নিয়ে কংগ্রেস মনোনয়ন বিক্রি করতো।

তখন নেতারা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন বটে, কিন্তু স্বরাজ্য দল যে স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ কিছু সাহায্য করতে পারবে না, সে কথাটা দু'চার বছরে মধ্যেই দলের বৃহৎ নেতারা প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন। ১৯২৭-এর ৫ই এপ্রিল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ঘোষণা করলেন, "এসেম্বলির আবহাওয়া ও বিতর্কাদি থেকে আমি যে মোট ধারণা লাভ করেছি তা হ'লো, এর নির্বাচিত সদস্যরা গভর্ণমেণ্টের প্রভাব থেকে অধিকতর মুক্ত হয়ে উঠছেন এবং গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে নানা প্রলোভন সত্ত্বেও কঠোরতার রূপ নিচ্ছেন। কিন্তু কংগ্রেস ন্যাশনালিস্ট এবং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দল যাঁরা কেবল মুসলমান সদস্য নিয়েই গঠিত—এদের মধ্যে একটি প্রকৃত মিলন সংঘটিত না হলে আমি সুনিশ্চিত যে, আমরা কিছুতেই গভর্ণমেণ্টকে জন-সাধারণের ইচ্ছার কাছে আনত করতে পারবো না। এবং এখন আমি বুঝতে পারছি যে, "রুলস অফ বিজনেস্" যা আছে তাতে প্রকৃত কোনো বাধা বা অচলাবস্থার সৃষ্টি করার সুযোগ খুব অল্প। কারণ, প্রেসিডেণ্টকে দল-নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে হবে এবং রুলগুলিকে পরিবর্তন করিয়ে স্বরাজলাভের পথ তিনি সুগম করে দিতে পারবেন না বা সেই দলকে সাহায্য করতে পারবেন না, যাঁরা সভাকে ধ্বংস করবার পথ গ্রহণ করে সংবিধানের পরিবর্তন সাধন করতে চায়। আমার একেবারেই বিশ্বাস নেই যে, এসেম্বলিতে কাজ করে আমরা স্বরাজ বা তার সামান্য অংশটুকুও লাভ করতে পারবো।" (ইংরেজির অনুবাদ, দি বেঙ্গলী, ৬.৪.২৭)

১৯৩০-এর ৮ই জানুয়ারি মতিলাল নেহরু প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন যে, স্বরাজ দলের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেছে। এক প্রকাশিত বিবৃতিতে তিনি বললেনঃ "অন্য কোনো বিশেষ কার্যক্রমের অভাবে স্বরাজ-দল কাউন্সিল-প্রবেশের নিরীক্ষা আরম্ভ করেছিল। সেই নিরীক্ষা পুরো ছ'বছর ধরে চালিয়ে দেখার পর ব্যর্থ হয়ে গেছে। এই গত ছ' বছরে আমাদের গভর্ণমেণ্ট-বিরুদ্ধতা ধীরে ধীরে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। দল যখন প্রথম আইন-সভাগুলিতে ঢুকেছিল, তখন দলের যে শৃংখলা শত্রু-মিত্র উভয়ের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করতো তা এখন অতীতের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলের বেশ কয়েকজনের মধ্যে বিভিন্ন কমিটির সদস্য পদলাভের জন্য এক

লজ্জাহীন হুড়াহুড়িও দেখা গেছে। আমরা প্রথমে অন্যান্য দলকে আমাদের সংগে চালিত করতাম। এখন আমরাই অন্যান্য দলের দ্বারা চালিত হচ্ছি।" (ইংরেজির অনুবাদ, দি বেঙ্গলী ৯,১.৩০)

১৯২৫-এর শেষের দিকেই বীরেন্দ্রনাথ মতিলাল নেহরুকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, দলকে সংগ্রামশীল করতে হলে আগেকার প্রতিশ্রুতি মত দলের সদস্যরা আইন-সভা থেকে বার বার পদত্যাগ করবেন এবং বার বার নির্বাচিত হবেন এবং নির্বাচিত হলেই পদত্যাগ করবেন—এই পথ গ্রহণ করতে হবে, তা না হলে "রুলস্ অব বিজনেসের" দরুণ আইনসভাগুলিকে অচল করে দেবার কোনো পথ নেই, অথচ স্বরাজ্যদল আইনসভাগুলিকে অচল করবে বলেই গঠিত হয়েছিল। তিনি সেই বছর কানপুর স্বরাজ্যদলের কার্যনির্বাহক সভাতেও সেই প্রস্তাবই করেছিলেন। কিন্তু স্বরাজ্যদল তখন বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও জমিদার-গোষ্ঠীর প্রভাবেই চালিত। তাঁরা এই সংগ্রাম-শীল কার্যক্রম দল কর্তৃক গৃহীত হবার পথে প্রধান বাধা ছিলেন। কাউন্সিলে যখন একবার ঢোকা গেছে তখন তা থেকে পদত্যাগ করে পুনর্নির্বাচনে দাঁড়ানো মূর্খামি ছাড়া আর কি হতে পারে? এই ছিল তাঁদের মত। মতিলাল নেহরুও এঁদের প্রভাবে চালিত হতেন। সেইজন্যই স্বরাজ্যদলের সমস্ত কার্যক্রম, মতিলাল নেহরুও স্বীকার করেছেন, জমিদার গোষ্ঠী ও তাদের বশংবদ কিছু লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের সুবিধা করে দিয়েছিল মাত্র, দেশের বিশেষ কোনো উপকার করতে পারেনি।

বিক্ষুব্ধ মুসলিম সমাজ

গান্ধীজী এবং কংগ্রেস নেতারা যে এইভাবে অন্ধের মত জমিদারদের তোষণ করতে লাগলেন, তাতে দেশে যে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো সেদিকে তাঁরা লক্ষ্য রাখলেন না। দেশের জমিদার শ্রেণী সাধারণত ছিলেন হিন্দু। কৃষক ও প্রজাদের মধ্যে, বিশেষ করে বাংলায়, বেশির ভাগই ছিলেন মুসলমান। কংগ্রেস নেতাদের এই অনবরত জমিদার তোষণের ফল-শ্রুতি হিসাবে এই মুসলমান কৃষক ও প্রজারা দেখতে পেলেন যে, তাঁদের উপর জমিদারের অত্যাচারের ও শোষণের চাপ ক্রমশ বেড়ে উঠছে। কংগ্রেস নেতাদের চেহারা মুসলমান চাষী ও প্রজার সামনে জমিদারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে প্রতিভাত হতে লাগলো, যাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু। এই কারণে দরিদ্র মুসলমান কৃষক ও প্রজা ক্রমশঃ কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে ঘোরতর শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠতে লাগলো। ধীরে ধীরে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, তাঁরা মুসলমান বলেই কংগ্রেস নেতারা হিন্দুজমিদারদের সমর্থনে তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। কংগ্রেস ও গান্ধীজী এইভাবে সমগ্র মুসলমান সমাজ থেকে ধীরে ধীরে অনেক দূরে সরে গেলেন। সেইদিনই মুসলমান চাষী-প্রজা ঠিক করলেন যে, তাঁরা কংগ্রেস ও গান্ধীজীর নিকট কোনদিনই সুবিচার পাবেন না। সুবিচারের আশায় তাঁরা তাঁদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের দিকে তাকিয়ে থাকতে আরম্ভ করলেন। এইভাবে গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে বাংলার গ্রামাঞ্চলে, মুসলিম লীগের প্রভাব ক্রমশ বাড়তে লাগলো।

ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বলতে সে সময়ে বেশির ভাগ হিন্দুকেই বোঝাতো। কারণ এদেশে ইংরেজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে হিন্দু বিশেষ করে বাঙালী হিন্দু, ইংরেজি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সকল উপাদানে রপ্ত হয়ে ইংরেজ শাসনের প্রধান স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সাধারণ মুসলমান বহুদিন ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরোধী ছিলেন এবং এইসব উপাদানের সংস্পর্শে আসতে ঘৃণা করতেন। কাজেই ধীরে ধীরে শিক্ষিত হিন্দুরা ইংরেজ শাসনের শুধু প্রধান স্তম্ভই নয়, প্রায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালেন। ইংরেজের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনায় তাঁদের এই যে একচেটিয়া অধিকার দাঁড়িয়ে গেল সেটাকেও শিক্ষিত হিন্দুরা দ্বিতীয় জমি-দারি প্রথার মত দেখতে লাগলেন। অন্যান্যরা বিশেষ করে মুসলমানরা, যাতে তাঁদের এই একচেটিয়া অধিকারে কখনও হস্তক্ষেপ করতে না পারে সে বিষয়ে

প্রথম থেকেই সতর্ক হয়ে উঠলেন। ইংরেজ সরকার পার্মানেণ্ট সেটলমেণ্টের সাহায্যে সমগ্র দেশে যে জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজি শাসন-ব্যবস্থার একটি প্রধান খুঁটি তৈরি করা। দেশে ইংরেজি শাসন-ব্যবস্থার দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় আর একটি স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ালেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, যাঁদের মধ্যে তখন ছিলেন বেশির ভাগ হিন্দু। কাজেই ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়, অন্যদিকে জমিদার শ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যে এক দুর্ভেদ্য জোট তৈরি হয়ে উঠেছিল তাতে সাধারণভাবে হিন্দুর প্রাধান্য হোলো বেশি এবং মুসলমানের সেখানে প্রায় প্রবেশ নিষেধ। এই দুর্ভেদ্য জোট ভেঙে দিয়ে ইংরেজ সরকারের কেউ কেউ যখন মুসলমান-দেরও এই জোটে প্রবেশাধিকার দিতে চাইলেন তখন শিক্ষিত হিন্দুরাই প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালেন এবং সেই অনুপাতে হয়ে দাঁড়ালেন ইংরেজের শত্রু। ইংরেজি শিক্ষার দৌলতে ভারতে যখন জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হোলো তখনও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অর্থাৎ হিন্দুরা ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের জন্য যে শাসন-ব্যবস্থার কাঠামো তৈরি হবে তাতে মুসলমানের যোগ্য প্রবেশাধিকারের সুযোগ দিতে রাজি হলেন না। ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের শাসন-ব্যবস্থার পরিচালনায় শিক্ষিত হিন্দুর যে একচেটিয়া অধিকার ইংরেজ সরকারের আমল থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, তার যেন কোনো প্রকারে অপকার না ঘটে তার জন্য তাঁরা সজাগ থাকলেন। তার কারণ হচ্ছে, আমরা হিন্দুরা ইংরেজি শিখেছি ভালো চাকরি করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারার জন্য, ইংরেজি শিক্ষার আলোকে ইয়োরোপীয় সভ্যতার মহান আদর্শগুলি আমরা শিখতে চাইনি ও শিখিনি। ইংরেজ সমাজের মহৎ আদর্শগুলি আমরা শিখতে চাইনি ও শিখিনি। এমনকি আমরা ইংরেজের পাঠ্যপুস্তক থেকে জাতীয়তা-বাদের যে শিক্ষা নিয়েছিলাম তারও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সমগ্র দেশবাসীর স্বাধীনতা নয়। উদ্দেশ্য ছিল, ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের শাসন-ব্যবস্থার পরিচালনায় পুরাতন একচেটিয়া অধিকারের সংরক্ষণ। আমরা ইংরেজি শিখেছিলাম সভ্যতার মহত্তর আদর্শগুলিকে আত্মস্থ করবার জন্য নয়—আমরা চেয়েছিলাম, চাকরীর বাজারে আমাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখতে। আমরা মানুষ হতে চাইনি, চেয়েছিলাম করণিক হতে। সেই কারণে করণিকসুলভ মনোবৃত্তি আমাদের মনুষ্যত্বকে চিরদিন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সেই কারণে, আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় জাতীয় সামগ্রিক অগ্রগতির পথে একটা প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন প্রায় প্রথম থেকেই। শিক্ষিত হিন্দুর এই করণিকসুলভ মনোবৃত্তি থেকেই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সূত্রপাত। এই জন্যই কৃষ্ণনগরে ১৯২৬-এর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীতে বীরেন্দ্র-নাথ শাসমল বলেছিলেনঃ "এ দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের

কর্তব্যহীনতা হইতেই আরম্ভ করি। তাঁহাদিগকেই আজ আমার সম্মুখে উপস্থিত দেখিতেছি এবং তাঁহাদের হস্তেই বাংলার ভবিষ্যত এক হিসাবে গুরুতররূপে নির্ভর করিতেছে। পৃথিবীর কোনো দেশেই আদর্শ আকাশের বারিবিন্দুর সহিত ভূখণ্ডে নিপতিত হয় না, কিম্বা বৃক্ষে তাহা উৎপাদিত হইয়াছে কেহ দেখে নাই। শিক্ষায় তাহার পরিকল্পনা এবং শিক্ষার উৎকর্ষেই তাহার পরিবর্ধন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এদেশে ইংরাজি শিক্ষা প্রচলনের জন্য যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, বিপ্লবের পর ফরাসি জাতির জয়লাভে তিনি যে গভীর আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতকালে তাঁহার বংশধরগণ ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তাঁহারই মত স্বাধীনতাকামী হইবে। কিন্তু একদিকে তাঁহার সে আশা যেমন ফলবতী হয় নাই অন্যদিকে তেমনি ইংরাজগণ তাহার সম্ভাবনা আশংকা করিয়া যথাসময়ে সাবধান হইয়াছিল। ফলে আজ, শিক্ষিত বাঙালী বলিলে একটি ঘোরতর স্বার্থপর, একান্ত অদূর-দর্শী ও নিতান্ত অকর্মণ্য জীবের কথা মনে পড়ে।.....রাজা রামমোহন রায়ের পর হইতে খৃষ্টাব্দ ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত যে সকল ঘটনা এদেশে ঘটিয়াছে, এখানে তাহার উল্লেখ করিব না। কিন্তু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আজ পর্যন্ত এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এদেশের আদর্শ গঠনের জন্য কি করিয়াছেন? ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দেই বোম্বাই নগরে জাতীয় মহাসভার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, ইংল্যাণ্ডের শাসন প্রণালীর সহিত ভারতীয় শাসন-যন্ত্রের তুলনা করিয়া এদেশের তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার সমন্বয় সংস্থাপনের জন্যই জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর হইতেই ভারতের আইনসভায় ভারতের যে সর্বনাশ সংসাধিত হইয়া আসিতেছে তাহা ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় অবগত থাকিয়াও তাহার প্রতিকারের জন্য তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শকে প্রকাশ্যভাবে পরিবর্তন করিতে এতকাল পর্যন্ত পরাঙ্মুখ রহিয়াছেন। পেনাল কোডে সিডিশনের ধারা ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট, রৌলট এ্যাক্ট, ক্রিমিন্যাল ল' এ্যামেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্ট ও বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি আদর্শ-ধ্বংসকারী প্রায় সকল আইনগুলি আমাদের জাতীয় মহাসভার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বলিতে লজ্জা ও দুঃখ হয় যে, তথাপি যাঁহারা এদেশে শিক্ষায় মৌলিক ও নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানীয়, তাঁহারাও এই ১৯২৬ খৃষ্টাব্দেও আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শকে খর্ব ও পঙ্গু করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর। এই পরাধীন জাতির রাজনীতি চর্চা করিতে যাঁহাদের সম্যক ত্যাগের ক্ষমতা নাই, তাঁহারা কেন যে কিছুদিনের জন্য রাজনীতি চর্চা পরি-ত্যাগ করেন না তাহা তাঁহারাই জানেন। অথবা ইহা কি সত্য নয় যে, তাঁহারা

দেশ ও দশের নামে যাহা কিছু চালাইতেছেন তাহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্য? কথা সত্য হইলে এ জাতির উপর ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হইতে আরো অনেক বিলম্ব আছে।

আদর্শ আমাদের যত বড় সময়ও আমাদের তত বেশি লাগিবে।...ভারতের জনসাধারণের মধ্যে একটা জাগরণের ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু সেই জাগরণ যাহাতে শনৈঃ শনৈঃ ত্যাগশীল ও মৃত্যুঞ্জয়ী হয়, তাহার গুরুভার গ্রহণ করিবে কে? আমাদের জনসাধারণ আমাদিগকে বড় জোর একটি বিনা মূল্যের ভোট প্রদান করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু মাসিক চারি আনা চাঁদা কিম্বা দুই হাজার গজ সুতা কাটিতে তাহাদের অনেকে এখনও প্রস্তুত নহে। জেলে যাইবার কথা শুনিলে এখনও তাহাদের অনেকে ভীত হয়, নিশ্চিত মরণের কথায় তাহাদের প্রায় সকলেই রাজনীতির ত্রিসীমায় আসিতে চাহে না। তাহাদের এই মানসিকতার পরিবর্তন করা স্বভাবতই সময় সাপেক্ষ। এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শত্রুতায় সেজন্য আরও বেশি সময় দিতে হইবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায় রাজনৈতিক আদর্শ সৃষ্টিতে যেমন পশ্চাৎপদ রহিয়াছেন তেমনি সমাজের যে সকল দুর্নীতির জন্য এদেশে রাষ্ট্রীয় আদর্শ দ্রুত পরিস্ফুট হইতেছে না তাহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্যও তাঁহারা কিছুমাত্র চেষ্টিত নন। অধিকন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেই অপচীয়মান দুর্নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। তবে একথা খুব সত্য যে, সমাজের সকল দুর্নীতিকে ডাইরেক্ট এ্যাকসনের দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না। তাহার চেষ্টায় অধিকাংশ স্থলেই বিপরীত ফল ফলে। এদেশ যদি স্বাধীন হইত এবং এদেশে যদি আমাদের নিজেদের কোনো স্বাধীন শাসক থাকিতেন তাঁহার পক্ষে সকল প্রকার সামাজিক দুর্নীতি অপনোদনের জন্য ডাইরেক্ট এ্যাকসন লওয়া সম্ভবপর তো হইতই—অবশ্য কর্তব্যও হইত। সেইজন্যই এই সেদিন স্বাধীন চীনে বহু যুগ যুগান্তরের প্রায় ৪০ কোটি বেণী একদিনে কাটিয়া ফেলা সম্ভবপর হইয়াছে এবং সেইজন্যই আজ স্বাধীন তুরস্কে মুসলমান রমণীর পর্দা অন্তর্হিত। দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা পর-পদদলিত। আমাদের উচ্চ সভ্যতাভিমানী শাসক সম্প্রদায় বিগত ১৭০ বৎসরে আমাদের মধ্যে দুই-একটি দুর্নীতি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাদের উচ্ছেদ সাধনের কাজটি করিয়াছেন যেমন সতীদাহ প্রথা, বঙ্গোপ-সাগরে সন্তান নিক্ষেপ পদ্ধতি এবং এজ অফ কনসেণ্ট প্রভৃতি। কিন্তু আমাদের মধ্যে এখনও বহুবিধ সামাজিক দুর্নীতি বর্তমান রহিয়াছে যাহার সমূল উচ্ছেদ সাধন না করিলে ভারতের স্বরাজ-সাধনা সর্বাঙ্গীন শুভ ফলপ্রদ হইবে না। আমাদের শাসক সম্প্রদায় নিরপেক্ষতার নামে সে সকল বিষয়ে নিশ্চয়ই নিশ্চেষ্ট থাকিবেন। সুতরাং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সেই সকল ব্যাপারে

মুক্তপ্রাণ হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই। এদেশের অশিক্ষিত সম্প্রদায়—পৃথিবীর সকল দেশের অশিক্ষিত সম্প্রদায় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সামাজিক বিষয়ে বড় বেশি রকম অনুকরণ করে। অগ্রগামী হইয়া তাহাদের সম্মুখে প্রকৃত কার্যের উদাহরণ উপস্থাপিত না করিলে তাহারা তাহাদের ভ্রান্ত পথ কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না। কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, তাঁহারা এ সম্বন্ধেও উদাসীন। তাঁহাদিগকে এই পথের পথিক করিতে হইলে, জীবন্ত জাগ্রতভাবে সমাজ-সংস্কারে লাগাইতে হইলে আরও কিছুকাল আমাদিগকে বিলম্ব করিতে হইবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই উদাসীনতার মূল কারণ কোথায়, আবিষ্কার করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা আবশ্যক। সমাজই দেশের রাষ্ট্রীয় সম্পদ সৃষ্টি করে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের সমাজ সৃজন করে। আবার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সেই শক্তি তাঁহাদের শিক্ষা হইতে যেমন উদ্ভব হয় তেমনি তাঁহাদের শিক্ষার আদর্শ তাঁহাদের শাসকগণের দয়ার উপর নির্ভর করে। গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, গত ৪০ বৎসরের রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা এই গোড়ার কথাটাকে পরিষ্কারভাবে কেহই ধরিতে পারি নাই। যদিবা কেহ কেহ ধরিয়াছেন, তাঁহারা হার মানিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং তাঁহাদের আদর্শের বীভৎস ব্যাভিচার দেখিয়া দূর হইতে চক্ষু মর্দন করাই তাঁহাদের এখন সার হইয়াছে। জাতীয় মহাসমিতি কিম্বা প্রাদেশিক সম্মিলনী এদেশের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে কিম্বা বর্তমান শিক্ষার প্রণালী পরিবর্তনের জন্য কোনো দিন সবিশেষ চেষ্টা করেন নাই। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা জাতীয় মহাযজ্ঞের জন্য উঠিয়াছে ও ব্যয়িত হইয়াছে, কিন্তু এদেশের কোমলমতি বালক-বালিকার প্রকৃত শিক্ষার জন্য সে টাকার এক কপর্দকও এদেশের কোথাও সঞ্চিত আছে বলিয়া আমি জানি না। আমরা যে মাটিতে মৃদঙ্গ গড়িব বলিয়া স্থির করিয়াছি, সেই মাটিকে দলিয়া মলিয়া মালমশলা দিয়া যত্নের সহিত প্রস্তুত না করিলে তাহা যে অকালে অসময়ে মহাসংকীর্তনের দিনে ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইবে।" (প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণ থেকে)

আমি আগে বলেছি, আমাদের সমস্ত স্বাধীনতা আন্দোলনটি ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একান্ত নিজস্ব আন্দোলন এবং এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের নিজেদের জন্য ক্ষমতা দখল। দেশের সাধারণ মানুষ বা কৃষক-শ্রমিক খেটে-খাওয়া-মানুষদের থেকে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন যে কতখানি বিচ্ছিন্ন ও ব্যবধানে ছিল তা বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়লে। এর কারণ আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "সামাজিক দাসত্ববন্ধনের চোরাবালির উপরে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ইন্দ্রজালকে" প্রতি-

ষ্ঠিত করতে। শিক্ষিত সম্প্রদায় চেয়েছিলেন তাঁদের নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতা দখল, দেশের অগণিত দরিদ্র পদদলিতের স্বাধীনতা তাঁরা কোনোদিনই কাম্য বলে মনে করেন নি। শিক্ষিত সম্প্রদায় চেয়েছিলেন ইংরেজকে পর্যুদস্ত করে তাদের হাত থেকে শাসন-ক্ষমতাটুকু কেড়ে নিতে। কিন্তু তাঁরা এ সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন যে, যদি ঘটনাচক্রে ইংরেজের নিকট থেকে ক্ষমতালাভ সম্ভব হয় তাহ'লে তার কণামাত্র ভাগটুকুও যেন দেশের সাধারণ মানুষের অর্থাৎ সমাজের নিম্নশ্রেণীর হাতে না পড়ে। তাই ঐ স্বাধীনতা আন্দোলনকে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে এক বিরাট গণ-আন্দোলনে পরিবর্তিত করবার তাঁরা বিরোধী ছিলেন। বঙ্গ-বিভাগ বিরোধী আন্দোলন থেকেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই যে খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গী এর সম্বন্ধেই রবীন্দ্র-নাথ লিখেছেনঃ "এমন স্থলে বঙ্গ-বিভাগের জন্য আমরা ইংরাজ রাজের প্রতি যতই রাগ করি না কেন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতি-বর্জন আমাদের পক্ষে যতই একান্ত আবশ্যক হউক না কেন, তাহার চেয়ে বড়ো আবশ্যক আমাদের পক্ষে কী ছিল? না, রাজকৃত বিভাগের দ্বারা আমাদের মধ্যে যাহাতে বিভাগ না ঘটে নিজের চেষ্টায় তাহারই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা।

সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমরা বয়কট ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে কোনো প্রকারেই হোক বয়কটকে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশী মাত্রায় পড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গ বিভাগের যে পরিণাম আশংকা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম—সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম।

সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমরা বয়কট ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে কোনো প্রকারেই হোক বয়কটকে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশী মাত্রায় পড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গ বিভাগের যে পরিণাম আশংকা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম—সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম।

আমরা ধৈর্য হারাইয়া, সাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুবিধা-অসুবিধা বিচার-মাত্র না করিয়া বিলাতি লবন ও কাপড়ের বহিষ্কার সাধনের কাজে আর কোনো ভালো-মন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না। ক্রমশ লোকের সম্মতিকে জয় করিয়া লইবার বিলম্ব আমরা সহিতে পারিলাম না, ইংরাজকে হাতে হাতে কর্মফল দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

এই উপলক্ষে আমরা দেশের নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম, সেকথা স্বীকার করিতে আমাদের

ভালো লাগে না, কিন্তু কথাটাকে মিথ্যা বলিতে পারি না। তাহার ফল এই হইয়াছে, বাসনার অত্যুগ্রতা দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই দেশের এক দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছি। তাহাদিগকে আমাদের মনের মতো কাপড় পরাইতে কতদূর পারিলাম তাহা জানি না। কিন্তু তাহাদের মন খোয়াইলাম। ইংরাজের শত্রুতা সাধনে কতটুকু কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না, দেশের মধ্যে শত্রুতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমরা-যে সকল মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের অসুবিধা ঘটাইয়া বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছি একথা সত্য নহে। এমনকি যাহারা বয়কটের কল্যাণে বিশেষ লাভবান হইয়াছে তাহারাও যে আমাদের বিরুদ্ধ হইয়াছে এমন প্রমাণও আছে। ইহার কারণ আমরা ইহাদিগকে কাজে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টার পূর্বে এবং সংগে সংগে ইহাদের মন পাই নাই, মন পাইবার প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করি নাই, আমাদের প্রতি ইহাদের অবিশ্বাস ও দূরত্ব দূর করি নাই। আমরা ইহাদিগকে নিজের মতে চালাইবার ও কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু ইহাদিগকে নাড়া দিতে গিয়া ইহাদের সন্দেহকে বিরোধকেই জাগাইয়া তুলিয়াছি। ইহাদের আত্মীয় না করিয়াই ইহাদের আত্মীয়তা দাবি করিয়াছি। এবং যে উৎপাত আপন লোকে কোনোমতে সহ্য করিতে পারে সেই উৎপাতের দ্বারা ইহাদিগকে পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ দূরে ফেলিয়াছি।

এবারে এতকাল পরে আমাদের বক্তারা ইংরাজি সভার উচ্চমঞ্চ ছাড়িয়া দেশের সাধারণ লোকের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেশের লোকের মনে একটা প্রশ্ন উদয় হইল—একী ব্যাপার, হঠাৎ আমাদের জন্য বাবুদের এত মাথাব্যথা হইল কেন?

বস্তুতই তাহাদের জন্য আমাদের মাথাব্যথা পূর্বেও অত্যন্ত বেশি ছিল না, এখনও এক মুহূর্তে অত্যন্ত বেশি হইয়া উঠে নাই। আমরা এই কথা মনে করিয়া তাহাদের কাছে যাই নাই যে, "দেশী কাপড় পরিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে, এইজন্যই আমাদের দিনে আহার নাই এবং রাত্রে নিদ্রার অবকাশ ঘটিতেছে না।" আমরা এই বলিয়াই গিয়াছিলাম যে, ইংরাজদের জব্দ করিতে চাই কিন্তু তোমরা আমাদের সংগে যোগ না দিলে বয়কট সম্পূর্ণ হইবে না, ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তোমাদের দেশী কাপড় পরিতে হইবে।

কখনও যাহাদের মঙ্গল চিন্তা ও মঙ্গল চেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনও কাছে টানি নাই, যাহাদিগকে বারবার অশ্রদ্ধাই করিয়াছি, ক্ষতি স্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সংগে সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না।

সাড়া যখন না পাই তখন রাগ হয়। মনে এই হয় যে, কোনোদিন যাহা-দিগকে গ্রাহ্য মাত্র করি নাই আজ তাহাদিগকে এত আদর করিয়াও বশ করিতে

পারিলাম না, উল্টা উহাদের গুমর বাড়িয়া যাইতেছে। ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান ও নিম্ন সম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। একথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে, আমরা মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোনো প্রমাণ কোনোদিন দিই নাই। অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষীতায় সন্দেহবোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতি স্বীকার করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ভাই বলিয়া একজন খামোকা আসিয়া দাঁড়াইলেই যে অমনি তখনই কেহ ঘরের অংশ ছাড়িয়া দেয় এমনতরো ঘটে না। আমরা যে সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোকে জানে না এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত জাগরূক, আমাদের ব্যবহারে এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

আমাদের দুর্ভাগ্যই এই, আমরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার মতো ধৈর্য আমাদের নাই, আমরা ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে দ্রুতবেগে পদানত করিবার চেষ্টা করি। আমরা মনে করি, আমাদের মতে সকলকে চালানোই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয়ঃ, অতএব সকলে যদি সত্যকে বুঝিয়া সে পথে চলে তবে ভালোই, যদি না চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও চালাইতে হইবে।—অথবা চালনার সকলের চেয়ে সহজ উপায় আছে, জবরদস্তি।

জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আগুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া যদি আমরা বিলাতি কাপড় ছাড়াইয়া একদল লোককে দেশী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশী কাপড় পরাইয়া ইহাদের সমস্ত অন্তঃকরণকে কি স্বদেশীর বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিদ্রোহী করিয়া তুলি না? দেশের যে সম্প্রদায়ের লোক স্বদেশী প্রচারের ব্রত লইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি এই সকল লোকের বিদ্বেষকে চিরস্থায়ী করা হয় না?

এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না? যাহারা কখনও বিপদে-আপদে সুখে-দুঃখে আমাদিগকে স্নেহ করে নাই, আমাদিগকে যাহারা সামাজিক ব্যবহারে পশুর অধিক ঘৃণা করে—তাহারা আজ কাপড় পরানো বা অন্য কোনো উপলক্ষ্যে আমাদের প্রতি জবরদস্তি প্রকাশ করিবে, ইহা আমরা সহ্য করিব না—দেশের নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ও নমঃশূদ্রের মধ্যে এইরূপ অসহিষ্ণুতা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারা জোর করিয়া, এমন কি ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিলাতী সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে।" ('সদুপায়'—সমূহ)

সেই ১৯০৫ থেকেই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনটি শিক্ষিত সম্প্রদায়

পুরোপুরি নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছিলেন ও দেশের নিম্ন-শ্রেণীর সাধারণ মানুষের এর প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না এবং সেই কারণেই বহুস্থানে বলপ্রয়োগে সাধারণ শ্রেণীর মানুষকে এই আন্দোলনের পক্ষ নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। দেশের সাধারণ শ্রেণীর মানুষের প্রতি এই যে বলপ্রয়োগের প্রয়াস এতেই বোঝা যায় যে, শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজকে তাড়িয়ে তার জায়গাটি দখল করতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু দেশের নিম্ন-শ্রেণীর মানুষের জন্য কোনো মঙ্গল চিন্তা তাঁদের কখনও ছিল না। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের পেছনেও আগাগোড়া এই ভদ্রলোক-সুলভ এবং নিম্নশ্রেণী-বিরোধী মনোবৃত্তি কাজ করে এসেছে। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মনেও দেশের নিম্নশ্রেণীর কৃষক-শ্রমিক খেটে-খাওয়া মানুষের সম্বন্ধে কোনো মঙ্গল-চিন্তার আভাষ ছিল না। তদুপরি, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ছিলেন ঘোরতর মুসলমান-বিরোধী। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফফর আহ্‌মেদ তাঁর লেখা "কমিউনিস্ট পার্টি এবং আমার জীবন" বইতে লিখেছেন, বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী দল অনুশীলন লিখিত ঘোষণা পত্রে সমিতির একটি উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের পদানত করে রাখা এবং প্রত্যেক সন্ত্রাস-বাদী দলের শর্ত ছিল—অহিন্দুদের প্রবেশ নিষেধ। সেই কারণে, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রায় প্রথমযুগ থেকেই মুসলমান, বিশেষ করে বাঙালী মুসলমান, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম কতটা ইংরেজ তাড়াবার জন্য আর কতটা মুসলমানকে পদানত করে রাখবার জন্য সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করতেন এবং তাঁরা সাধারণভাবে, এই কারণে, স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে দূরেই সরে রইলেন। আমরা মুসলমানদের দোষ দিই যে, তাঁরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আমলে দেশের সামাজিক জীবন-স্রোত থেকে অনেকটা দূরে ছিলেন। কিন্তু কেন ছিলেন, তার জন্য কোনো অনুসন্ধিৎসা আমাদের কখনও ছিল না। যদি আমরা এ বিষয়ে অন্বেষণ করতাম তাহলে দেখতে পেতাম, দেশের জন-সাধারণের সত্যকার স্বাধীনতার বদলে স্বাধীনতা সংগ্রামের হোতারা ক্ষমতা-দখলের দিকে ঝোঁক দিয়েছিলেন বেশি এবং ক্ষমতা-দখলের এই লড়াইতে মুসলমান বাদ পড়ে যাবেন কারণ তাঁরা সংখ্যাল্প। সেই হেতু তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ক্ষমতা-দখলের এই লড়াই কোনোদিন তাঁদের সত্যকার মঙ্গল করতে পারবে না।

এই সময়ে বাংলার বিপ্লববাদীরা এবং কংগ্রেস নেতারা আরও দুটি হঠকারিতার কাজ করলেন যার ফলে শুধু বাংলা নয় সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেসকে শত্রু মনে করতে লাগলেন।

আমরা মুজফ্‌ফর আহমেদের লেখায় দেখেছি, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা 'কংগ্রেস কর্মী সংঘ' নাম দিয়ে নিজেদের একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন।

এই কংগ্রেস কর্মী সংঘই চিত্তরঞ্জনের হিন্দু-মুসলিম চুক্তিকে ধ্বংস করতে না পেরে কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের উপর অনাস্থা প্রস্তাব আনেন এবং শেষ পর্যন্ত সম্মেলনটি ভেঙে দেন। কিন্তু তার পরে তাঁরা সক্রিয়ভাবে হিন্দু-মুসলিম চুক্তির বিরোধিতা করে আন্দোলন শুরু করলেন। হিন্দু-মুসলিম চুক্তির একটা শর্ত ছিল, মসজিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করা চলবে না। এই শর্তটি অকেজো করে দেবার উদ্দেশ্যে বরিশালের নেতা সতীন সেন পটুয়াখালিতে এক 'সত্যাগ্রহ' আরম্ভ করলেন, যাতে প্রতিদিন 'সত্যাগ্রহীরা' মসজিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে যেতেন এবং এই বে-আইনী কাজ করে গ্রেপ্তার বরণ করতেন। সতীন সেন বরিশাল জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন।

কংগ্রেস কর্মী সংঘ একটি 'পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ কমিটি' গঠন করলেন এবং সারা ভারত থেকে স্বেচ্ছাসেবক 'সত্যাগ্রহী'রা রোজ এসে পটুয়াখালিতে 'সত্যাগ্রহে' যোগ দিতেন এই 'সত্যাগ্রহ' সমগ্র হিন্দু সমাজে এমন সাড়া জাগিয়েছিল যে, 'বিপ্লবী বীর' রাসবিহারী বসু টোকিও থেকে হিন্দুদের দান হিসাবে ৪০০ টাকা চাঁদা সত্যাগ্রহ কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেন। পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ কমিটির সম্পাদক অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছাপানো ইস্তাহারে ঘোষণা করেছিলেন যে, বাংলার গ্রামে গ্রামে মুসলমান গুণ্ডারা যে হিন্দু নারী ধর্ষণ ও হিন্দু মন্দির অপবিত্র করছে, তারই প্রতিবাদে তাঁরা পটুয়াখালিতে মসজিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে সত্যাগ্রহ করছেন।

কিন্তু পটুয়াখালি 'সত্যাগ্রহে'র প্রত্যক্ষ ফল এই হোলো যে, পল্লী-গ্রামের বিশেষ করে, পূর্ববঙ্গের সাধারণ অশিক্ষিত মুসলমান দারুণভাবে ক্ষেপে গেলেন। এই ক্ষোভের ঢেউ সারা ভারতের মুসলমানের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। তাঁরা মনে করলেন, কংগ্রেস কর্মীরা এইভাবে তাঁদের ধর্মীয় ব্যাপারে অন্যায় হস্তক্ষেপ করছেন।

সতীনবাবু সংগ্রামী লোক ছিলেন এবং বহুবার কারাবরণ করেছেন, কিন্তু তাঁর এই পটুয়াখালি 'সত্যাগ্রহ' খুবই হঠকারিতার কাজ হয়েছিল। সারা পূর্ববাংলায় এর ফলে সাম্প্রদায়িকতার আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এই সাম্প্রদায়িকতার অনলে রুষ্ট মুসলমানেরা এক হিন্দু শোভাযাত্রায় বাধা দেবার চেষ্টা করতে পারে, এই আশঙ্কায় বরিশালের কুলকাঠি অঞ্চলের পোনাবালিয়ায় ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ব্র্যান্ডির আদেশে ২১ জন নিরস্ত্র দরিদ্র মুসলমান কৃষককে গুলি করে মারা হয়। দেশের সমস্ত মুসলমান সমাজ এতে গভীরভাবে মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। মুসলমান নেতা স্যার আবদুর রহিম বলেছিলেনঃ 'পোনাবালিয়ার গুলি বর্ষণ দ্বিতীয় জালিয়ানওয়ালাবাগ হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত থাকবে।'

মুসলমানরা আরও ক্ষুব্ধ হলেন যখন সত্যাগ্রহের জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী পটুয়াখালিতে সত্যাগ্রহের এই প্রহসন দেখেও মৌনব্রত অবলম্বন করে মৌনীবাবা সেজে গেলেন। সারা ভারতের কোনো কংগ্রেস নেতা সত্যাগ্রহের নামে এই প্রহসনের কোনো নিন্দা করলেন না এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা যে, পোনাবালিয়ায় পুলিশের গুলিবর্ষণে নিরস্ত্র মুসলমান হত্যার নিন্দা কোনো কংগ্রেস নেতার মুখ থেকে শোনা গেল না। এমন কি, ১৯২৭-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর মাজু অধিবেশনে (অন্যান্য কারণের সঙ্গে) বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের প্রেরণায় উত্থাপিত পোনাবালিয়ায় গুলিবর্ষণের ও পটুয়াখালি সত্যাগ্রহের নিন্দা প্রস্তাব থেকে নিজেদের পৃথক রাখবার জন্যে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর মাজু অধিবেশন বর্জন করেছিলেন।

অন্য ব্যাপারটি যা মুসলমানদের প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ করেছিল সেটি হচ্ছে, ১৯২৮-এর বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধন আইন। এ সম্বন্ধে আমি আগে লিখেছি।

প্রসঙ্গতঃ, এই চাষী-বর্গাদার বিরোধী আইনটি সমর্থন করে পাশ করিয়ে দেবার জন্য বাংলার কংগ্রেস দলকে জমিদাররা চাঁদা হিসাবে যে ঘুষ দিয়েছিলেন, সেই নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে কংগ্রেস কাউন্সিল পার্টির নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের প্রবল মনান্তর সুরু হয়। পূর্ব বাংলার জমিদার-গোষ্ঠী যতীন্দ্রমোহনের হাতে তাদের দেয় 'চাঁদা' দিয়েছিলেন, আর পশ্চিম বাংলার জমিদার গোষ্ঠী দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রের হাতে। সুভাষচন্দ্র দাবি করলেন, গোটা টাকাটাই প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাপ্য আর যতীন্দ্রমোহন দাবি করলেন, গোটা টাকাটাই কংগ্রেস কাউন্সিল পার্টির প্রাপ্য। উভয়ের মধ্যে কেউই নিজের দাবি ছাড়লেন না এবং মনান্তর শেষকালে প্রচণ্ড শত্রুতায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাংলায় ও পাঞ্জাবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও এই দুই প্রদেশের কংগ্রেস নেতারা বার বার ভ্রান্ত-নীতি অবলম্বন করে মুসলমানদের কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ ও বিরক্ত করে তুলেছিলেন। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, ১৯৩০-এ গান্ধীজীর লবন সত্যাগ্রহের সময়ে ভারতের অদ্বিতীয় সংগ্রামী নেতা মৌলানা মহম্মদ আলি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেনঃ 'মহাত্মা গান্ধী এবং মতিলাল নেহরু হিন্দু মহাসভার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন! আমি আমার ক্ষমতায় যতটুকু শক্তি আছে তার সমস্ত দিয়ে আপনার সরকারকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।' (স্পীচেস এন্ড রাইটিংস অফ মহম্মদ আলি—ইংরেজির অনুবাদ)

১৯৩০-৩২-এ আইন অমান্য আন্দোলনকে সাধারণ মুসলমান একেবারেই

সমর্থন বা সাহায্য করেন নি। ১৯৩০-এ লবন সত্যাগ্রহে গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদে কলকাতা কর্পোরেশনে নিন্দা প্রস্তাবের উপর বক্তৃতার সময়ে ফজলুল হক বলেছিলেন: 'ভারতের সাত কোটি মুসলমানের মধ্যে ৭০ জনও কংগ্রেসের সমর্থক নয়। মিঃ গান্ধী যে-রকম গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছেন তাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে রাখার জন্য আমি ভারত সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলায় ও পাঞ্জাবে কংগ্রেস মুসলমান-দের ভোট একদম পায় নি। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট দল মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। বাংলায় কৃষক-প্রজা দল ও মুসলিম লীগ ভাগাভাগি করে মুসলমান ভোট পেলেন। কৃষক-প্রজা দলের নেতা ফজলুল হক কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা করতে চাইলেন। গান্ধীজী তাতে সম্মতি দিলেন না। তখন বাংলার কৃষক-প্রজা ও মুসলিম লীগ দল মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। পরের বার মুসলিম লীগের সঙ্গে কৃষক-প্রজা দলের বিবাদ হোলো। ফজলুল হক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। কিন্তু তা বেশি দিন চলে নি। ফজলুল হককে পদত্যাগ করতে হয়। তাঁর মতে, তখনকার গভর্ণর স্যার জন হারবাট জোর করে তাঁর পদত্যাগপত্র আদায় করেছিলেন। পরে মুসলিম লীগের খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৪৬-এ ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন।

ওদিকে ১৯৩৯ সালেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলো। সুভাষ-চন্দ্র দেশত্যাগ করে প্রথমে জার্মানি ও পরে জাপানে গিয়ে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে জাপানের সঙ্গে যোগ দিলেন। জাপানে সুভাষচন্দ্র নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁদের সাহায্য করতে রাজি করালেন বটে, কিন্তু জাপানের হয়ে অন্য যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করবার জন্য সুভাষচন্দ্র তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের এক ডিভিসন সৈন্য জাপানী যুদ্ধ নেতাদের হাতে তুলে দিলেন। উইনস্টন চার্চিল তাঁর 'হিস্টরী অফ দি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার'—বইয়ের ষষ্ঠ খণ্ডের ৪৬৫ পৃষ্ঠায় এর উল্লেখ করেছেন। বেসিল কলিয়ার তাঁর 'ওয়ার ইন দি ফার ইষ্ট' বইতেও একথা লিখেছেন।

সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-নীতির অধ্যাপক টি. এইচ. সিলকক ও উংকু আব্দুল আজিজ এক প্রবন্ধে লিখেছেনঃ "এটাতে গুরুত্ব দেওয়া খুব প্রয়োজনীয় যে, যদিও জাপানীরা ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনকে তাদের প্যান-এশিয়া আন্দোলনের আর একটি ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, ভারতীয়রা কিন্তু তাতে গভীরভাবে এবং খানিকটা সফলতার সঙ্গে বাধা দিয়েছিল। এ বিষয়ে অল্পই

সন্দেহ থাকতে পারে যে, ভারতীয় নেতারা ভাবতেন তাঁরা জাপানীদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছেন আবার জাপানীরাও ভাবতেন, তাঁরা ভারতীয়দের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছেন।

ভারতীয় জনমতকে খানিকটা তুষ্ট করে এবং তাঁদের কিছুটা সত্যকার স্বাধীন কর্মের অধিকার দিয়ে জাপানীরা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিকে আবার পুনর্জীবিত করে তোলে এবং ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। কর্নেল ভোঁসলে এবং কর্নেলদের একটি কাউন্সিলের অধীনে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি পুনর্গঠিত হয়। অসামরিক সংগঠনটি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বল লাভ করলো। অবশেষে ১৯৪৩-এর অক্টোবরে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হোলো।

অনেক বছর ধরে এ বিষয় নিশ্চয় মতদ্বৈধ থাকবে যে, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির আর্থিক সঙ্গতি জাপানী পুলিশ-রাষ্ট্রের সহায়তায় কতখানি জুলুম করে আদায় করা হোতো এবং 'কেম্পাইতাই'-এর (জাপানী মিলিটারী পুলিশ—লেখক) সহায়তায় কতখানি জবরদস্তি করে তার সৈন্য সংগ্রহ করা হোতো—জাপানী প্রচারের অর্থ গ্রহণে অভিজ্ঞ কারও পক্ষে 'সিওনান টাইমস' নামক সিঙ্গাপুরের সংবাদপত্রটির পুরানো পাতাগুলি উল্টে দেখলে এটা না বোঝা অসম্ভব যে, অধিকতর ধনশালী ভারতীয়ের উপর প্রচুর জবরদস্তির ব্যবস্থা ছিল। ভারতীয়ের জন্য কোনো নিয়মিত সহকারী কর ধার্যের ব্যবস্থা ছিল না। শুধু ছিল ধনশালী সম্প্রদায়ের নিকট থেকে জোর করে যতটা অর্থ আদায় করা যায় তার একটা অনিয়মিত সংগ্রহ ব্যবস্থা। তাছাড়া অনেক সময়ে ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের সদস্য হতে চাওয়া হোতো, কারণ এতে 'কেম্পতাই'-এর হাত থেকে খানিকটা রক্ষা পাওয়া যেতো। এবং আর্মির মধ্যে এটা খোলাখুলি স্বীকৃত হয়েছিল যে, সাধারণ সেনানীদের অনেকেই প্রধানত খাদ্য-রেশনের সুবিধা পাবার জন্যই আর্মিতে যোগ দিয়েছে...

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি পরাজিত হোলো। এবং নেতাজী নিহত হলেন। এর হাজার হাজার লোকও সেই সঙ্গে হত হলেন। ১৯৪৫-এর জুলাই মাসে সিঙ্গাপুর এসপ্ল্যানেডে তাঁদের জন্য যে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়েছিল, অন্য ভারতীয় সৈন্য দল যাঁরা দু' মাসের মধ্যেই সেখানে অবতরণ করলেন, তাঁরাই তা ধ্বংস করে ফেললেন। মালয়ের বেশিরভাগ অধিবাসীর কাছে জাপানী দখলের দিনগুলি অতীতের এক দুঃস্বপ্নের মত এবং যাঁরা জাপানী-দের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁদের জন্য ভালোবাসার ভাব কারুরই নেই। এমনকি, মূর্তিস্তম্ভের জায়গাটিতে আগে যেরকম নিয়মিত ফুল দেওয়া হোতো তাও আর দেওয়া হোতো না।"...(এশিয়ান ন্যাশনালিজম এণ্ড

দি ওয়েস্ট—ইনস্টিটিউট অফ প্যাসিফিক রিলেশানস্ কর্তৃক প্রকাশিত, (পৃঃ ২৯৬-৭—ইংরেজির অনুবাদ) এই অধ্যাপকের লেখা যদি সত্য হয়, তাহলে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর দখলকারী ভারতীয় সৈন্যদলের হাতেই নিহত হয়েছিলেন এবং মাউণ্টব্যাটেন সাহেব সব কথা জানতেন।

ভারতে জাপানী আক্রমণের একেবারে সন্ধিক্ষণে উইনস্টন চার্চিল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সকে ভারতে পাঠালেন এই প্রস্তাব দিয়ে যে, ভারতীয় নেতারা যদি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করেন, তাহলে যুদ্ধ শেষ হলেই ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়া হবে। গান্ধীজী সরাসরি এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে দিয়ে বললেনঃ 'এটি একটি ডুবন্ত ব্যাংকের উপর ভবিষ্যতে ভাঙ্গানো যোগ্য চেক।' জিন্না ও মুসলিম লীগও প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন না, কারণ কংগ্রেস গ্রহণ না করায় একা মুসলিম লীগ গ্রহণ করলে কিছু লাভ হোতো না। প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত হোলো।

তারপর এল ১৯৪২ সাল। গান্ধীজী ইংরেজের বিরুদ্ধে দাবি তুললেন 'ভারত ছাড়'। ৮ই আগস্ট বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মিটিং-এ প্রস্তাব পাশ হোলো—ইংরেজকে ভারত ছাড়তে হবে। ৯ই আগস্ট প্রত্যুষে ভারত সরকার সারা ভারতের সকল কংগ্রেস নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করলেন। তখনকার বাংলার গভর্ণর স্যার জন আর্থার হার্বার্ট বড়লাট লর্ড লিনলিথগো-কে এক গোপন চিঠিতে লিখেছিলেন যে, তাঁর লোকেদের সঙ্গে কথা বলে ডাঃ বিধান রায় ও কিরণশংকর রায় জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা 'ভারত ছাড়' আন্দোলন সমর্থন করেন না। চিঠিটি ইংরেজ সরকার প্রকাশিত 'ট্রান্সফার অফ পাওয়ার' বইটির দ্বিতীয় খণ্ডে আছে। তাই সারা ভারতের সকল নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বটে, কিন্তু এই দুজন লোক গ্রেপ্তার হন নি। জিন্না ও মুসলিম লীগ 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন এই বলে যে, ইংরেজ ভারত ছাড়লে হিন্দুপ্রধান কংগ্রেসের হাতে শাসন-ক্ষমতা চলে যাবে।

নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে দেশময় আন্দোলন শুরু হোলো। বহু জায়গায় হিংসাত্মক কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হোলো। আহমেদনগর বন্দীশালা থেকে ১৯৪৩-এর ১৩ই ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ বড়লাট লর্ড লিনলিথগোকে এক চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, দেশময় হিংসাত্মক কার্যাবলীর সঙ্গে কংগ্রেসের কোনো যোগসূত্র নেই—নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ওসব ছিল দেশবাসীর ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ। তিনি লিখেছিলেনঃ "প্রিয় লর্ড লিনলিথগো—আপনার ১৩ই জানুয়ারির চিঠিতে আপনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, 'হিংসা ও অপরাধে'র কোনো নিন্দা-বাক্য ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পাওয়া যায় নি।...সাধারণতঃ বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমাদের

যতক্ষণ বন্দীদশায় রাখা হচ্ছে ততক্ষণ আমরা কোনো কথা বলতে অনিচ্ছুক। ...সেই জন্য আমরা কোনো ব্যাপারেই মত প্রকাশ করিনি এবং আপনার সঙ্গে বা ভারত সরকারের কোনো পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে পত্রালাপও করিনি, যদিও মাঝে মাঝে আমাদের বিরুদ্ধে এবং আমরা যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করবার গৌরব রাখি তার বিরুদ্ধে চরমতম আজগুবি সব অভিযোগ করা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীকে লেখা আপনার সাম্প্রতিক চিঠিগুলির মধ্যে সেই-সব অভিযোগগুলি আরও পরিষ্কারভাবে এবং গুরুত্বের সঙ্গে করা হয়েছে। এই চিঠিগুলির ভাব এবং বক্তব্য, বিশেষ করে আপনার ৫ই ফেব্রুয়ারির চিঠিটি এমন যে বোধহয় এ বিষয়ে আপনাকে লিখলে কোনো কাজেই আসবে না। তবুও আমরা একথা অবহেলা করতে পারি না যে, বর্তমান ভারত সরকারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি এই সকল অভিযোগ করেছেন। সেই হেতু, আমি আপনাকে এই চিঠি লেখার সুযোগ নিচ্ছি। আমি নিজেকে বিশেষ করে শুধু একটি মাত্র প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই এবং ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগত ক্ষমতায় আমরা যতদূর জড়িত তাতে আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এইটা পরিষ্কার করে দিতে চাই, আপনার অভিযোগ যে কংগ্রেস একটি হিংসামূলক গুপ্ত আন্দোলনের প্রস্তুতি করেছিল, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। এই ৫ই ফেব্রুয়ারির চিঠিতে আপনি আরও বলেছেন—আপনার 'পর্যাপ্ত খবর' আছে যে, ধ্বংসমূলক কাজের প্রচারণা করা হয়েছিল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নামে পরিবেশিত গোপন নির্দেশের মাধ্যমে। আপনার সংবাদ ঠিক কি বেঠিক তা আমরা জানি না, কিন্তু এটা জানি এবং সম্যক অধিকারের সঙ্গেই বলতে পারি যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কখনও কোনো সময়ে এই ধরনের আন্দোলনের কথা কল্পনাও করেনি এবং কখনও এই ধরনের গোপন বা অন্য ধরনের নির্দেশাবলী জারি করেনি। আমাদের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে বে-আইনি প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করা হয় এবং কার্যত প্রায় সকল প্রধান ও দায়িত্বশীল কংগ্রেস সদস্যকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সকল সদস্য সমেত গ্রেপ্তার করা হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অফিস ও অন্যান্য কংগ্রেস অফিস দখল করে নেওয়া হয়। স্পষ্টতই তাহলে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পক্ষে সেইক্ষণ থেকেই কোনো প্রকারের কাজ করা অসম্ভব ছিলো।

আপনি বলছেন, একটি লুক্কায়িত কংগ্রেস সংগঠন এখনও বিদ্যমান আছে এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একজন সভ্যের পত্নী এর সদস্য। আমরা এই ধরনের কোনো সংগঠন সম্বন্ধে কিছুই জানি না এবং এসম্বন্ধে খোঁজ নেওয়াও আমাদের এই অবস্থায় সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত যে, কোনো কংগ্রেস সদস্য বা কংগ্রেস সদস্যা 'বোমাবাজির পরিকল্পনা বা অন্যান্য

সন্ত্রাসমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত' থাকতে পারেন না। কংগ্রেস সেবকেরা, নিঃসন্দেহে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের ক্ষমতা অনুসারে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করা তাদের কর্তব্য বলে মনে করে। কিন্তু তার সঙ্গে আপনি যেসব অভিযোগ করেছেন তার কোনো মিল নেই। এটা হতে পারে যে, সাধারণ সরকারী বা পুলিশ কর্মচারীর মনে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সঙ্গে বোমাবাজি ইত্যাদির বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু আমাদের মনে তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে, আমরা আমাদের দেশের লোককে যতটা জানি তাতে কোনো দায়িত্বশীল কংগ্রেস সেবক কোনো প্রকারেই বোমাবাজী এবং সন্ত্রাসমূলক কার্যাবলীর উৎসাহ দিতে পারেন না।' (এই চিঠিটিও আছে 'ট্রান্সফার অফ পাওয়ার' বইটির তৃতীয় খণ্ডে—ইংরেজি থেকে অনুবাদ)

গান্ধীজীর ও মৌলানা আজাদের বক্তব্য অনুসারে বড়লাটকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, ৯ আগষ্টের পর দেশে যে সকল হিংসামূলক কাজ হয়েছে তার সঙ্গে কংগ্রেসের কোনো সম্পর্ক ছিল না—ওসব ছিল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ।

আজাদী ও ভারত-বিভাগের জল্পনা

কয়েকদিনের গণ-বিক্ষোভ প্রবল পুলিশী গুলিবর্ষণে থেমে গেল। ইংরেজরা খুব হতাশাময় দুঃসময়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে ইয়োরোপ এবং এশিয়ায় দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে ধীরে ধীরে জয়ের পথে এগোতে লাগলেন। ইয়োরোপে রাশিয়া এবং এশিয়ায় আমেরিকা ইংরেজের প্রধান সহায় হয়ে উঠলো। এই সময়ে ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হলেন ভারতের ভূতপূর্ব ব্রিটিশ সর্বাধিনায়ক স্যার আর্চিবল্ড ওয়েভেল। বড়লাট নিযুক্ত হয়েই ইনি হলেন লর্ড ওয়েভেল।

লর্ড ওয়েভেল সম্বন্ধে ভারতবাসীর ধারণা খুব ভ্রান্ত এবং সাধারণভাবে এঁকে ভারতবাসীর স্বাধীনতার বিরোধী হিসাবে চিত্রিত করা হয়ে থাকে। আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, যে কজন ইংরেজ রাজপুরুষ ভারতের স্বাধীনতার জন্য সত্য সত্য লড়াই করেছিলেন, ওয়েভেল তাঁদের মধ্যে একজন। ভারত ও ইংলণ্ডের ইতিহাসে যা অভূতপূর্ব তিনি তাই করেছিলেন—স্বয়ং উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গে তর্ক করে তিনি বলেছিলেন যে, ইংরেজরা আর ভারতবর্ষ রাখতে পারবে না। অতএব যত তাড়াতাড়ি ইংরেজ ভারত ত্যাগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। ওয়েভেল সাহেবের প্রধান দোষ ছিল, তিনি সত্য কথা বলতে কাউকে ভয় পেতেন না, তা সে উইনস্টন চার্চিলই হোন বা মহাত্মা গান্ধীই হোন। ওয়েভেলকে বড়লাট নিযুক্ত করে চার্চিলকে পস্তাতে হয়েছিল কারণ তিনি ভাবেন নি যে, তাঁর নিযুক্ত প্রতিনিধিই তাঁর সামনে একদিন ভারতের স্বাধীনতার দাবি তুলে ধরবেন। আবার প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই গান্ধীজী ও জওহরলাল নেহরু তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে যান এবং পিছন থেকে কলকাঠি নেড়ে অবশেষে তাঁকে অপসারণের ব্যবস্থা করেন। কংগ্রেস নেতারা যদি ওয়েভেলকে তাড়াতাড়ি অপসারণের জন্য কলকাঠি না নাড়তেন এবং তিনি যদি বড়লাট পদ হতে অপসারিত না হতেন তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওয়েভেল কখনই ভারত-বিভাগ হতে দিতেন না। এমনকি, ওয়েভেলের জায়গায় মাউণ্টব্যাটেন যদি ভারতের বড়লাট না হতেন, তাহলেও হয়ত ভারত-বিভাগ এড়ানো যেত। ওয়েভেলের অপসারণ এবং মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগ ভারত-বিভাগের প্রথম সোপান এবং দুঃখের সঙ্গে হলেও বলতেই হবে যে, এর জন্য মূলত দায়ী হচ্ছেন স্বয়ং গান্ধীজী ও জওহরলাল নেহরু।

ওয়েভেল বড়লাট হয়ে নয়াদিল্লী আসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার দুর্ভিক্ষ-

পীড়িত লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্দশার কথা জানতে পেরে কলকাতা ছুটে যান ও মেদিনীপুর পরিদর্শন করেন। মিলিটারির হাতে সমস্ত দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের সেবার ভার তুলে দিয়ে তিনি দুর্ভিক্ষ-মোচনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

১৯৪৪-এর ৯ই ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের কাছে এক ঐতিহাসিক তারবার্তায় তিনি বলেছিলেনঃ 'বাংলার দুর্ভিক্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীন জনগণের মধ্যে বৃহত্তম বিপর্যয়গুলির অন্যতম এবং এই দুর্ভিক্ষ ভারতীয়দের কাছে এবং ভারতবাসী বিদেশীদের কাছে ব্রিটিশ সুনামের অপরিমেয় ক্ষতি করেছে। দেশে এবং বিদেশে এর ফলাফল বিচার করবার ক্ষমতা আপনি বেশি রাখেন। আমরা যে (খাদ্য) সাহায্য চেয়েছি তা না নিলেও আমাদের চলতে পারে, স্বীকৃতভাবে ভ্রান্ত সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে মহামান্য সম্রাটের সরকারের এটা প্রমাণ করবার চেষ্টা এখানে ভারতীয় ও ব্রিটিশ জনমত একেবারেই অসমর্থনীয় মনে করে। দয়া করে আপনার সহ-কর্মীদের আর একবার সতর্ক করে দেবেন যে, সংখ্যাতত্ত্বের বাঁধাবুলির বিচার এখানে একেবারেই নিষ্ফল এবং এবিষয়ে আমার অভিমত সকল গভর্ণরের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনা ও এগারটির মধ্যে সাতটি প্রদেশ ভ্রমণের ভিত্তিতে রচিত।

আমি মহামান্য সম্রাটের সরকারকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, তাঁরা যদি আমাদের (খাদ্যের) দাবি নাকচ করে দেন তাহলে তাঁরা বাংলার দুর্ভিক্ষের চেয়েও প্রভূত পরিমাণে বৃহৎ আর এক বিপর্যয়ের ঝুঁকি নেবেন। যাঁকে তাঁরা ভারতের সমস্যাবলী সম্বন্ধে তাঁদের উপদেশ দিতে নিযুক্ত করেছেন, হয় তাঁর অভিমতের উপর আস্থা স্থাপন করবেন, না হলে তাঁকে বদলি করে দেবেন।" (ইংরেজির অনুবাদ)

উইনস্টন চার্চিল প্রথমে ভারতে খাদ্য পাঠাবার প্রশ্নটি বিবেচনাই করতে চান নি। কারণ খাদ্য পাঠাতে হলে জাহাজ চাই এবং ভারতের খাদ্যের জন্য জাহাজ ছেড়ে দিলে সেনা চলাচলে বাধা পড়বে, তাতে যুদ্ধের ফলাফল খারাপ হতে পারে। কিন্তু ওয়েভেল উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট বাংলাকে এক বৃহত্তর দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার প্রায় ১০০০০০০ টন খাদ্যশস্য ভারতে পাঠাতে বাধ্য হয়। বাংলায় ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যে আবার দুর্ভিক্ষ হয়নি তার কৃতিত্ব ওয়েভেলের।

১৯৪৪-এর ২৪শে অক্টোবর ওয়েভেল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলকে তাঁর ঐতিহাসিক চিঠিটি লেখেনঃ "এক বছরের ওপর বর্তমান পদে কাজ করে আমি অনুভব করছি যে, মহামান্য সম্রাটের সরকার ভারতের জরুরী সমস্যাগুলিকে অবহেলা, এমনকি, সময়ে সময়ে হীনতার চোখে দেখেন। সমস্যাগুলির জটিলতা আমি সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করি এবং ইয়োরোপের

যুদ্ধের গুরুতর প্রয়োজনীয়তার কথাও জানি। আমি মোটামুটিভাবে আপনার এই তত্ত্ব মেনে নিচ্ছি যে, ভারতীয় পারিপার্শ্বিকের এক ভ্রান্ত অবলোকনে এবং এক অনুস্থাপিত ভাবনাময় উদারনীতির অনুসরণে আমরা ২৫।৩০ বছর আগে ভারত সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত পথ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু আমরা ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারি না এবং বর্তমান অবস্থা ও প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা আমাদের নিতেই হবে। আমি এবিষয়ে খুব পরিষ্কার যে, আমাদের বর্তমান মানসিকতা বিপদকে বাড়িয়েই তুলছে।

২০।৩০ বছর আগে যখন আমরা ভারতে রাজনৈতিক সংস্কার আরম্ভ করেছিলাম, তখন আমরা যে পথ ধরেছিলাম তা থেকে এখন আমরা সরে আসতে পারি না। হয়ত সেটা ভুল পথ ছিল এবং হয়তো অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানের চেষ্টাটা আগে করলে আরও ভালো হোতো। কিন্তু পথ পরিবর্তনের পক্ষে এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এবং ভারতকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্পণ করবার সাধারণ নীতি এই কিছুদিন আগেও ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবের মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়েছিল।

আমি মনে করি যে, পশুশক্তি দিয়ে ভারতকে আমরা কোনো প্রকারেই আর পদানত রাখতে পারবো না। ভারতীয়রা খুবই নিরীহ, এবং হয়ত অল্প পরিমাণ শক্তি নিষ্ঠুরভাবে প্রযুক্ত হলে তাই যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু আমি এবিষয়ে নিশ্চিত যে ব্রিটিশ জাতি আর দমননীতির সঙ্গে জড়িত থাকতে স্বীকৃত হবে না, বিশ্বজনমতও তা অনুমোদন করবে না এবং এই দেশকে পদানত রাখবার জন্য ব্রিটিশ সৈন্যরা যুদ্ধের পর এদেশে অধিক সংখ্যায় থাকতে রাজি হবে না। আমরা যদি ভারতকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথে রাখতে চাই, তাহলে ব্রিটিশ সংস্রবের ব্যাপারে তাদের স্বেচ্ছামূলক সমর্থন থাকা চাই।

বর্তমান ভারত সরকার বেশিদিন চলতে পারবে না। যদিও মূল দায়িত্ব এখনও মহামান্য সম্রাটের সরকারের হাতেই আছে, তবুও মহামান্য সম্রাটের সরকারও এখন আর তাৎপর্যমূলক কাজ করবার ক্ষমতা রাখেন না। আমরা ক্রমশঃ ব্যাপকতরভাবে এমন সব অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার দিকে ভেসে যাবো যে, সবের জন্য হয়তো ভারতই দায়ী, কিন্তু তার জন্য মহামান্য সম্রাটের সরকার নিন্দাভাজন হবেন।...

...আমরা যদি ভারতকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ইচ্ছুক সদস্য হিসাবে রাখতে চাই, তাহলে আর দেরি না করে আমাদের উচিত কোনো সুকল্পিত ও গঠনমূলক পন্থা গ্রহণ করা। গান্ধী এবং জিন্না ও তাঁদের অনুচরদের অবিশ্বাস ও অপছন্দ করবার যথেষ্ট কারণ আছে; কিন্তু কংগ্রেস এবং লীগ দুটি দল হিন্দু এবং মুসলমান ভারতে সর্বপ্রধান এবং থাকবেও তাই। তারা

সংবাদপত্র-জগৎ, নির্বাচনীযন্ত্র এবং বিত্তশালী সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত দল হিসাবে মর্যাদাবান। যদি গান্ধী ও জিন্নার অকাল মৃত্যু হয়, পরামর্শ গ্রহণের জন্য তাঁদের চেয়ে বেশি দায়িত্বশীল আর কাউকে আমি দেখি না। আমরা এই ধরনের বিদ্রোহীদের সঙ্গে আগেও মীমাংসার আলোচনা চালিয়েছি, যেমন ধরুন, ডি ভ্যালেরা এবং জগলুল।...বিরাট ঝুঁকি না নিয়ে আমরা কোনো পন্থা গ্রহণ করতে পারবো না। কিন্তু সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হচ্ছে যে, যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষ একটি দুষ্ট ক্ষত হয়ে উঠবে, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল শক্তির অবক্ষয় ঘটাবে। আমার মনে হয়, এখনও ভারতকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথে রাখা সম্ভবপর, যদিও সেটা খুব সহজ হবে বলে আমি মনে করি না। আমরা এ-বিষয়ে যদি কোনো চেষ্টাই না করি, তাহলে হয়ত আমরা আর কয়েক বছর ভারতকে কষ্টের সঙ্গে পদানত করে রাখতে পারবো কিন্তু পরিশেষে ভারতবর্ষ বিশৃঙ্খলাময়, এমনকি অপর দেশের অধীন হয়ে যাবে।...

...কার্যকরী কিছু করতে হলে এমন কিছু করতে হবে যা ভারতীয়দের কল্পনাকে অভিষিক্ত করতে পারে। ভারতকে যদি পশুশক্তির দ্বারা শাসন করতে না হয়, তাহলে মস্তিষ্ক চালনা করে নয়, পরন্তু হৃদয়বত্তা দিয়ে ভারত শাসন করতে হবে। আমাদের পদক্ষেপ নিশ্চয়ই আন্তরিক ও বন্ধুতাপূর্ণ হওয়া চাই এবং সেই অনুসারে ভারত সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতেই হবে। আমি নতুন পদক্ষেপের জন্য প্রস্তাবাদি পাঠাতে প্রস্তুত আছি। এতে ঝুঁকি নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এ-বিষয়ে অগ্রসর হবার সেইটাই হবে প্রকৃষ্ট পন্থা।...

...কিন্তু প্রকৃত প্রয়োজন হচ্ছে মানসিকতার পরিবর্তন, যাতে সাধারণ শিক্ষিত ভারতীয় বিশ্বাস করতে পারে যে, ব্রিটিশ সরকার তাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আন্তরিক এবং ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। সেটা খুব সহজ হবে না, কারণ, গভীরভাবে বদ্ধমূল সন্দেহের মনোভাবকে দূর করতে হবে। কিন্তু এমন কিছু কাজ আমাদের করতে হবে যার দ্বারা বর্তমানের ব্যাপক অবিশ্বাস ও শত্রুতার ভাব অনেকটা কমিয়ে দেওয়া যায়। বস্তুতঃ আমরা যদি ভারতকে যুদ্ধ শেষে ডোমিনিয়ন করে দেব বলে ঠিক করে থাকি, তাহলে এই মুহূর্তে তাকে ডোমিনিয়নের মত মর্যাদা দেওয়া উচিত। আমার প্রস্তাবমত মহামান্য সরকার যদি কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং মহামান্য সম্রাটের সরকারের অনুমতিক্রমে আমি যদি ভারতকে ব্রিটিশ সহানুভূতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করতে পারি, তাহলে আমার বিশ্বাস—অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে।" (লম্বা চিঠিটির অংশবিশেষের ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হোলো)

উইনস্টন চার্চিলকে এই চিঠি লেখবার পর কয়েকমাস ব্রিটিশ সরকার কিছুই করলেন না। কিন্তু ওয়েভেল ছাড়লেন না। তিনি বার বার বিলাতে তাগিদ পাঠাতে লাগলেন, যাতে চার্চিল সরকার এ-বিষয়ে সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অবশেষে ১৯৪৫-এর মার্চে ওয়েভেলকে লণ্ডনে ডেকে পাঠানো হোলো যাতে তিনি চার্চিল ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্ত ব্যাপারটা তাঁদের বুঝিয়ে ব্যবস্থা নেওয়াতে পারেন। ওয়েভেল লণ্ডনে প্রায় তিনমাস বসে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্যদের ভারতের স্বাধীনতা দানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বুঝিয়ে বললেন। অবশেষে ৩১শে মে রাত সাড়ে দশটার মন্ত্রিসভার বৈঠকে চার্চিল ওয়েভেলের প্রস্তাব মেনে নিলেন যে, ভারতবর্ষকে সন্তুষ্ট করবার জন্য কিছু করা দরকার এবং বড়লাটের মন্ত্রিসভার সম্পূর্ণ ভারতীয়করণের ও মন্ত্রিসভার সাধারণভাবে স্বাধীনভাবে কাজ করবার প্রস্তাবও তিনি মেনে নিলেন এবং এই সকল প্রস্তাব আলোচনার জন্য তিনি ওয়েভেল কর্তৃক কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলনেতাদের এক সম্মেলনের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। নয়াদিল্লিতে ফিরেই ওয়েভেল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বন্দী সদস্যদের মুক্তির আদেশ দিলেন এবং তাঁর প্রস্তাবমত ২৫শে জুন সিমলায় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও শিখ নেতাদের নিয়ে এক বৈঠকে বসলেন। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের আগে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও শিখ-নেতারা কিভাবে ভারত সরকার পরিচালনায় সহযোগিতা করতে পারেন—এই আলোচনার উদ্দেশ্যে।

এই সিমলা সম্মেলন সফল হয়নি। তার কারণ, বড়লাটের মন্ত্রিসভায় জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগ সদস্যদের সমান সংখ্যক আসন দাবি করলেন এবং কংগ্রেস কিছুতেই তাতে রাজি হোলো না। কিন্তু চার্চিলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওয়েভেল যে তাঁকে ভারত সম্বন্ধে কার্যকরী কিছু প্রগতিমূলক নতুন ব্যবস্থা নিতে প্ররোচিত করেছিলেন, তাতে ওয়েভেলের আন্তরিকতার ও ভারত প্রীতি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ওয়েভেলের আন্তরিকতার সম্যক স্বীকৃতি আমাদের দেশের ঐতিহাসিকরা দিতে পারেননি। কেউ কেউ বলেন, ওয়েভেলের উচিত ছিল জিন্নার দাবি অগ্রাহ্য করা। তাহলে জিন্না ও মুসলিম লীগ বড়লাটের মন্ত্রিসভায় আসতো না এবং কংগ্রেস একাই আধিপত্য করতে পারতো। কিন্তু পরের ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, সেটা ঠিক হোতো না। কারণ, ভারতের মুসলমান অধিকাংশই কংগ্রেস-বিরোধী ছিলেন এবং এতে তাঁরা রুষ্ট হতেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ শতকরা ৯০টি মুসলমান আসন দখল করেছিল। সবচেয়ে বড় কথা ছিল, চার্চিল তখনও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং লীগকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের হাতে বড়লাটের মন্ত্রিসভা তুলে

দেওয়া তিনি যথাশক্তি দিয়ে বন্ধ করবার চেষ্টা করতেন।

জুলাই মাসে ব্রিটেনের সাধারণ নির্বচনে শ্রমিক দল বিরাট জয়লাভ করলো এবং চার্চিল মন্ত্রিসভার রাজত্ব শেষ হয়ে গেলো। শ্রমিক মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ করেই ভারত সম্বন্ধে কি করা যেতে পারে, তাই আলোচনার জন্যে ওয়েভেলকে লণ্ডনে ডেকে পাঠালেন। এঁদের সঙ্গে আলোচনা করে নয়াদিল্লি ফিরেই ১৯শে সেপ্টেম্বর ওয়েভেল ঘোষণা করলেনঃ 'মহামান্য সম্রাটের সরকার ভারতীয় জননেতাদের সঙ্গে একমত হয়ে অবিলম্বে ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অবিলম্বে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভাগুলিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহামান্য সম্রাটের সরকারের অভিলাষ যে, যত শীঘ্র সম্ভব একটি সংবিধান-রচনা-পরিষদ গঠন করতে হবে, যারা ঠিক করবে ১৯৪২ সালের ঘোষণা (ক্রিপস্ প্রস্তাব) বা বিকল্প কোনো পরিবর্তিত বা নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।' (ইংরেজির অনুবাদ)

কিন্তু সদ্য কারামুক্ত কংগ্রেস নেতারা শীঘ্র স্বাধীনতা না পেলে আবার আন্দোলন করবেন বলে ভয় দেখাতে লাগলেন। ওদিকে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের কিছু অফিসার ও সৈনিকদের বিচার নিয়ে দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিল। শান্তভাবে কিছু করবার আর অবকাশ রইল না। ১৯৪৬-এর ৫ই জানুয়ারি ব্রিটেন থেকে এক পার্লামেণ্ট সদস্যের দল ভারতে এলেন ভারতের অবস্থা সরেজমিনে বিচার করতে। কিন্তু তাঁরা বিশেষ কিছু করতে পারলেন না—কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে গেলেন। ফেব্রুয়ারি মাসে ঠিক হোলো, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার তিনজন মন্ত্রী—পেথিক লরেন্স, স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ও আলেকজাণ্ডার ভারতে এসে নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করবেন, কিভাবে ব্রিটেন শাসনক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে হস্তান্তর করবে।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, ওয়েভেলের নিন্দা করা হয়ে থাকে, তিনি নাকি জিন্না ও মুসলিম লীগের প্রতি আগাগোড়া পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু এই সময়ে অর্থাৎ ৪৬-এর মার্চে পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ ৭৯টি সভ্যপদ লাভ করা সত্ত্বেও এবং সর্ববৃহৎ একক দল হওয়া সত্ত্বেও, ইউনিয়নিষ্ট-কংগ্রেস-আকালি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করা হলে তিনি তাতে কোনো বাধা দেননি। পরে দেখা যাবে, এই কারণে পাঞ্জাবে ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় এবং সেই দাঙ্গার ভয়াবহতা জওহরলাল ও মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতের বিভাগ-পরিকল্পনা রচনা করতে বাধ্য করে।

আপোষ আলোচনার জন্য ব্রিটিশ সরকারের তিনজন মন্ত্রী ২৮শে মার্চ ভারতে পেঁছিলেন। এঁদের সঙ্গে সকল শ্রেণীর ভারতীয় নেতাদের আলোচনা হোলো। কয়েকবার দিল্লি-সিমলাও হোলো, কিন্তু ফল হোলো না। কংগ্রেস

ও লীগ নেতারা কিছুতেই একটি যৌথ প্রস্তাবে সম্মত হতে পারলেন না, যাতে উভয় দলের স্বার্থ ও আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকে।

৪৬-এর ৩রা এপ্রিল নয়াদিল্লিতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতাকে এক সাক্ষাৎকারে জওহরলাল নেহরু বলেছিলেনঃ 'আমাদের মতে, নতুন সংবিধানে হবে ইচ্ছুক প্রদেশগুলি নিয়ে একটি ফেডারেশন, যাতে যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা প্রদেশগুলির থাকবে। কার্যত প্রদেশগুলি হবে প্রায়-স্বাধীন (সেমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট)। আর কেন্দ্রের হাতে থাকবে যতদূর অল্পসংখ্যক বিষয়। এই বিষয়গুলি হচ্ছেঃ বিদেশ বিভাগ, দেশরক্ষা, যোগাযোগ, মুদ্রা ইত্যাদি যাতে প্রত্যেকটি প্রদেশ পরে নিজেকে বিকশিত করবার পূর্ণ স্বাধীনতা পায়। কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্তভাবেও কতকগুলি বিষয় রাখা যেতে পারে, যেগুলি কোনো প্রদেশ ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারে বা না-ও পারে।...এইভাবে এটাও সম্ভব যে, দেশের দু'-একটি অঞ্চল এখনকার মত স্বাধীনভাবে চলতে পারবে এবং পরে কোনো বিশেষ অঞ্চলের সকল অধিবাসীর গণভোটে বিশেষ বিষয়টি সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।' (দি স্টেটসম্যান, ৪.৪.৪৬, ইংরেজির অনুবাদ)

মুসলিম লীগের সঙ্গে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ ৪৬-এর ১২ই মে বড়লাটকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা এইঃ

১. কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি নিম্নলিখিতভাবে হবেঃ—

ক. প্রতিনিধিরা প্রত্যেক প্রাদেশিক লেজিসলেটিভ এসেম্বিলির দ্বারা 'প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন'-এ (সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল ভোটে) নির্বাচিত হবেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা হবে এসেম্বিলির সদস্যদের একপঞ্চমাংশ।

খ. দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিরা যে লোকসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন, সেই অনুপাতে। কিভাবে এই প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন তা পরে বিবেচনা করা হবে।

২. কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি ফেডারেল ইউনিয়নের জন্য একটি সংবিধান রচনা করবে। তাতে থাকবে একটি নিখিল ভারত ফেডারেল গভর্নমেন্ট এবং আইনসভা, যার অধীনে থাকবেঃ বিদেশ বিভাগ, দেশরক্ষা, যোগাযোগ, ফান্ডামেন্টাল রাইটস্, মুদ্রা, শুল্ক এবং পরিকল্পনা এবং থাকবে সেই বিষয়-গুলি যেগুলি পরে ভালো করে বিবেচনার পর দেখা যাবে যে, উপরোক্ত বিষয়-গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত। এই সকল বিষয়গুলি পরিচালনার জন্য যে অর্থ-সঙ্গতির প্রয়োজন, তা পাবার জন্য আবশ্যকীয় ক্ষমতা ফেডারেল ইউনিয়নের থাকবে এবং স্বকীয় অধিকারে খাজনা আদায়ের অধিকার থাকবে।

সংবিধান-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে বা চরম জরুরী অবস্থায় তার প্রতিবিধান করবার ক্ষমতাও ইউনিয়নের থাকা চাই।

৩. অবশিষ্ট সকল ক্ষমতা প্রদেশগুলি বা অঙ্গগুলির হাতে থাকবে।

৪. বিভিন্ন প্রদেশ নিয়ে গ্রুপ গঠন করা যেতে পারে এবং এই সকল গ্রুপ ঠিক করতে পারবে কোন্ কোন্ প্রাদেশিক বিষয় যৌথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

৫. কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি নিখিল ভারত ফেডারেল ইউনিয়নের সংবিধান আগের ২নং অনুচ্ছেদের মত রচনা করবার পর প্রদেশের প্রতিনিধিরা গ্রুপ গঠন করতে পারবে এবং প্রত্যেক গ্রুপের প্রদেশগুলির সংবিধান রচনা করবার জন্য এবং যদি তারা চায়, তাহলে গ্রুপের জন্যও একটি সংবিধান রচনার জন্য।

৬. কোনো সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিখিল ভারত ফেডারেল ইউনিয়নের সংবিধানের কোনো নিদান কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে পাশ হোলো বলে ধরা হবে না, যতক্ষণ না সেই সম্প্রদায়ের বা সম্প্রদায়গুলির সভ্যরা যাঁরা এসেম্বলিতে উপস্থিত আছেন এবং ভোট দিচ্ছেন, তাঁরা পৃথক-ভাবে তাকে সমর্থন করছেন এবং এই সকল প্রশ্নে কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না সম্ভব হলে তা আরবিট্রেশনে দেওয়া হবে। কোন্‌টি সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ দেখা দিলে স্পীকারকে সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে অথবা যদি সেইমত সবাই ইচ্ছুক হন তাহলে সিদ্ধান্তের জন্য প্রশ্নটি ফেডারেল কোর্টে পাঠানো হবে।

৭. সংবিধান রচনার সময়ে কোনো বিষয় নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হলে সেই বিশেষ বিষয়টি আরবিট্রেশনে দেওয়া হবে।

৮. যে-কোনো সময়ে সংবিধান সংশোধনের জন্য ব্যবস্থা থাকা চাই, যদিও তাতে প্রয়োজনমত বাঁধাবাঁধি থাকতে পারে। যদি দরকার হয়, এটা পরিষ্কার বলেও দেওয়া যেতে পারে যে, সমগ্র সংবিধানের পুনর্বিবেচনা দশ বছর পরে করা হবে। (দি স্টেটসম্যান, ১৯.৫.৪৬, ইংরেজির অনুবাদ)

১২ই মে তাঁর চিঠিতে জিন্নাও মুসলিম লীগের ন্যূনতম দাবিগুলি বড়লাটকে জানিয়ে দিলেনঃ

১. ছটি মুসলমান-প্রধান প্রদেশ (পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, বাংলা ও আসাম) একটি গ্রুপে গঠিত হবে এবং অন্যান্য সকল বিষয় এবং বস্তু তারা নিজেরাই শাসন করবে, শুধু বিদেশ বিভাগ, দেশরক্ষা, দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া। এই সকল বিষয় সম্বন্ধে হিন্দু-প্রধান ও মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলির দুটি গ্রুপের সংবিধান রচনা পরিষদ একত্রে বসে শাসন-ব্যবস্থা রচনা করতে পারবে।

২. উপরোল্লিখিত ছটি মুসলমান-প্রদেশগুলির জন্য একটি পৃথক সংবিধান রচনা পরিষদ থাকবে। এই সংবিধান রচনা সমস্ত গ্রুপের সংবিধান রচনা করবে এবং কোন বিষয়গুলি প্রাদেশিক শাসনাধীন হবে এবং কোনগুলি (পাকিস্তান ফেডারেশন) গ্রুপের কেন্দ্রীয় শাসনাধীন হবে তা ঠিক করে দেবে, কিন্তু প্রদেশগুলির হাতে রেসিডিউয়ারী বা অবশিষ্টাংশ সার্বভৌম শাসন-ক্ষমতা থাকবে।

৩. সংবিধান রচনা পরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি এমন হওয়া চাই যাতে পাকিস্তান গ্রুপের প্রত্যেক প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা অনুপাতে প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব থাকে।

৪. পাকিস্তান গ্রুপের ফেডারেল সরকারের সংবিধান এবং প্রদেশগুলির সংবিধান, সংবিধান-রচনা পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে রচনা হয়ে যাবার পর গ্রুপের কোনো প্রদেশের পক্ষে সেই গ্রুপ থেকে নিজেকে বের করে নেবার স্বাধীনতা থাকবে কিন্তু সেই প্রদেশের অধিবাসীদের বেরিয়ে যাওয়া না যাওয়ার ইচ্ছা গণভোট দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

৫. দুটি সংবিধান-রচনা পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের একটি আইনসভা থাকবে কি থাকবে না, তা বিবেচনা করবার ব্যবস্থা থাকবে। কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের আর্থিক সঙ্গতি যোগান দেবার পদ্ধতি সম্বন্ধেও দুটি সংবিধান রচনা পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে বিবেচনা করবার ব্যবস্থা থাকবে। কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের আর্থিক সঙ্গতি কিন্তু কোনো মতেই ট্যাক্স বসিয়ে আদায়ের ব্যবস্থা করা যাবে না।

৬. কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এবং যদি আইন-সভা গঠিত হয় সেখানেও বিভিন্ন প্রদেশের দ্বারা গঠিত দুটি গ্রুপের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকা চাই।

৭. ইউনিয়ন সংবিধানের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন দুটি সংবিধান রচনা পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে পাশ হলো বলে গণ্য হবে না যতক্ষণ না হিন্দু-প্রধান গ্রুপের উপস্থিত ও ভোটদানকারী পরিষদ-সদস্যরা পৃথকভাবে সংখ্যাধিক ভোটে তা সমর্থন করেন।

৮. ইউনিয়নের আইনসভা ঘটিত, শাসনব্যবস্থা ঘটিত বা শাসকমণ্ডলী ঘটিত কোনো বিতর্কমূলক প্রশ্ন তিন-চতুর্থাংশ সভ্যের সংখ্যাধিক্য ছাড়া পাশ করা যাবে না।

৯. গ্রুপ এবং প্রাদেশিক সংবিধানগুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে মৌল অধিকার (ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটস্) এবং ধর্ম, সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে রক্ষা কবচ থাকা চাই।

১০. ইউনিয়নের সংবিধানে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই যে, কোনো প্রদেশ

তার আইনসভার সংখ্যাধিক্য ভোটে প্রথম দশ বছরের পর সংবিধানের নিদান-গুলি পুনর্বিবেচনা করে দেখতে পারবে এবং কোনো প্রদেশের পক্ষে দশ বছর পরে ইউনিয়ন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার স্বাধীনতা থাকবে। (দি স্টেটসম্যান, ১৯.৫.৪৬, ইংরেজির অনুবাদ)

মুসলিম লীগের এই ন্যূনতম দাবি সম্বন্ধে বিবেচনা করে কংগ্রেস সভাপতি সেইদিন (১২ই মে) বড়লাটকে জানিয়ে দিলেনঃ

"কোনো ব্যবস্থাতেই আসামকে যে গ্রুপে ফেলা হয়েছে স্পষ্টতই সেখানে তাকে রাখা যাবে না এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, সেই প্রদেশও এই গ্রুপ-গঠন প্রস্তাবের পক্ষে নয়।

যেহেতু গ্রুপ গঠনের পূর্বে বিশেষ কোনো প্রদেশের সেই গ্রুপে যোগ-দানের সম্মতি দেওয়া দরকার, সেই কারণে কোনো প্রদেশের পরে গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থার কোনো প্রয়োজন নেই।"

মুসলিম লীগের ন্যূনতম দাবির ৬, ৭ এবং বিশেষ করে ৮ নং অনুচ্ছেদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রবল আপত্তি জানালো।

আমরা দেখেছি, ৩রা এপ্রিল রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতার কাছে জওহর-লাল ঘোষণা করেছিলেন যে, কংগ্রেস ভারতে এমন একটি ফেডারেশন গঠন করতে চায় যেখানে ফেডারেশনের অঙ্গ-প্রদেশগুলি সেমি-ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যত কম সম্ভব শাসনাধীন বিষয় রাখা হবে। কিন্তু ১২ই মের কংগ্রেস সভাপতির চিঠিতে মৌলানা আজাদ যে কটি বিষয় ভারতীয় ফেডারেল ইউনিয়নের শাসনাধীন রাখতে চাইলেন তাতে অঙ্গ-প্রদেশগুলির স্বাধীনতা প্রচুরভাবে খর্ব করা হোলো। বিশেষ করে, সংবিধান প্রয়োগে অচলাবস্থা হলে বা চরম জরুরী অবস্থার উদ্ভব হলে কেন্দ্রের হস্ত-ক্ষেপের সুযোগ রাখার জন্য দাবি করা হোলো—পরিকল্পনা বিভাগটিও কেন্দ্রের হাতে রাখা হবে। কংগ্রেস নেতারা মুখে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বললেন বটে, কিন্তু ১২ই মের চিঠিতে প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল করে রাখা হোলো। কংগ্রেস সভাপতি এটাও পরিষ্কার করে দিলেন যে, নিখিল ভারত ফেডারেল ইউনিয়নের সংবিধান রচনা হবার পর তবেই অঙ্গ-প্রদেশগুলির গ্রুপ-গঠনের কথা উঠবে এবং প্রদেশগুলি প্রাদেশিক সংবিধান অথবা গ্রুপ সংবিধান রচনা করতে পারবে। ফেডারেল ইউনিয়নের সংবিধান রচনা হয়ে যাবার পর অঙ্গ-প্রদেশগুলিকে সেই সংবিধানই অনুসরণ করতে বাধ্য থাকতে হোতো এবং তখন প্রাদেশিক বা গ্রুপ সংবিধান রচনা করতে হলে প্রদেশগুলিকে ফেডারেল সংবিধানের প্রভাব-মত তাই রচনা করতে হোতো এবং সেদিক দিয়ে দেখলেও প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনকে অনেকটা নেতিবাচক করে দেবার বিধান চাওয়া হোলো।

কংগ্রেস সভাপতি অবশ্য এটাও বললেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের রীতি অনুযায়ী কোনো প্রদেশকে কোনো গ্রুপে যোগ দিতে বলার আগে তার সম্মতির প্রয়োজন। বিনা সম্মতিতে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো প্রদেশকে কোনো গ্রুপে যোগদানে বাধ্য করা চলবে না। সেই হেতু আসামকে বাংলার সঙ্গে গ্রুপ গঠনে বাধ্য করা চলবে না এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের শাসন চালু থাকায় সেই প্রদেশও গ্রুপ গঠনের ব্যবস্থায় রাজি হবে না। কাজেই তাকেও পাঞ্জাব বা সিন্ধুর সঙ্গে গ্রুপ গঠনে বাধ্য করা চলবে না। গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসবার যে স্বাধীনতা মুসলিম লীগ প্রদেশগুলিকে দিতে চাইলো, কংগ্রেস বললো—তার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ পূর্বাহ্নে সম্মতি দেওয়ায় তাদের আর গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যাবার প্রয়োজন হবে না।

ভারতের নতুন সংবিধান রচনার ব্যাপারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গীর এইরূপ মৌলিক পার্থক্য থাকায় মন্ত্রী-মিশন শাসনভার হস্তান্তরের পদ্ধতি নিয়ে ১৬ই মে ঘোষণা করলেন তাঁদের নিজেদের প্রস্তাব।

তাঁদের ঘোষণাপত্রের ১৫ নং অনুচ্ছেদে মন্ত্রী-মিশন বললেন—আমরা সমাধানের প্রকৃত রূপটি জানাচ্ছি যার দ্বারা বিভিন্ন দলের মূল দাবিগুলির প্রতি ন্যায় বিচার করা হবে এবং সেই সঙ্গে ভারতের জন্য একটি স্থিতিশীল এবং কার্যকরী সংবিধান গঠন করা সম্ভব হবে।

আমরা সুপারিশ করেছি যে, সংবিধান নিম্নবর্ণিত ভিত্তিতে গঠিত হবেঃ—

১. ব্রিটিশ ভারত এবং রাজন্য ভারতের সংযুক্তিতে একটি ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হবে আর বিদেশ বিভাগ, দেশরক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা—শুধু এই কটি বিষয়ের উপর তার কর্তৃত্ব থাকবে এবং এই সকল বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার অর্থ সংকলনের অধিকার থাকবে।

২. ইউনিয়নের একটি শাসন-পরিষদ (একজিকিউটিভ) থাকবে এবং ব্রিটিশ ভারত ও রাজন্য ভারতের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি আইনসভা থাকবে। কোনো প্রধান সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে আইনসভাকে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ও ভোটদানকারী প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্যের প্রয়োজন হবে এবং সেই সঙ্গে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সকল প্রতিনিধির সংখ্যাধিক্যেরও প্রয়োজন হবে।

৩. ইউনিয়নের বিষয়গুলি ছাড়া এবং অন্যান্য সকল বিষয় এবং সকল অবশিষ্ট ক্ষমতা (রেসিডিউয়ারি পাওয়ারস) প্রদেশগুলির হাতে থাকবে।

৪. রাজন্য-প্রদেশগুলিও (নেটিভ স্টেটস্) ইউনিয়নকে প্রদত্ত ক্ষমতা ও বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয় ও সকল ক্ষমতা হাতে রাখবে।

৫. প্রদেশগুলি ইচ্ছামত শাসন পরিষদ (একজিকিউটিভ) ও আইনসভা সমেত গ্রুপ গঠন করতে পারবে এবং প্রত্যেক গ্রুপ কোন কোন বিষয় প্রদেশ-গুলির সঙ্গে যুক্তভাবে গ্রহণ করবে তাও ঠিক করবে।

৬. ইউনিয়ন ও গ্রুপগুলির সংবিধানে একটি শর্ত থাকবে যে, যে কোনো প্রদেশ তার আইনসভার সংখ্যাধিক্য ভোটে দশ বছর পরে প্রথম গঠিত সংবিধানের শর্তগুলির পুনর্বিবেচনা করতে পারবে এবং তারপরে প্রতি দশ বছর অন্তর এইভাবে পুনর্বিবেচনা করতে পারবে।

ক. আমরা তাই প্রস্তাব করছি যে, প্রত্যেক প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক নিম্নসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন—আইনসভার প্রতি অংশ (সাধারণ, মুসলিম বা শিখ) সিঙ্গল ট্রান্সফারবল ভোটে প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করবেঃ

প্রতিনিধি সংখ্যা তালিকা সেকসন 'এ'

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলমান	মোট
মাদ্রাজ	৪৫	৪	৪৯
বোম্বাই	১৯	২	২১
যুক্তপ্রদেশ	৪৭	৮	৫৫
বিহার	৩১	৫	৩৬
মধ্যপ্রদেশ	১৬	১	১৭
ওড়িষ্যা	৯	০	৯
	১৬৭	২০	১৮৭

সেকসন 'বি'

	সাধারণ	মুসলমান	শিখ	মোট
পাঞ্জাব	৮	১৬	৪	২৮
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	০	৩	০	৩
সিন্ধু	১	৩	০	৪
	৯	২২	৪	৩৫

সেকসন 'সি'

	সাধারণ	মুসলমান	মোট
বাংলা	২৭	৩৩	৬০
আসাম	৭	৩	১০
	৩৪	৩৬	৭০
ব্রিটিশ ভারতের	মোট প্রতিনিধি		২৯২
রাজ্য ভারতের	প্রতিনিধি		৯৩
		মোট	৩৮৫

বিশেষঃ চিফ কমিশনারের প্রদেশগুলির প্রতিনিধি হিসাবে 'এ' সেকসনের কেন্দ্রীয় লেজিসলেটিভ এসেম্বলিতে দিল্লীর প্রতিনিধি, আজমীর মারওয়াড়ার প্রতিনিধি এবং কুর্গ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রতিনিধি যুক্ত হবেন। সেকসন 'বি'তে ব্রিটিশ বেলুচিস্তানের প্রতিনিধি যুক্ত হবেন।

খ. চূড়ান্ত কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে রাজন্য ভারতের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে, কিন্তু তার সংখ্যা ৯৩-র বেশি হবে না এবং প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি আলোচনার পর ঠিক হবে। রাজ্যগুলির প্রতিনিধি হিসাবে প্রথমে একটি আলোচনা কমিটি কাজ করবেন।

গ. নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়াদিল্লিতে মিলিত হবেন।

ঘ. একটি প্রাথমিক মিটিং-এ সাধারণ কার্যবিধি নিরূপিত হবে। চেয়ারম্যান এবং আদিবাসী ও বহির্ভূত অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে। তারপর প্রদেশগুলির প্রতিনিধিরা ক. উপচ্ছেদের তালিকা মত 'এ' 'বি' 'সি' তিনটি সেকশনে বিভক্ত হবেন।

ঙ. এই সেকশনগুলি প্রত্যেক সেকশনের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলির সংবিধান রচনা করতে আরম্ভ করবে এবং সেই প্রদেশগুলিতে গ্রুপ সংবিধান চালু করা যাবে কিনা তাও ঠিক করবে এবং তা যদি হয়, তাহলে কোন্ কোন্ প্রাদেশিক বিষয় নিয়ে গ্রুপের কর্তৃত্ব থাকবে তাও ঠিক করবে। নিম্নবর্ণিত

জ. উপচ্ছেদের নিদান অনুযায়ী কোনো প্রদেশ বিশেষ কোনো গ্রুপ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারবে।

চ. সেকশনের এবং রাজন্য ভারতের প্রতিনিধিরা ইউনিয়ন সংবিধান রচনার জন্য পুনর্বার মিলিত হবেন।

ছ. ইউনিয়ন কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি যদি ১৫নং অনুচ্ছেদের শর্তাবলীর কোনো অদল-বদল করতে চান বা কোনো মৌলিক সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত এবং যদি দুই প্রধান সম্প্রদায়ের একটির প্রতিনিধি দল কর্তৃক অনুরুদ্ধ হন, তাহলে নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগে ফেডারেল কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

জ. নতুন সংবিধানের নিদানগুলি চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রদেশ ইচ্ছা করলে যে গ্রুপে নিজের স্থান হয়েছে সেই গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। নতুন সংবিধান অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রাদেশিক আইনসভা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

কংগ্রেস নেতারা এতদিন বলে আসছিলেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে প্রদেশগুলি হবে সেমি-ইন্ডিপেন্ডেণ্ট, কিন্তু ২৪শে-মের প্রস্তাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রথম বললেনঃ 'কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার দরকার' এবং আরও বললেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের নীতি অনুসারে কোনো গ্রুপে যোগ দিতে বলার আগে তার সম্মতি প্রয়োজন।

মন্ত্রী-কমিশনের এই ঘোষণা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী মিশনকে একটি চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করলেন ঐ ঘোষণার ১৫নং অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে মন্ত্রী-মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে কিনা এবং তা যদি হয় তাহলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 'বি' সেকশনে এবং আসাম 'সি' সেকশনে যোগ-দান থেকে বিরত থাকতে পারবে কি না। গান্ধীজীর চিঠির পাশে ওয়েভেল লিখেছিলেনঃ 'এর জবাব হওয়া উচিত একটি নিশ্চিন্ত এবং দৃঢ়সম্মত 'না'।'

কংগ্রেস নেতারা এই গ্রুপ গঠনের প্রস্তাবটির প্রবল বিরোধিতা করলেন। তাঁরা বললেন, কোনো প্রদেশ কোনো গ্রুপে যোগদান করবে কিনা এ-নিয়ে কোনো জবরদস্তি থাকা উচিত নয়। প্রদেশের প্রতিনিধিরা যদি ইচ্ছে করেন তবেই তাঁরা গ্রুপে যাবেন, না ইচ্ছে করলে যাবেন না। আসাম হিন্দুপ্রধান কিন্তু 'সি' সেকশনে পড়ে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধীন হয়ে পড়বে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার অধীন, কিন্তু 'বি' সেকশনে পড়ে সেখানে কংগ্রেস কর্তৃত্ব হারাতে পারে। 'সি' সেকশনে (বাংলা, আসাম) মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৩৬ এবং অ-মুসলমান ছিল ৩৪। ইয়োরোপীয়দের ভোট ছিল না। তবুও আসামের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলই নেতাদের ধরে বসলেন, আসামকে কিছুতেই 'সি' সেকশনে পাঠানো চলবে না এবং গান্ধীজী ও জওহরলাল উভয়েই তাঁকে সমর্থন করলেন। জিন্না বার বার বলতেন, হিন্দু-মুসলমান কখনও একসঙ্গে বাস করতে পারবে না। আসাম মুখ্যমন্ত্রীর দাবি মেনে নিয়ে গান্ধীজী ও জওহরলাল

প্রকারান্তরে জিন্নার সেই দাবিই মেনে নিলেন যে, হিন্দুপ্রধান আসামকে মুসলমান-প্রধান বাংলার সঙ্গে একসঙ্গে যুক্ত করা চলবে না। অবশ্য কংগ্রেসের নেতারা এটাও বললেন যে, মন্ত্রি-কমিশনের কোথাও লেখা নেই, প্রদেশগুলি কোন গ্রুপে যোগদান করতে বাধ্য থাকবে।

কংগ্রেস নেতারা যখন দাবি করলেন যে, ১৬ই মের ঘোষণা পত্রে প্রদেশগুলির গ্রুপ গঠনের যে ব্যবস্থা আছে প্রদেশগুলি তা মানতে বাধ্য নয়, তখন ২৫শে মে মন্ত্রী-মিশন ঘোষণা করলেনঃ 'ঘোষণা পত্রের ১৫নং অনুচ্ছেদের যে ব্যাখ্যা কংগ্রেস দল করেছেন অর্থাৎ প্রদেশগুলি প্রথম সুযোগেই ঠিক করতে পারবেন কোনো প্রদেশকে যে সেকশনে ফেলা হয়েছে সেই সেকশনে থাকবে কি থাকবে না—মিশনের অভিপ্রায়ের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। প্রদেশগুলি কর্তৃক গ্রুপ গঠনের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যগুলি ভালোভাবেই সকলে অবগত আছেন এবং এটি আমাদের প্রস্তাবনার একটি মৌলিক অঙ্গ এবং শুধু বিভিন্ন দলের ঐক্যমতের দ্বারাই এর পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে।' (ইংরেজির অনুবাদ)

কংগ্রেস নেতারা এতেও সন্তুষ্ট হলেন না। তখন বড়লাট লর্ড ওয়েভেল কংগ্রেস সভাপতিকে চিঠি লিখে জানালেন ১৫ই জুনঃ 'মন্ত্রিদল এবং আমি আপনাদের গ্রুপ গঠনের বিরুদ্ধে আপত্তির কথা জানি। আমি অবশ্য জানিয়ে দিতে চাই যে, ১৬ মের ঘোষণাপত্র গ্রুপ গঠনকে বাধ্যতামূলক করে দেয়নি। এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে প্রদেশগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর, যাঁরা বিশেষ বিশেষ সেকশনে যুক্তভাবে বসে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।...শুধু এই বিধানটি করা হয়েছে যে, বিশেষ বিশেষ প্রদেশের প্রতিনিধিরা বিশেষ সেকসনে একসঙ্গে মিলিত হবেন যাতে তাঁরা ঠিক করতে পারেন যে, কোনো গ্রুপ গঠন করা হবে কি হবে না। যদি এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েও থাকে, তখনও কোনো বিশেষ প্রদেশের যদি অভিরুচি হয় তাহলে সে নিজেকে তার গ্রুপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারবে।' (ইংরেজির অনুবাদ)

এখানেও কংগ্রেসের ব্যাখ্যা হেলো—নির্বাচিত প্রতিনিধি মানে যারা বর্তমানে নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু মন্ত্রী মিশন থেকে বলা হোলো—নির্বাচিত প্রতিনিধি মানে নতুন সংবিধান অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসবেন। **মূলত এই একটি ব্যাখ্যার পার্থক্যের জন্যই কংগ্রেস-লীগ ঐক্যমত ভেঙ্গে যায় এবং ভারত বিভাগের দরজা খুলে দেওয়া হয়।**

ওদিকে ৬ জুন মুসলিম লীগ বিনা শর্তে ১৬ মের মন্ত্রী মিশন প্রস্তাব মেনে নিয়ে একতাবদ্ধ ভারত সরকারের অধীন থাকবে বলে স্বীকার করে নিয়েছে এবং পাকিস্তানের দাবি ছেড়ে দিয়েছে। এমনকি, তাদের ১২ মের

চিঠির বহু প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা নিঃশর্ত সমর্থন জানিয়েছে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবকে।

কিন্তু ২১শে জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব নিলেনঃ "কংগ্রেস যে স্বাধীনতার লক্ষ্য নিয়েছিল তাতে একটি ঐক্যবদ্ধ, গণতান্ত্রিক ভারতীয় ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হবে যার কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বের জাতিগুলির শ্রদ্ধার পাত্র হবে, যাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রাদেশিক স্বাধীনতা থাকবে এবং থাকবে দেশের প্রতিটি পুরুষ এবং স্ত্রীর সমান অধিকার। মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং প্রদেশগুলি নিয়ে গ্রুপ গঠনের যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাতে সমস্ত কাঠামোটিকে একেবারে দুর্বল করে ফেলা হয়েছে এবং তাতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের প্রতি অবিচার করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছে কোনো কোনো সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে শিখদের উপর। কমিটি তাই অগ্রাহ্য করছেন। তাঁরা অবশ্য মনে করেন যে, সামগ্রিকভাবে প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করলে এমন যথেষ্ট অবকাশ আছে যাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরিবর্ধিত ও শক্তিমান করা যাবে এবং কোনো প্রদেশের গ্রুপ-গঠন সম্বন্ধে নিজের অভিরুচির অধিকার সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হবে এবং কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অন্য কোনো প্রকারে ক্ষতিজনক অবস্থায় পড়লে তাদের উদ্ধারে আসতে পারবে। কমিটি কিন্তু সাব্যস্ত করেছে যে, কংগ্রেস প্রস্তাবিত কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেমব্লিতে যোগদান করবে যাতে একটি স্বাধীন, ঐক্যবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক ভারতের সংবিধান রচনা করতে পারা যায়।.....

কমিটি কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে কংগ্রেসের যোগদানে রাজি হওয়ায় তাঁদের মতে এটি অত্যাবশ্যক যে, একটি প্রতিনিধিমূলক ও দায়িত্বশীল জাতীয় গভর্ণমেণ্ট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হওয়া দরকার। স্বেচ্ছাচারী এবং প্রতিনিধিত্বহীন গভর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র ক্ষুধার্ত জনগণের দুর্ভোগ বাড়িয়ে তুলবে এবং আরও অশান্তির সৃষ্টি করবে। এতে কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলির কাজের বাধা সৃষ্টি হবে, কারণ একে কাজ করতে হবে একটি স্বাধীন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে।" (ইংরেজির অনুবাদ)

কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাব যখন ৭ই জুলাই বোম্বাই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে পাশ করবার জন্য পেশ করা হোলো, তখন জওহরলাল পরিষ্কার করে কংগ্রেসের মনোভাবটি ব্যক্ত করলেনঃ 'এটা পরিষ্কার যে, বিদেশ বিভাগের ভিতর বৈদেশিক বাণিজ্য থাকবে। বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক অর্থনীতি, বৈদেশিক মুদ্রা এসব বাদ দিয়ে বিদেশ বিভাগের কথা বলাই অবাস্তব। দেশরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বললে স্বভাবতই দেশরক্ষার সঙ্গে যুক্ত সকল বিষয়বস্তু তার সঙ্গে থাকবে। দেশরক্ষার সঙ্গে

নিশ্চয়ই বহু সংখ্যক উৎপাদক ব্যবসা যুক্ত থাকা চাই। বিদেশ বিভাগ, দেশ-রক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়াও ইউনিয়ন সেণ্টারের অর্থ সংকলনের ক্ষমতা থাকবে। এর অর্থ এই হয় যে, ইউনিয়ন সেণ্টার কতকগুলি রাজস্ব-উৎপাদক বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব করবে। আমি হঠাৎ বলতে পারবো না, এই রাজস্ব-উৎপাদক বিষয়গুলি কি কি হবে। এটা অবশ্যম্ভাবী যে, কোন্ কোন্ রাজস্ব-উৎপাদক বিষয় কেন্দ্রের হাতে যাবে তা ঠিক করে দিতে হবে। মনে হয়, সে বিষয়গুলির মধ্যে শুল্ক বিভাগ ও শুল্ক কর পড়বে এবং হয়ত আয় করও পড়বে।

মন্ত্রী-মিশনের দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমি যতটা দেখতে পাচ্ছি তাতে দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদী কোনো পরিকল্পনা গ্রহণেরই প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্নটি শুধু কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে আমাদের যাওয়ার মধ্যেই নিবদ্ধ। সেইটুকুই আসল—তার চেয়ে কিছুমাত্র বেশি নয়।.....আমরা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে এতটুকু বাধ্যবাধকতায় নেই, এই মুহূর্তে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি শুধু এই যে, আমরা কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে যোগদান করবো এবং নিশ্চয়ই সেখানে শুধু সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা দেবার জন্য নয়, বরং আমাদের সমস্যাগুলিকে জয় করে কিছু গঠন করবার জন্য।' (ইংরেজির অনুবাদ)

বোম্বাইতে ১০ই জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে জওহরলাল আরও পরিষ্কার করে কংগ্রেসের মনোভাবটি তুলে ধরলেন যে, কংগ্রেস ১৬ই মের প্রস্তাবনার কিছুই গ্রহণ করেন নি, শুধু এক স্বাধীন কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে যেতে রাজি হয়েছেন। তিনি বলেছিলেনঃ এই কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারে তাহলে আমরা এই এসেম্বলি থেকে বেরিয়ে আসবো, দরকার হলে ভেঙে দেবো। আমরা কারও তাঁবেদারির কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি চাই না, আমরা চাই একটি বৈপ্লবিক কনস্টিটিউ-য়েণ্ট এসেম্বলি।

কংগ্রেস নেতারা প্রস্তাব পাশ করলেন বটে যে, তাঁরা ১৬ই মের মন্ত্রী-মিশন পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতায় বলতে লাগলেন, কোনো প্রদেশকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে গ্রুপে যোগ দিতে বাধ্য করা চলবে না এবং কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি হবে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন এবং কার্যত যা খুশি তাই করতে পারবে।

কংগ্রেস নেতাদের এই দু-মুখো নীতিতে জিন্না রুষ্ট হয়ে উঠলেন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ২৮শে জুলাই বোম্বাইতে জিন্না বললেনঃ "ওরা নির্বোধের মত বলছে যে কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিকে একটি সার্বভৌম প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে, যে কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিকে তলব করছে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের

মনোনীত ভারতের বড়লাট। পণ্ডিত জওহরলালের বাহাদুরিপূর্ণ এবং ছেলেমানুষী বিবৃতিতেই কি কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিকে সার্বভৌম প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাবে?...কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবটি যথেষ্ট মন্দ ছিল, কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস সভাপতির কার্যভার গ্রহণ করেই ১০ই জুলাই বোম্বাইয়ের সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী-মিশনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতি এবং মনোভাব পরিষ্কার করে দিয়েছেন। সেই সম্মেলনে পণ্ডিত নেহরু বলে দিয়েছেন যে, কংগ্রেস কোনো কিছুই মানতে বাধ্য নয় এবং ঘোষণাপত্রের ১৫ নং অনুচ্ছেদের ১৯ নং অনুচ্ছেদ মানতেও তাঁরা বাধ্য নন। ২৩শে জুলাই নয়াদিল্লীর এক জনসভায় পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করেছেন যে, কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিকে তাঁরা যদি অধিকতর ক্ষমতাশালী করতে না পারেন তাহলে তাঁরা কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিকে খতম করে দেবেন।...আমি প্রতিবাদের ভয় না রেখেই বলতে পারি যে, তিনটি পক্ষের ভিতর সারা আলোচনার সময়ে একমাত্র মুসলিম লীগই একটি সম্মানজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করেছে। আমরা একের পর এক ত্যাগ স্বীকার করেছি তার কারণ এই নয় যে, আমরা ভয়-বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। আমরা তা করেছিলাম শুধু একটি শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বময় মীমাংসায় পেঁছাবার চরম আকাঙ্ক্ষায়, যাতে করে এই উপ-মহাদেশের মুসলমান ছাড়াও অন্যান্য অধিবাসীরা স্বাধীনতা লাভ করতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল। তার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, আছে শুধু একটি—কি করে মুসলিম লীগকে ডোবানো যায়। (কংগ্রেসের প্রতি) আপনাদের কি এইটুকু সৌজন্য নেই, এতটুকু সাহস এবং আত্মসম্মান-জ্ঞান নেই যাতে আপনারা একথা বলতে পারেন যে, আপনারা এই ঘোষণাপত্রটি মানতে পারেন না কারণ সেটি আপনাদের লক্ষ্য এবং আপনাদের মৌলিক নীতির বিরোধী?" (ইংরেজির অনুবাদ)

২৯শে জুলাই-এর বক্তৃতায় জিন্না বললেনঃ "সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে সফল করবার জন্য মুসলিম লীগ পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব কংগ্রেসের পায়ে বলি দিয়েছিল। কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি নিশ্চয়ই এতে আপত্তি করবেন না যদি আমি বলি যে, যাতে রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধের পটভূমিকা তৈরি না হয় আমরা সেই ইচ্ছায় পরিচালিত হয়েছিলাম। প্রধান অপর পক্ষের সঙ্গে একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসার আকাঙ্ক্ষায় আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তিনটি বিষয় ছেড়ে দিয়েছিলাম এবং একটি সীমাবদ্ধ পাকিস্তান স্বীকার করে নিয়েছিলাম। আমরা স্বার্থহীন ভাবে কংগ্রেসের পায়ে সেই ত্যাগ স্বীকার করেছিলাম...আমাদের একটি খুব তিক্ত শিক্ষা হয়ে গেল...আজ পর্যন্ত এটাই তিক্ততম। আর মীমাংসার স্থান রইলো না। এবার

আমরা এগিয়ে যাবো।" ফিরদৌসীর কবিতা উদ্ধৃত করে জিন্না বললেন, "আপনারা যদি শান্তি চান আমরা যুদ্ধ চাইবো না—কিন্তু আপনারা যদি যুদ্ধ চান আমরা বিনা দ্বিধায় তাই গ্রহণ করবো।" (ইংরেজির অনুবাদ)

২৯শে জুলাইয়ের বক্তৃতায় জিন্না একটি সাংঘাতিক অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন, 'মন্ত্রী মিশনের স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের একটি গোপন চুক্তি হয়েছে যে, ১৬ই মের ঘোষণা পত্রের শর্তগুলি কংগ্রেস না মানলেও কংগ্রেস যদি শুধু এইটুকু বলে, আমরা ১৬ই মের ঘোষণা পত্র গ্রহণ করেছি তাহলে ব্রিটিশ সরকার কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি ডাকবার জন্য বড়লাটকে নির্দেশ দেবেন এবং অন্তবর্তী সরকারে কংগ্রেসকে যোগ দিতে আহ্বান জানাবেন।' লর্ড ওয়েভেল তাঁর দিন-পঞ্জী 'ওয়েভেল দি ভাইসরয়েজ জার্নালে' মোটামুটি এই অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেছেন। (বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে চুক্তির প্রয়োজনীয়তা ছিল এই কারণে যে, তিনি প্রথম থেকেই ১৬ই মে-র ঘোষণা-পত্র প্রত্যাখ্যানের দাবি জানিয়েছিলেন।)

১লা আগষ্ট জিন্না আবার বললেন, 'তিনটি বিষয় অর্থাৎ, বিদেশ বিভাগ, দেশরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়ে কেবল-মাত্র একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের পাকিস্তান মেনে নিয়ে আমরা চরম ত্যাগস্বীকার করেছিলাম কারণ, ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মঙ্গলের কথা ভেবে আমরা প্রভাবিত হয়েছিলাম, এবং ভেবেছিলাম, এইভাবে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে আমরা বিদেশীর দাসত্ব থেকে মুক্ত হবো এবং স্বাধীনতা লাভ করবো।' (ইংরেজির অনুবাদ)

কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হলো যে, তাঁরা ১৬ই মে-র ঘোষণা-পত্র গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা বললেন, তাঁরা কিছুই গ্রহণ করেন নি। শুধু কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে যাবেন এবং সার্বভৌম কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। এই দেখে ২৯শে জুলাই মুসলিম লীগ কাউন্সিল তাদের ৬ই জুনের প্রস্তাবে ঘোষিত মন্ত্রী-মিশন পরিকল্পনার অনুমোদন প্রত্যাহার করে নিলেন এবং ঠিক করলেন, পাকিস্তান আদায়ের জন্য এবার "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" আরম্ভ করতে হবে। জিন্না বললেন, "এতদিন আমরা নিয়মতান্ত্রিক পথে চলে এসেছি। এইবার আমরা নিয়মতান্ত্রিক পথকে 'গুড বাই' জানিয়ে দিলাম।" একথা অবশ্য ঠিক, ১৬ই মে-র ঘোষণা-পত্র মেনে নেবার সময়ে ৬ই জুনের প্রস্তাবে মুসলিম লীগ বলেছিলেন, এখনও তাঁদের লক্ষ্য রইল একটি সম্পূর্ণ সার্বভৌম পাকিস্তান এবং তাঁরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই অন্যান্য দলের সূত্রে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। তবে লক্ষ্যটি আশু লক্ষ্য হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, কারণ ১৬ই মে-র ঘোষণায় সে সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবার অবকাশ ছিল না। কিন্তু একথা

অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তখনকার মত মুসলিম লীগ একটি অবিভক্ত ভারতেই থাকতে রাজি ছিল এবং ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, বিদেশ বিভাগ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার শাসনভার ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছিল।

মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' পরিকল্পনা দেশে অভূতপূর্ব হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার রূপ নিলো। ১৬ই আগস্ট কলকাতার দাঙ্গায় উভয় সম্প্রদায়ের কয়েক হাজার লোক নিহত হলেন এবং অনেক বেশী সংখ্যক নিরাশ্রয় ও অন্যান্য প্রকারে উৎপীড়িত হলেন।

ওয়েভেল কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা দেখতে এলেন এবং সেখানে সব দেখে ও লোকের সঙ্গে কথা বলে তিনি শংকিত হয়ে উঠলেন এই ভেবে যে, এবার সারা ভারতময় এই ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে তাকে রোধ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। কলকাতাতেই মুসলিম লীগ নেতা ও জিন্নার বিশ্বস্ত অনুগামী খাজা নাজিমুদ্দিন ওয়েভেলের সঙ্গে দেখা করে বললেন যে, যদি মিশন-প্রস্তাব অনুযায়ী গ্রুপ-গঠনের নিদান কার্যকরী করা হয় তাহলে লীগের পক্ষে মিশন প্রস্তাব অনুযায়ী কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে যোগ দেওয়া সম্ভব হবে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াল রূপ প্রত্যক্ষ করে এবং লীগের পক্ষে মিশন-প্রস্তাবের পুনঃ সমর্থন লাভের সম্ভাবনা আছে বুঝতে পেরে দিল্লী পৌঁছেই ২৭শে আগষ্ট ওয়েভেল গান্ধীজী ও জওহরলালকে ডেকে পাঠিয়ে কাতরভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, লীগের সঙ্গে গ্রুপ-গঠনের প্রশ্নে বোঝাপড়া সম্ভব না হলে সারা ভারতবর্ষে রক্তবন্যা বইবে এবং কেউ তা রোধ করতে পারবে না।

কংগ্রেসের এবং বিশেষ করে গান্ধীজীর তখনও ধারণা ছিল এবং তিনি বারবার এই কথাই লিখছিলেন যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই—যেটুকু দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তা বৃটিশ রাজনীতির খেলা এবং তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ, ব্রিটিশ শক্তি একবার ভারত পরিত্যাগ করলেই হিন্দু-মুসলমানের সকল দ্বন্দ্বই নিমেষে অন্তর্ধান করবে। ১৯৪৬-এর ২৭শে জানুয়ারি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে লেখা এক চিঠিতে জওহরলাল জানিয়েছিলেন যে, ব্রিটিশ সরকার যদি ঘোষণা করেন যে, তাঁরা কোনোমতেই পাকিস্তানের দাবিকে আমল দেবেন না তাহলে লীগের আন্দোলন একেবারেই থেমে যাবে কারণ, মুসলিম লীগের নেতৃত্ব কোনো প্রকারে প্রকাশ্য আন্দোলন করবার বা কোনো প্রকার প্রকৃত সংকট সৃষ্টি করবার একেবারেই অনুপযুক্ত। তারা শুধুমাত্র দু-একটা শহরে সামান্য দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করতে পারে। গান্ধীজীর ও জওহর-লালের এই ধারণা যে কত ভ্রান্ত ওয়েভেল তা তাঁদের বারবার বোঝাবার চেষ্টা

করেও পারলেন না। ওয়েভেল বারবার গ্রুপ-গঠনের প্রস্তাবটি মেনে নেবার জন্য অনুরোধ করায় গান্ধীজী ও জওহরলালের কাছে যেন প্রতিভাত হোলো যে, ওয়েভেল মুসলিম লীগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন এবং এমন কি তিনিই হয়তো মুসলিম লীগকে গ্রুপ-গঠনের দাবিতে অটল থাকতে উস্কানি দিচ্ছেন।

এই সাক্ষাৎকারে ওয়েভেল বলেছিলেন যে, আইনবিদের ব্যাখ্যা দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। বাস্তবকে মেনে নিতে হবে এবং সেটা হচ্ছে এই যে, কংগ্রেস ও লীগের একটি সুষ্ঠু মীমাংসা না হলে ভারতে রক্তবন্যা বইবে। ওয়েভেলের দিনপঞ্জী 'ওয়েভেল দি ভাইসরয়েজ জার্নাল'-এর সম্পাদক পেণ্ডেরেল মুন লিখেছেন, ওয়েভেল বহুবার বলেছিলেন যে, তাঁর কথা শুনে গান্ধীজী নাকি সজোরে টেবিল চাপড়ে বলেছিলেনঃ 'ভারতের যদি রক্তস্নানের প্রয়োজন থাকে তাহলে তাই হবে।' (ইফ ইণ্ডিয়া নিড্স্ এ ব্লাড বাথ্ দেন শী শ্যাল হ্যাভ ইট।)

এই সাক্ষাৎকার থেকে ফিরে এসেই পরের দিন গান্ধীজী ওয়েভেলকে একটি চিঠি দেন, সেটিকে তাঁর চরমপত্র বলেও মনে করা যেতে পারে।

প্রিয় বন্ধু, ২৮.৮.৪৬

আমি বন্ধু হিসাবে এবং গভীর চিন্তার পর এই চিঠি লিখছি।

গতকাল সন্ধ্যায় আপনি বারবার উল্লেখ করেছিলেন যে, আপনি 'একজন সাধারণ মানুষ এবং সৈনিক' এবং আইনের ব্যাপার আপনি কিছু জানেন না। আমরা সকলেই সাধারণ মানুষ, যদিও আমরা সকলেই সৈনিক নই এবং যদিও আমাদের কেউ কেউ আইন জানেন। আমি ধরে নিচ্ছি যে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন কোন পন্থা খুঁজে বার করা যাতে কলকাতার ভয়াবহ ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি না ঘটে। আমাদের সম্মুখে প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ পথে তা সবচেয়ে ভালোভাবে করা যাবে।

গতকাল সন্ধ্যায় আপনার ভাষা ছিল ভীতিপ্রদর্শক। রাজার প্রতিনিধি হিসাবে আপনি শুধু সৈনিক হয়েই থাকতে পারেন না এবং আইনকে অগ্রাহ্যও করতে পারেন না। সেই আইন যা আপনারই নিজের তৈরি। আপনি ভয় দেখালেন যে, পণ্ডিত নেহরু ও আমার সামনে আপনি যে মীমাংসা সূত্রটি উপস্থাপিত করলেন, কংগ্রেস সেটি গ্রহণ না করলে আপনি কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি ডাকবেন না। ব্যাপার যদি সত্যিই তাহ হয় তাহলে আপনি ১২ই আগষ্ট যে ঘোষণাটি করেছিলেন—সেটি আপনার করা উচিত হয়নি। (এই ঘোষণায় ওয়েভেল কংগ্রেসকে তাঁর শাসন-পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন—লেখক) কিন্তু ঘোষণাটি যখন করা হয়ে গেছে তখন সেটিকে আপনি প্রত্যাহার করুন এবং আপনার পূর্ণ বিশ্বাসভাজন

অন্য একটি মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করুন। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য যদি ব্রিটিশ অস্ত্র এখনও রক্ষা করা হয়, তাহলে আপনার অন্তর্বর্তী সরকার একটি প্রহসনে পরিণত হবে। ব্রিটিশ অস্ত্রের সাহায্য নিয়ে ভারতের বিবাদরত পক্ষগুলির উপর নিজের অভিমত চাপিয়ে দেওয়া কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হবে না। সম্প্রতি বাংলায় যে পাশবিক প্রদর্শনী দেখা গেছে তার জন্য এটা আশা করা উচিত নয় যে, কংগ্রেস নিজেকে অবনমিত করে সেই পথ গ্রহণ করবে যাকে সে ভ্রান্ত বলে বিবেচনা করে। এই ধরনের আত্মসমর্পণ ঐ বীভৎসতার উৎসাহবর্ধক হবে এবং তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। উভয়পক্ষের প্রতিশোধমূলক মনোবৃত্তি আরও গভীর হয়ে সেই সুযোগের জন্য অপেক্ষা করবে, যখন সে অধিকতর ভয়াল লজ্জাকর রূপে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে। শক্তিশালী এবং শস্ত্র-গর্বিত বিদেশী শক্তির ভারতে ক্রমাগত অবস্থানই এর প্রধান কারণ।

আমি একথা হিন্দু হিসাবে বলছি না বা মুসলমান হিসাবেও বলছি না। আমি শুধুমাত্র একজন ভারতীয় হিসাবে এই চিঠি লিখছি। আমি যতদূর জানি, কংগ্রেস আপনি অথবা অন্য কোনো ইংরেজের চেয়ে হিন্দু-মানসিকতা এবং মুসলমান-মানসিকতা উভয়কেই ভালো জানার দাবি রাখেন। সেই হেতু, আপনি যদি কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে না পারেন তাহলে আপনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিচার করে দেখা উচিত, যেমনভাবে আমি ইঙ্গিত করলাম।

দয়া করে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কাছে আমার সমস্ত চিঠিটাই পাঠিয়ে দেবেন। (ইংরেজির অনুবাদ)

গান্ধীজী ও ওয়েভেলের প্রথম সাক্ষাৎকার থেকেই একজন অপরকে সুনজরে দেখতে পারেন নি। ৪৫-এর ১৫ই ডিসেম্বর দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে ওয়েভেল যখন বললেন যে, স্বাধীনতা লাভের জন্য হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটা ঐক্যমতের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি, তখন গান্ধীজী বললেন যে, তিনি একটি মীমাংসার জন্য বরাবর চেষ্টা করেছেন কিন্তু ব্রিটিশের 'ডিভাইড এণ্ড রুল' নীতির দরুণ সফল হতে পারেন নি। জবাবে ওয়েভেল বলেছিলেনঃ 'দিস্ ইজ ননসেন্স। আমরা দুই সম্প্রদায়ের মিলনের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করেছি, কিন্তু ১৯৩৭-৩৯-এ কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর নানান কাজে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মুসলমানরা ভাবতে আরম্ভ করেছে যে, কংগ্রেসের কাছে তারা সুবিচার পাবে না এবং সেই জন্যই মুসলিম লীগের অভ্যুত্থান এবং পাকিস্তানের দাবি জোরদার হয়েছে।' যখন ওয়েভেল বললেন যে, স্বাধীনতা লাভের পর ভারতকে দেশরক্ষা ও বাণিজ্যিক উন্নতির জন্য ব্রিটেনের

সহযোগিতা কামনা করতে হবে, তখন গান্ধীজী বললেন, ভারত তার বাণিজ্যিক উন্নতি নিজের পথেই করবে এবং দেশরক্ষার জন্য সে অহিংসার আত্মিক শক্তি প্রয়োগ করবে—সেই শক্তি একদিন সারা পৃথিবী জয় করবে এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। জবাবে ওয়েভেল বলেছিলেনঃ 'আপনার জীবদ্দশায় এই সাধু উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলে দেখতে পাওয়া যাবে না।'

এই প্রসঙ্গে গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। গান্ধীজী নিঃসন্দেহে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধানতম সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁরই পরিচালনায় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আগাগোড়া এগিয়ে চলেছে। তবুও কয়েকটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন।

এ ছাড়াও বলে রাখি, আমি গান্ধীজীর স্নেহের যোগ্য ছিলাম না, কিন্তু তবুও উনি আমার বাল্যকাল থেকেই আমাকে সবিশেষ স্নেহ করতেন। ১৯৩৫-এর জানুয়ারিতে যখন তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করতে যাই তখন আমার ন' বছর পূর্ণ হয় নি। কিন্তু সেই বালক অবস্থায় আমায় সেদিন আমার করণীয় সম্বন্ধে গান্ধীজী যা বলেছিলেন, আমি আজও তা ভুলিনি। ১৯৪৪-এ বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পাবার পর তাঁর অনশন-ভগ্ন শরীরে নানা জরুরী কাজ থাকা সত্ত্বেও আমার এক ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমাকে উপদেশ দিয়ে ১৬-১০-৪৪ তারিখে স্বহস্তে চিঠি লিখেছিলেনঃ "প্রিয় বিমলানন্দ, আমি তোমার বাবাকে ভালো করে চিনতাম। আমার মনে হয়, তোমার উচিত পরীক্ষায় পাশ করা এবং তোমার মাকে দেওয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করা। ব্রহ্মচর্যের চিন্তা করবার যথেষ্ট সময় পাবে। অনেক যুবক তাদের পবিত্র সংকল্প পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কেউ তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে না। তোমার আন্তরিকঃ ম. ক. গান্ধী।"

আরও দু-একবার তাঁর কাছে কোনো অনুরোধ করলে তিনি আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি।

কিন্তু আমাকে সত্য প্রকাশ করতে হবে এবং সত্য মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে বা পৃথিবীর যে-কোনা মহত্তম মানুষের চেয়েও বড়।

গান্ধী-যুগ কংগ্রেসে একটা বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। গান্ধী-যুগের আগে নেতারা আন্দোলন ইত্যাদি করতেন বটে, কিন্তু দেশের শাসনভার ইংরেজের হাত থেকে আমরা নিজেদের হাতে নিয়ে নেব—এই কথাটি অত পরিষ্কার করে কেউ বলতেন না। ১৯২৪-এর ৬ই নভেম্বর গান্ধীজী যখন চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরুর সঙ্গে চুক্তি করলেন এবং কাউন্সিল-প্রবেশ সমর্থন করলেন, তখন কংগ্রেসের লোকদের নিকট উদ্দেশ্যটা আরও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, স্বরাজ মানে ইংরেজের নিকট হতে ক্ষমতা-দখল। স্বাধীনতা আন্দোলন মানে হোলো, ক্ষমতা-দখলের আন্দোলন। স্বভাবতই রাজনীতিক-

দের মনে ধারণা জন্মে গেলো যে, অদূর বা দূর-ভবিষ্যতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানই ক্ষমতার আসনে বসবে এবং কাউন্সিল-এসেম্বলি ইত্যাদিতে কংগ্রেসের লোকেরাই বেশির ভাগ আসন দখল করবে। অতএব, যেন-তেন-প্রকারেণ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতা দখল করে রাখার একটা অন্ধ প্রতিযোগিতা প্রথম থেকেই আরম্ভ হয়ে যায় এবং যেমন বহু রাজনীতিক কর্মী তেমনি বহু রাজনীতিক নেতাও এই ক্ষমতা-দখলের আবর্তে জড়িয়ে পড়েন।

গায়ের জোরে কংগ্রেস অফিস দখলের প্রথাটি বাংলায় চিত্তরঞ্জনের আমল থেকেই আরম্ভ হয়। ১৯২৪-এর ৬ই নভেম্বরের গান্ধী-দাশ-নেহরু চুক্তির প্রতিবাদে বেঙ্গল নন-কো-অপারেশন লীগের নেতা শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, স্বর্গত মাখনলাল সেন ও শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রকাশ্য লিখিত বিবৃতিতে এই গায়ের জোরে কংগ্রেস অফিস দখলের প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯২৪—১৪ই ও ২০শে নভেম্বরের দি বেঙ্গলী দেখুন) ১৯২৪-এর জুলাই মাসে বিলাতের হাউস অফ লর্ডসে ভারত-সচিব শ্রমিক দলের লর্ড অলিভিয়ার অভিযোগ করেছিলেন যে, চিত্তরঞ্জন দাশ কাউন্সিলের ভোটে জিতবার জন্যে কাউন্সিলের অনেক সদস্যকে ভয় দেখিয়ে ভোট আদায় করতেন অথবা টাকা দিয়ে কারুর কারুর ভোট কিনতেন। সে অভিযোগ মিথ্যা ছিল না।

ব্যারিস্টার যোগেশ চৌধুরী ১৯২৫-এর ২২শে এপ্রিল 'দি বেঙ্গলী'তে বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেনঃ 'চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁর পার্শ্বচরেরা যে দুর্নীতির মন্দির প্রতিষ্ঠা করে গেলেন তাতে স্বরাজ সংগ্রামের গতি ব্যাহত হবে।'

সারা ভারতের বাৎসরিক কংগ্রেসে যে ডেলিগেট পাঠানো হোতো তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভোটের জালিয়াতি করা হোতো। আমি অমৃত পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে (৫ই আগস্ট, ১৯৭৭) আগে দেখিয়েছি, ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজী বলেছিলেনঃ 'এই কংগ্রেসে ডেলিগেট নির্বাচন পদ্ধতিটি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছিল। ডেলিগেটরা সকলেই ছিলেন স্ব-নির্বাচিত। এক টাকার ডেলিগেট টিকিট পনেরো টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল।'

১৯৩৯, ২৮শে জানুয়ারীর 'হরিজনে' গান্ধীজী লিখছেনঃ "কংগ্রেস সভ্যদের মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ সামলাতেই আমার এবং আমার সহকর্মী-দের বেশির ভাগ সময় চলে যায়! বোম্বাইয়ের একজন কংগ্রেস সভ্যের নিকট থেকে এই ধরনের সাম্প্রতিক চিঠিতে আছেঃ 'গত রবিবার বোম্বাইতে ত্রিপুরী কংগ্রেসের ডেলিগেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোলো। সকাল আটটায় ভোট আরম্ভ হবার কথা ছিল। আমি কংগ্রেস হাউসে পৌঁছালাম সকাল প্রায় ৮-৪৫-এ। কিন্তু সন্ত্রস্ত হয়ে গেলাম এই দেখে যে, মাত্র ৪৫ মিনিটের মধ্যে আমার হয়ে জাল ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। অসংখ্য আরও অনেক সভ্যের একই

অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমি এর উৎসটি খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগলাম এবং (যেমন আশাই করেছিলাম) দুষ্কৃতকারীকে খুঁজে বার করতে পারি নি, কিন্তু আমি জানতে পারলাম যে, ভোট আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে এই ভোট জালিয়াতির ব্যাপারটি সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত হয়েছিল এবং ব্যাপক হারে প্রযুক্ত হয়েছিল। স্বভাবতই যাঁরা আধ ঘণ্টা পরে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই হতাশ হয়ে যান এই দেখে যে, তাঁদের প্রত্যেকের হয়ে জাল ভোট দেওয়া হয়ে গেছে।'

এই লেখকের চিঠিটি উদ্ধৃত করবার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বোম্বাইতে কংগ্রেস নির্বাচনে জাল ভোটের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা নয়, চিঠিটি একটি সংকেত মাত্র। ভোটে জালিয়াতি ছাড়াও কংগ্রেস সভ্য তালিকায় আগাগোড়া কারচুপি করা হয় যাতে মিথ্যা নাম বহু থাকে।" (ইংরেজির অনুবাদ)

এই সময় বোম্বাই কংগ্রেসের একচ্ছত্র নায়ক ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। এবং ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর একটা বোঝাপড়ার প্রয়োজন ছিল। ওদিকে ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসের ডেলিগেট নির্বাচনে যখন কারচুপি হয়েছিল বলে স্বয়ং গান্ধীজী প্রকাশ্য অভিযোগ করেছিলেন, তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯৩৯-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর 'হরিজনে' গান্ধীজী আবার লিখলেনঃ 'হরিজনে আমার বিভিন্ন লেখা প্রমাণ করেছে যে, কংগ্রেস দ্রুত একটি দুর্নীতিপূর্ণ সংগঠনে পরিণত হচ্ছে এই অর্থে যে, এর সভ্য তালিকায় অত্যন্ত বেশি সংখ্যক ভুয়া সদস্যের নাম থাকে।' (ইংরেজির অনুবাদ)

কংগ্রেসে গান্ধী-যুগ শুরু হবার পর সাধারণের দানের টাকা নিয়ে কি রকম ছিনিমিনি খেলা হোতো সে নিয়ে গান্ধীজী প্রবর্তিত তিলক স্বরাজ ফান্ড সম্বন্ধে 'দি বেঙ্গলী' লিখেছিলেনঃ "ইয়ং ইণ্ডিয়ার বর্তমান সংখ্যায় তিলক স্বরাজ ফান্ডের পরিচালনা সম্পর্কে মিঃ গান্ধীর মন্তব্য আমাদের এই ধারণায় প্ররোচিত করেছে যে, 'হিমালয় সদৃশ ভ্রান্তির' গান্ধী বিলুপ্ত হয়েছেন এবং তার বদলে স্থান নিয়েছেন এক উৎসাহব্যঞ্জক ভ্রান্তিহীনতার গান্ধী। 'তিলক স্বরাজ ফান্ডের' কাহিনী কে না জানে? বাংলায় আসলে প্রায় ছ' লক্ষ টাকা তোলা হয়েছিল, যদিও ঘোষণা করা হয়েছিল যে, পঁচিশ লক্ষ টাকা তোলা হয়েছে। এই বিপুল অঙ্কের নগদ টাকা কিভাবে যে উবে গেল সেইটাই একটি রহস্য। ১৯২১-এ আসাম-বেঙ্গল রেল ধর্মঘটের খরচের জন্য ফান্ড থেকে প্রথম বড় অঙ্কের টাকা খরচ করা হয়েছিল। যে সব টাকা আগাম দেওয়া হয়েছিল সেগুলি হিসাবের তালিকায় মোট অঙ্কে দেখানো হয়েছিল, খরচের খুচরো হিসাব তাতে ছিল না। বাংলার জনসাধারণের দানের এই টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ফলে অচিরেই ফান্ড নিঃশেষ হয়ে যায় এবং

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে অবশ্য দেয় কোটা দেওয়া যায় নি। অন্যান্য প্রদেশগুলির কৃপা বাংলাকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় অংশ গ্রহণের অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়া থেকে বাঁচিয়েছিল। ঘটনাবলীর এই নিতান্ত আপত্তিজনক অবস্থার জন্য মিঃ গান্ধী যদি দুঃখিত না হন তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, পুরাতন গান্ধী ভ্রান্তি স্বীকারে ভীত এক মর্যাদাবন্ধ আমলায় পরিণত হয়েছেন।" (২৭.২.২৭—ইংরেজির অনুবাদ)

এ সম্বন্ধে ৪।১।২৭ তারিখে স্টেটসম্যান লিখেছিলঃ "কেশরী পত্রিকায় জনৈক লেখক তিলক স্বরাজ ফান্ডের প্রথম তিন বছরের হিসাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার থেকে দেখা যাবে যে, ১৯২৩-এর শেষ পর্যন্ত বিশেষ কার্যক্রম ফান্ডের (স্পেসিফিক পারপাসেস্ ফান্ড) পরিমাণ ছিল ৫৩,৮৮,৫৮৩ টাকা। কিন্তু অডিটর মন্তব্য করেছেন যে, বিশেষ বিশেষ কার্যক্রমের আর্থিক অবস্থা এবং অগ্রগতি সম্বন্ধে কোনো সংবাদ তাঁর পক্ষে সর্বশেষ রিপোর্টে দেওয়া যায় নি। এছাড়া ১৯২৫ পর্যন্ত জেনারেল ফান্ডে ৭১ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছিল। সেই মোট অঙ্ক থেকে ৯½ লক্ষ টাকা জাতীয় শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল, ১১ লক্ষ টাকা জাতীয় কর্মীদের 'এডভান্স' হিসাবে দেওয়া হয়েছিল, ৩ লক্ষ টাকা 'পারিশ্রমিক' হিসাবে দেওয়া হয়েছিল এবং ২৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল খদ্দরের জন্য। শেষের এই বিষয়টির সম্বন্ধে অডিটর মন্তব্য করেছেন যে, বিভিন্ন স্থানীয় খাদি বোর্ডকে আগাম দেওয়া টাকায় একটা বিরাট অংশ 'প্রদর্শিত সম্পত্তি'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় নি (ইজ নট রিপ্রেজেন্টেড বাই এভেলেবল এসেটস)। ১৯২১-এ ঘোষণা করা হয়েছিল যে, বাংলা ফান্ডে তিরিশ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছে, কিন্তু পুনর্বিবেচনায় তিরিশ লক্ষ কমে গিয়ে তিন লক্ষে দাঁড়িয়েছিল।" (ইংরেজির অনুবাদ)

ওদিকে ২৪.২.২৭-এর 'ইয়ং ইন্ডিয়াতে' গান্ধীজী লিখেছিলেনঃ তিলক স্বরাজ ফান্ডের পরিচালনায় এমন কোনো আর্থিক ক্ষতি হয়নি যা খুব সতর্ক ব্যবসায়ীর পক্ষে যা হয় তার চেয়ে বেশি। সামান্য যা ক্ষতি হয়েছে তা অবহেলাপ্রসূত নয়, বরং খুব সতর্ক পর্যালোচনা ও হিসাবপরীক্ষা সত্ত্বেও তা হয়েছে। আমি এমন কোনো প্রতিষ্ঠানের কথা জানি না, যাতে কোনো অসাধু প্রতিনিধি নেই। কংগ্রেসও এই ব্যাপারে ব্যতিক্রম নয়। এই ফান্ড শুরু করেছিলাম বলে আমার বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই এবং এর ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধেও আমার বিবেক সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার। ফান্ড একটি বিরাট জাতীয় অভীষ্টকে পূর্ণ করেছে। যে বিরাট সংগঠন অকস্মাৎ সৃষ্টি হয়েছিল, তা হতে পারতো না যদি এই বিরাট জাতীয় কোষ সৃষ্টি না হোতো, যে কোষে ধনী-নির্ধন উভয়েই প্রচুর অনুদান দিয়েছিল।' (ইংরেজির অনুবাদ)

অসহযোগের যুগ থেকেই কংগ্রেসে দুর্নীতির যে দুষ্ট ক্ষত দেখা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে সতর্ক হতে কংগ্রেস নেতাদের ডাক দিয়েছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। সেই সূত্রে গান্ধীজী, মতিলাল নেহরু এবং চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়। তিনি বলেছিলেন, এই সব দুর্নীতির রন্ধ্রপথ এখন থেকে বন্ধ না করলে, কালে কালে এর বিপুল বন্যা দেশকে ভাসিয়ে দেবে এবং তখন একে রোধ করবার কোনো উপায় থাকবে না। চিত্তরঞ্জন তাঁকে বলেছিলেনঃ 'শুধু সাধু লোক নিয়ে রাজনীতি করা যায় না—দুষ্টু লোকেরও প্রয়োজন থাকে।' জবাবে বীরেন্দ্রনাথ বলেছিলেনঃ 'আপনি নীলকণ্ঠ—এই বিষ কণ্ঠে ধারণ করবার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু আপনার অবর্তমানে সারা দেশ এই বিষে জর্জরিত হবে। তখন কিছু করবার উপায় থাকবে না।' (এর কোনো ছাপানো প্রমাণ নেই—কিন্তু আমি নিজে বীরেন্দ্রনাথের নিজের হাতে লেখায় এর উল্লেখ দেখেছি।)

কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন বলেও বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সকল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীর কাছে ও সাধারণভাবে বাঙালীর কাছে বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। কিন্তু সারা ভারতের নেতা ও কর্মীরা সেই জন্যই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। সরোজিনী নাইডু তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলিতে বলেছিলেনঃ 'দেশপ্রাণ শাসমলের ঋজু ও অকুতোভয় অন্তঃকরণ অসত্যের সঙ্গে আপোষ করতে ঘৃণা করতো। তিনি কলুষ স্পর্শহীন হয়ে চিরদিন দাঁড়িয়েছিলেন সেই আদর্শটির জন্য যা তিনি ভালবাসতেন ও অনুসরণ করতেন—ভারতবাসীর স্বাধীনতা।' তাঁর মৃত্যুর পর লন্ডন থেকে ইণ্ডিয়া লীগের নেতা ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সদস্য লেনার্ড ম্যাটারস্ তাঁর শোক-বার্তায় বলেছিলেনঃ 'মিঃ শাসমলের চরিত্রের সত্যবাদিতার জন্য সরকারী কর্মচারী ও পুলিশ অফিসাররাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতো।' অসত্যের সঙ্গে কখনও আপোষ করেন নি বলেই বীরেন্দ্রনাথ বলেছিলেনঃ 'আমি যে শির জীবনে কাহারও নিকট নত করি নাই, মরণের পরেও তাহা যেন অবনত না করা হয়। আমাকে যেন ঊর্ধ্বশিরে দাহ করা হয়।'

কিন্তু দুঃখের বিষয়, গান্ধীজী 'হরিজনে' দু'-এক কলম লেখা ছাড়া কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি শোধন করবার কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা করতে পারেন নি। সেই কারণে কংগ্রেসের এই আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দিনের পর দিন বেড়েই গেছে। এমন কি নিজের প্রিয়পাত্রদের ক্ষমতার আসনে বসাবার জন্য গান্ধীজী দুর্নীতি এবং অসত্যের সঙ্গে আপোস করতেও পশ্চাৎপদ হলেন না। ১৯৩৪-এ কলকাতা করপোরেশনের মেয়র নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি এই ধরনের দুর্বলতা দেখিয়েছিলেন। করপোরেশনের কংগ্রেস দলের সংখ্যাধিক সদস্য ফজলুল হককে মেয়র করতে চাইলেন—সংখ্যাল্প

সদস্যরা সরকার মনোনীত সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে চাইলেন নলিনী সরকারকে। কংগ্রেসী কাউন্সিলররা সরকার মনোনীত কাউন্সিলরদের সঙ্গে যোগ দিলে সেটা কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু ছিল না। সংখ্যাধিক কাউন্সিলরদের নেতা হিসাবে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল গান্ধীজীকে আহ্বান করলেন, তিনি যেন কলকাতা করপোরেশনের কিছু সংখ্যক কংগ্রেসী কাউন্সিলারদের কংগ্রেসের প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতার নিন্দা করেন। কিন্তু নলিনী সরকার গান্ধীজীর প্রিয়পাত্র। টাকার ক্ষমতায় আসীন নলিনী সরকার গান্ধীজীর প্রিয়পাত্র। টাকার ক্ষমতায় আসীন নলিনী সরকার বাংলার গভর্নর স্যার জন এন্ডারসনের প্রিয়পাত্র, আবার স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীরও প্রিয়পাত্র। বীরেন্দ্রনাথ সেদিন তারযোগে গান্ধীজীকে জানিয়েছিলেনঃ 'গান্ধী-আদর্শে বিশ্বাসীরা আপনার নিকট চাটুকারিতা বা নালিশ করবে না। ভগবানের দোহাই, গোপন ধরাধরির ঊর্ধ্বে উঠুন। কংগ্রেসীরা যদি অকংগ্রেসীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যায় বা কংগ্রেসীরা কংগ্রেসের হিন্দু-মুসলমান মিলনের আদর্শে পদাঘাত করে, তাহলে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা নেতার কর্তব্য। অস্বীকৃতি অথবা উদাসীনতার অর্থ হবে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া। বাংলা হয়ত কখনও ক্ষমা করবে না।'

বীরেন্দ্রনাথের অনুরোধের জবাবে গান্ধীজী জানিয়েছিলেনঃ 'অপর দল (অর্থাৎ নলিনী বাবুর দল-লেখক) অনুরোধ না করলে আমি হস্তক্ষেপ করতে সাহস করি না।' (ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট—৩০.৬.৩৪, ইংরেজির অনুবাদ)

কিন্তু ব্যাপারটি এতখানি ক্ষোভের হয়েছিল যে, স্বয়ং জওহরলাল নেহরু '৩৪-এর ১৪ আগষ্ট তীব্রভাষায় একটি চিঠি লিখলেন গান্ধীজীকে। তিনি লিখেছিলেনঃ "এই সেই নলিনী সরকার, আমরা যখন জেলে ছিলাম তখন যিনি ভারত সরকারের হোম মেম্বার ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীকে নিমন্ত্রণ করে পরিচর্যা করতেন। বাংলায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি নলিনী সরকারের সামাজিক উন্নতির সোপান হিসাবে কাজ করছে। শুধু একা বাংলায় নয়, সর্বত্রই এই ধরনের লোকের হাতেই কংগ্রেসের কতৃত্ব চলে গেছে।...কংগ্রেস অতি দ্রুত কলকাতা করপোরেশনের মত একটি লজ্জাকর রঙ্গমঞ্চের পরিবর্ধিত সংস্করণে পরিণত হচ্ছে।

যাঁরা নানা ঝঞ্ঝা-আবর্তের মধ্যেও জাতীয় পতাকা তুলে ধরে রেখেছিলেন, তাঁদের অনেককেই আজ কংগ্রেসের মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। যাঁরা নিজের হাতে জাতীয় পতাকা টেনে নামিয়েছিলেন তাঁরাই এখন কংগ্রেস মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। কংগ্রেসের আদর্শবাদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এর উপর থেকে নিচ পর্যন্ত শুধু দলবাজি।" ('এ বাণ্ড অফ ওল্ড লেটার্স' থেকে ইংরেজির অনুবাদ)

কেউ কেউ বলেন, জওহরলালের এই চিঠি পাবার পরই গান্ধীজী কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—গান্ধীজী নিজে অবশ্য তা অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এই চিঠি যে ১৯৩৪-এর অক্টোবরে গান্ধীজীকে কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগে অনেকটা প্রভাবিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে গান্ধীজী কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতির সঙ্গে মোকাবিলার দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেইসব দুর্নীতির প্রতিবিধান আর করা যায় নি।

জিন্নার প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ যে, দুর্নীতিহীন ছিল বা মুসলিম লীগে গুণ্ডা ছিল না, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু জিন্না বলেছিলেন, কংগ্রেসী গুণ্ডামির কাছে মুসলিম লীগের গুণ্ডামি বিফল হবে।

গান্ধীজীকে বুদ্ধ এবং যিশুখৃষ্টের সঙ্গে তুলনা করা হয় বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন একজন নির্ভেজাল রাজনীতিক। সত্যকার রাজনীতিকের যা প্রধান উদ্দেশ্য থাকে অর্থাৎ ক্ষমতা দখল, তিনি কখনই তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতির ব্যাপারেও তিনি কার্যকরী কিছু করবার চেষ্টা করেন নি এই কারণে যে, তিনি জানতেন এ নিয়ে বেশি চাপাচাপি করলে কংগ্রেস ভেঙে যাবে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য তাঁর তৈরি যন্ত্রটি তিনি আর ব্যবহার করতে পারবেন না।

কংগ্রেস ও লীগের দ্বন্দ্ব

আশু স্বাধীনতা লাভ করবার পর ভারতের শাসন ক্ষমতা তাঁর প্রিয়পাত্রদের হাতেই ন্যস্ত হোক গান্ধীজী এইটাই পরিষ্কার করে নিতে চাইলেন এবং তার প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালো মুসলিম লীগ। কংগ্রেস ও লীগের প্রধান দ্বন্দ্বটি লাগলো এইখানেই। হিন্দুরা চাইলেন প্রধান ক্ষমতা যেন তাঁদের হাতে থাকে, মুসলমান তাই ভেবে শঙ্কিত হলেন। কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলির নির্বাচনে ৭৯টি মুসলমান আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিলেন মাত্র ৩টি, কাজেই মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করবার দাবি কংগ্রেসের পক্ষে অচল হয়ে গেল। মুসলমানরা চাইলেন ভারতের যেখানে যেখানে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে যেন তাঁদের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। জিন্না দেখলেন, মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলিকে নিয়ে গ্রুপ গঠন করা হলে এবং মাত্র তিনটি বিষয়ে ও আনুষাঙ্গিক আর্থিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব থাকলে তাঁর ভয়ের কোনো কারণ নেই। কিন্তু গান্ধীজী ও জওহরলাল তাঁর সেই আশায় বাদ সাধলেন। তাঁরা গ্রুপ-গঠনের ভিত্তিই অস্বীকার করলেন এবং বললেন যে, কোনো প্রদেশকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো গ্রুপে যোগ দিতে বাধ্য করা চলবে না। কংগ্রেসের যুক্তি হোলো—হিন্দুপ্রধান গ্রুপে মুসলমান সংখ্যাল্প হয়ে থাকলে কোনো দোষ নেই, কিন্তু মুসলমান-প্রধান গ্রুপে হিন্দু বা শিখ যেন কিছুতেই সংখ্যাল্প হয়ে না থাকে।

এই সময়ে কেন্দ্রে অন্তবর্তী সরকার গঠনের পালা এসে গেল। তার বিস্তৃত ইতিহাস এখানে লেখা অতিরিক্ত। প্রথমে কংগ্রেস অন্তবর্তী সরকারে যেতে রাজি হয়নি। কিন্তু জিন্না ৬ই জুন মন্ত্রী-মিশন প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন বলে আশা করেছিলেন যে, মুসলিম লীগ অন্তবর্তী সরকারে যাবে—কংগ্রেস যাবে না। কংগ্রেস নেতারা পরে মত পরিবর্তন করে ২রা সেপ্টেম্বর অন্তবর্তী সরকারে গেলেন। মুসলিম লীগ ২৯শে জুলাই মন্ত্রী-মিশন প্রস্তাবের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলো বটে, কিন্তু ২৬শে অক্টোবর অন্তবর্তী সরকারে যোগ দিলো। মুসলিম লীগের লিয়াকৎ আলি খাঁ অর্থমন্ত্রী হয়ে বড় ব্যবসায়ীদের আয়ের উপর শতকরা ৩৭½ ভাগ বিজনেস প্রফিটস্ ট্যাক্স বসালেন। বিড়লা ও অন্যান্য বড় ব্যবসায়ীর অনুরোধে জওহরলাল লিয়াকৎকে ধরলেন ট্যাক্সের হারটা কমাতে। লিয়াকৎ রাজি হলেন না। তখন জওহরলাল ঐ ওয়েভেলকে ধরলেন, লিয়াকৎকে বলে ট্যাক্সের হার কমিয়ে দিন। এইভাবে অন্তবর্তী

সরকারেও কংগ্রেস এবং লীগের দ্বন্দ্ব গভীর হয়ে উঠলো। জওহরলাল অভিযোগ করলেন লীগ অন্তবর্তী সরকারের 'কিংস পার্টি' বা বিলাতের রাজার পক্ষ হয়ে কাজ করছে। জিন্না তার জবাবে বললেন যে, ওয়েভেলের শাসন-পরিষদে সভ্যপদ গ্রহণ করবার আগে জওহরলাল নিজেই প্রথমে বিলাতের রাজার কাছে আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন।

ওদিকে ১৬ই আগস্ট কলকাতার দাঙ্গার পর প্রায় সমগ্র ভারতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গেল। কলকাতার প্রভাব পড়লো নোয়াখালিতে—নোয়াখালির প্রভাব বিহারে। এই সাম্প্রদায়িক আগুনের লেলিহান শিখা কিছুতেই দমন করা যাচ্ছে না দেখে একটি সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ব্রিটিশ সরকার জওহরলাল নেহরু, বলদেব সিং, লিয়াকৎ আলি খাঁ, জিন্না ও ওয়েভেলকে আলোচনার জন্য লণ্ডনে ডেকে পাঠালেন। সেখানে আলোচনায় কংগ্রেস ও লীগনেতাদের মধ্যে কোনো মীমাংসা সম্ভব হোলো না। কিন্তু ৬ই ডিসেম্বর ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করলেন যে, গ্রুপে যোগদান সম্বন্ধে মন্ত্রী-মিশন প্রস্তাবের যে ব্যাখ্যা মুসলিম লীগ করেছে সেইটাই সঠিক ব্যাখ্যা অর্থাৎ প্রদেশগুলি প্রথম অবস্থায় গ্রুপে যোগদান করতে বাধ্য থাকবে, কিন্তু নতুন সংবিধান অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হবার পর কোনো বিশেষ প্রদেশ কোনো গ্রুপ থেকে নিজ এসেম্বলির সংখ্যাধিক ভোটে সিদ্ধান্ত নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। ব্রিটিশ সরকার অবশ্য আশা করলেন যে, এই ব্যাপারে ফেডারেল কোর্টের অভিমতও গ্রহণ করা যেতে পারে। কংগ্রেস ফেডারেল কোর্টে যেতে রাজি হোলো কিন্তু বললো যে, ব্রিটিশ সরকার মন্ত্রী-মিশন প্রস্তাবের যে ব্যাখ্যা করেছে সেই ব্যাখ্যা করে মূল প্রস্তাব থেকে অনেকখানি সরে দাঁড়ানো হয়েছে।

এই অবস্থায় কংগ্রেস ও লীগের মিলন আকাশকুসুম হয়ে রইলো এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রকৃত রূপটি অমীমাংসিত অবস্থায় ঝুলতে লাগলো। কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে লীগ কিছুতেই যেতে রাজি হোলো না। জিন্না বারবার বললেন যে, কংগ্রেস মন্ত্রী-মিশন প্রস্তাবের মূল ভিত্তিই স্বীকার করেনি এবং একথাও বলেছে যে, কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি ইচ্ছা করলে সকল প্রস্তাবের রদবদল করতে পারে—এবং মিশন প্রস্তাবও বাতিল করে দিতে পারে, অতএব লীগের পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা বা কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে যোগদানের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। **জিন্না বললেন, মীমাংসার সবচেয়ে উত্তম পথ হচ্ছে ভারতকে হিন্দুস্থান এবং পাকিস্থান দুটি স্বাধীন গভর্ণমেণ্টে ভাগ করে দেওয়া।**

লণ্ডন থেকে ফেরবার সময়ে জিন্না একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন যে, কংগ্রেস যদি নিঃশর্তভাবে ১৬ই মে-র ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে

তাহলেই তিনি লীগ কাউন্সিল ডেকে কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে লীগের যোগদানের কথা বিবেচনা করতে বলবেন, নচেৎ নয়।

এই সময়ে গান্ধীজী নোয়াখালিতে পদযাত্রা করে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির চেষ্টা করছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণার পর তিনি যা ঘোষণা করলেন তাতে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের মিলনের সম্ভাবনা প্রায় তিরোহিত হয়ে গেল। ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণায় ব্রিটিশ সরকার বলেছিলেন যে, গ্রুপ-গঠন সম্বন্ধে মুসলিম লীগের ব্যাখ্যাই ঠিক অর্থাৎ নতুন সংবিধানের আওতায় প্রথম সাধারণ নির্বাচনের আগে ঘোষণা-পত্র অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশকে নির্ধারিত গ্রুপে বসতেই হবে, ইচ্ছা করলে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর কোনো প্রদেশ কোনো গ্রুপ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারে। এই ব্যাখ্যায় আসামকে বাংলার সঙ্গে এক গ্রুপে যোগদান করতে বাধ্য হতে হোতো।

আসামের কয়েকজন কংগ্রেস নেতা আসাম মুখ্যমন্ত্রীর তরফে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর নির্দেশ প্রার্থনা করলেন। গান্ধীজী আসামের নেতাদের পরিষ্কার বললেনঃ আপনারা কিছুতেই বাংলার সঙ্গে এক সেকশনে যোগ দেবেন না। বাংলা আসামের ওপর কর্তৃত্ব করবে এটা অসহনীয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কি নির্দেশ দেবেন জানি না, যদি কোনো কিছু না বলেন, তাহলে আপনাদের উচিত হবে কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি বয়কট করা। জোর করে আপনাদের কিছুতেই সেকশনে বসতে বাধ্য করা চলবে না। শিখদেরও তাই করা উচিত। আসাম এইভাবে সারা ভারতকে পথ দেখাবে।

'মুসলিম লীগ কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি বয়কট করে উচিত কাজই করেছে। মুসলিম লীগই ঠিক পথে চলেছে। আপনাদেরও ওই পথে যেতে হবে। কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি থেকে আপনারা বেরিয়ে আসুন। দরকার হলে আপনাদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হবে।

আসামের নেতারা বললেনঃ 'আপনার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াবো।'

গান্ধীজী বললেনঃ 'ভগবানের আশীর্বাদ নেবেন।' (দি স্টেটসম্যান—২১.১২.৪৬ ইংরেজির অনুবাদ)

ওয়েভেল যখন দেখলেন যে, কংগ্রেস মন্ত্রী-মিশন ঘোষণার একরকম ব্যাখ্যা করেছে, কিন্তু লীগ করেছে অন্যরকম ব্যাখ্যা এবং দুই দলের ব্যাখ্যার পার্থক্য এত বেশি যে, কংগ্রেস-লীগের মিতালির সম্ভাবনা প্রায় অসম্ভব, তখনই তিনি একটি পরিকল্পনা করে ফেলেছিলেন যে, ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যেই ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মীমাংসা না হওয়ায় শুধু কংগ্রেস-

শাসিত প্রদেশগুলিকে আগে স্বাধীন করে দেওয়া হবে এবং মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলিতে এখনকার মত ব্রিটিশ শাসনই চলবে, পরে সুযোগমত এদের স্বাধীন করবার ব্যবস্থা হবে। ওয়েভেলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এইভাবে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও ভয়াবহ রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হবে। ওয়েভেল মুসলিম লীগের দাবিগুলিকে জোরদার করতে সাহায্য করেছিলেন একথা সত্য হলেও, তিনি আগাগোড়া প্রাণপণ শক্তিতে ভারতবিভাগের বিরোধিতা করে গেছেন। ৪৬-এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের সম্মেলনের সময়ে শেষ বিকল্প হিসাবে যখন ভারতবিভাগের কথা ওঠে, তখনও ওয়েভেল প্রচণ্ডভাবে এর বিরোধিতা করেছিলেন। ওয়েভেলের 'ব্রেকডাউন প্ল্যান' কিছু ভারতীয় নেতার কাছে এবং সম্ভবত ব্রিটিশ সরকারের কাছেও ওয়েভেলকে যেন ভারতের স্বাধীনতার বিরোধী বলে প্রতিভাত করলো। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সরকার যে ঘোষণা করলেন সেটা অনেকটা ওয়েভেলের 'ব্রেকডাউন প্ল্যানের' অনুরূপ। এই ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যদি কোনো মীমাংসা একেবারেই সম্ভব না হয় তাহলে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারত ছেড়ে চলে যাবে।

ব্রিটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণা সম্বন্ধে ৬ই জানুয়ারি (১৯৪৭) দিল্লী অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাব নিলেনঃ 'এ-আই-সি-সির দৃঢ় অভিমত হচ্ছে যে, স্বাধীন ও সার্বভৌম ভারতের সংবিধান যতটা সম্ভব ভারতবাসীদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে রচিত হওয়া উচিত। বাইরের কোনো শক্তির দ্বারা এতে কোনো হস্তক্ষেপ থাকা উচিত নয় এবং এক প্রদেশের দ্বারা অন্য প্রদেশের বা প্রদেশের অংশ বিশেষের উপর কোনো বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ৪৬-এর ১৬ই মে-র ঘোষণাতে আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের শিখদের জন্য যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করা হয়েছে বলে এ-আই-সি-সি হৃদয়ঙ্গম করেছে। সম্প্রতি ৪৬-এর ৬ই ডিসেম্বর ব্যাখ্যায় এটি আরও বেশি করে করা হয়েছে।...এ-আই-সি-সি সরকারের ৪৬-এর ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণা মেনে নিচ্ছে বটে, কিন্তু এই ব্যাপারে কোনো প্রদেশের উপর কোনো বাধ্যবাধকতা থাকতে পারবে না এবং পাঞ্জাবে শিখদের অধিকার কোনো প্রকারে খর্ব করা চলবে না। যদি বাধ্যতামূলক কিছু করাবার চেষ্টা করা হয়, তাহলে স্বীয় অধিবাসীদের ইচ্ছাকে কার্যকরী করে তোলবার জন্য যে কোনো কর্মপন্থা গ্রহণ করবার অধিকার কোনো প্রদেশের অংশবিশেষের রইল। (ইংরেজির অনুবাদ)

এর জবাবে ৩১শে জানুয়ারি মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব নিলেন যে, কোনো প্রদেশকে বা প্রদেশের অংশ বিশেষকে (এটি একটি নতুন শর্ত) গ্রুপ-গঠনের ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেবার স্বাধীনতা দেওয়ায় কংগ্রেসের দ্বারা মন্ত্রী-মিশনের ১৬ই মে, ৪৬-এর ঘোষণা পত্র এবং ৬ই ডিসেম্বর, ৪৬-এর ব্যাখ্যা কোনোটাই সত্যভাবে গৃহীত হয়নি এবং সেই হেতু অবস্থার কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় লীগ কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে যোগ দেবে না এবং পাকিস্তানের দাবিতে অটল থাকবে। তাঁরা চাইলেন, 'কনস্টি-টিউয়েণ্ট এসেম্বলি ভেঙে হেওয়া হোক ও ভারত-বিভাগের ব্যবস্থা করা হোক।'—কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি সেশনগুলির ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হোলো।

ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতে ফিরেই জিন্না সারা ভারতের মুসল-মানদের ডাক দিলেনঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বস্ব দান করতে হবে। তাঁর ডাকে পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ পাঞ্জাবে একটি 'প্যারালেল গভর্ণমেণ্ট' গঠন করবেন বলে ঘোষণা করলেন। তাঁরা একটি 'জাতীয় ভাণ্ডার' স্থাপন করলেন যাতে প্রত্যেক মুসলমান ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠান লাভের টাকার তিন পাই, কর্মচারীরা বছরে একদিনের মাইনে এবং সেনা বিভাগ ও সরকারী কর্মচারীরাও বছরে একদিনের মাইনে দান করবেন বলে নির্দেশ দেওয়া হোলো। এই 'প্যারালেল গভর্ণমেণ্ট' পাঞ্জাবের মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলিতে ট্যাক্স ও খাজনা ধার্য করবেন বলেও ঠিক করলেন।

৪৭-এর ২৪শে জানুয়ারি পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট পাঞ্জাব মুসলিম লীগের ৭ জন খ্যাতনামা নেতা—মিঁয়া ইফতিকারুদ্দিন, ফিরোজ খাঁ নুন, সৌকৎ হায়াৎ খাঁ, মামদোতের নবাব, বেগম শানওয়াজ এবং আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করলেন এবং পাঞ্জাবের মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডকে বে-আইনী সংগঠন বলে ঘোষণা করলেন। ওদিকে ৮ই জানুয়ারী আসাম মুসলিম লীগ আসাম গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করবেন বলে ঘোষণা করলেন।

পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের এই 'প্যারালেল গভর্ণমেণ্ট' নিয়ে প্রচণ্ড দাঙ্গা সুরু হয়ে গেল। একদিকে মুসলমান, অন্যদিকে হিন্দু ও শিখ। এই দাঙ্গা ক্রমশঃ সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়লো। ওয়েভেল গান্ধীজীকে যে রক্তবন্যার ভয় দেখিয়েছিলেন সেই রক্তবন্যা বুঝি সত্যি সত্যিই এসে গেল।

১৯৪৭-এর ২০শে ফেব্রুয়ারির ঘোষণায় ব্রিটিশ সরকার আরও একটি কাজ করলেন যার ফলে এই রক্তবন্যার গতি সম্ভবত বেড়ে গেল। এই ঘোষণায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কয়েক দিনের নোটিশে ওয়েভেলকে বড়লাটের পদ থেকে

বরখাস্ত করলেন এবং তাঁর জায়গায় নিয়োগ করলেন লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনকে।

এর বহু আগে থেকেই কংগ্রেস নেতারা বিলাতের শ্রমিক সরকারের কাছে দরবার করছিলেন যে, ওয়েভেলকে অপসারণ না করলে কংগ্রেস-লীগে কোনো-দিন মিলন সম্ভবপর হবে না। বিলাতের শ্রমিক সরকারে কাছে কংগ্রেস নেতাদের বক্তব্য ছিল যে, ওয়েভেল কংগ্রেসের শত্রু এবং অন্তরে অন্তরে ভারতের স্বাধীনতার বিরোধী।

এ ব্যাপারে ওয়েভেলের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল তখন, যখন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির অফিস থেকে বিলাতে সরকারের বড় কর্তাদের নিকট লেখা তাঁর গোপন চিঠিপত্র সেই অফিসের একজন ভারতীয় স্টেনোগ্রাফার অন্তবর্তী সরকারের কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কাছে পাচার করে দেয়। যে বিশেষ চিঠিটি নিয়ে কংগ্রেস নেতারা ও ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার প্রধান সদস্যরা ওয়েভেলের উপর বিরূপ হয়ে ওঠেন, আমার মনে হয় সেটা ১৯৪৬-এর ৮ই জুলাই রাজা ষষ্ঠ জর্জকে লেখা ওয়েভেলের গোপন চিঠি।

এই চিঠিতে তিনি গান্ধীজী সম্বন্ধে লিখেছিলেনঃ "গান্ধী তাঁর স্বভাব-মতই নিজের পথে চলেছিলেন। তাঁর প্রভাব এখনও যথেষ্ট আছে, তাঁর চিন্তাধারা এবং কর্মবিধি চিরদিনের মতই অননুমেয়; তিনি এমন ধরনের বক্তব্য রাখেন, যার ভাষা এমন শূন্যগর্ভ অথচ এমন অর্থবোধক, যা পরে প্রয়োজনমত যে ভাবে ব্যবহার করলে তাঁর সুবিধা হয় সেইভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু যতটা দু-মুখো তিনি হউন না কেন, একটি লক্ষ্যে তিনি একনিষ্ঠ যা থেকে গত চল্লিশ বছরে তিনি মোটেই বিচ্যুত হননি—সেটি হচ্ছে, ভারত থেকে ঘৃণ্য ব্রিটিশ প্রভাবের অপনোদন। এই ধূর্ত (শ্রুড) অনিষ্টকামী (ম্যালভোলেণ্ট) বৃদ্ধ রাজনীতিক সম্বন্ধে কনফারেন্স (সিমলা) হবার আগে থেকেই আমার গভীর অবিশ্বাস ছিল, এখন তা আরও অনেক বেশি গভীর হয়েছে। মন্ত্রী-মিশনের একজন প্রথম থেকেই তাঁকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেন—আমার মনে হয়, শেষে সকলেই তাঁকে অবিশ্বাস করতেন। প্রসঙ্গত, তাঁকে প্রথম যখন দেখি তার চেয়ে এখন তিনি অনেক বেশি শক্ত ও ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী।" (ইংরেজির অনুবাদ)

আর একটি চিঠিতে ওয়েভেল লিখেছিলেনঃ 'গান্ধী হচ্ছেন ৭০% ঝানু রাজনীতিক ১৫% শ্রুড এবং ১৫% সাধু।' এই চিঠিও হয়ত জওহরলাল বা বল্লভভাই-এর হাতে পড়তে পারে।

ওয়েভেলের দিনপঞ্জীতে ২৭শে মার্চ (১৯৪৭) তিনি পরিষ্কার লিখেছেন যে, তাঁর লেখা কোনো কোনো গোপন চিঠির প্রতিলিপি জওহরলাল বিলেতে নিয়ে গিয়ে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে দেখিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ওয়েভেল অন্তরে অন্তরে কংগ্রেসের প্রতি বিদ্বেষবান ছিলেন এবং তাঁকে যে বড়লাটের

পদ থেকে অপসারিত করা হয় এতে জওহরলালের হাত ছিল। (ওয়েভেল দি ভাইসরয়েজ জার্নাল, ৪৩৩ পৃঃ) ওয়েভেলের এই বইটির সম্পাদক পেন্ডেরেল মুন অবশ্য স্বীকার করেন নি যে, তাঁর গোপন চিঠি পাচার হবার সঙ্গে ওয়েভেলের কোন যোগ ছিল। কিন্তু ওয়েভেল নিজে অন্য কথা লিখে গেছেন।

ওয়েভেলের অপসারণ করা শুধু নয়, মাউণ্টব্যাটেনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছিল জওহরলালেরই অনুরোধে। মাউণ্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হওয়ায় মুসলিম লীগপন্থী কোনো কোনো সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, জওহরলালের দ্বারা মনোনীত হয়ে মাউণ্টব্যাটেন ভারতের বড়-লাট হতে পেরেছেন। ১৯৪৭-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে জওহরলাল এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, ওয়েভেলের ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে তাঁর কখনও কোনো সন্দেহ ছিল না এবং মাউণ্টব্যাটেনকে তিনি জীবনে দুবার দেখেছেন—একবার সিঙ্গাপুরে ও পরে একবার দিল্লিতে। এই বিবৃতিতে জওহরলাল নিঃসন্দেহে সত্যকে গোপন করেছিলেন। কারণ 'ফ্রিডম এট মিডনাইট' বইয়ের লেখকদ্বয় প্রকাশ করেছেন যে, ১৯৭৩-এর ফেব্রুয়ারী মাসে কৃষ্ণমেনন তাঁদের একজনের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি বিলাতে শ্রমিক মন্ত্রিসভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে বুঝিয়েছিলেন—ওয়েভেল ভারতের বড়লাট হয়ে থাকলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কোনো সমাধান হবে না এবং তাঁর বদলে কাকে ভারতের বড়লাট করা যায় এই প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণমেনন জানিয়েছিলেন যে, জওহরলাল মাউণ্টব্যাটেনকে পছন্দ করেন। কৃষ্ণমেনন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌-এর কাছে যাবার আগে জওহরলালের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে নিয়েছিলেন। কিন্তু পাছে মুসলিম লীগ জানতে পারে সেইজন্য সমস্ত ব্যাপারটা খুব কঠিনভাবে গোপন রাখা হয়েছিল। (ফ্রিডম এট মিডনাইট—৮ পৃঃ) জওহরলালের জন্যই যে মাউণ্টব্যাটেন বড়লাট হতে পেরেছিলেন, এ কথা ফ্রিডম এট মিডনাইটের লেখকদ্বয় বইয়ের অন্যান্য জায়গায়ও বলেছেন। ওয়েভেল একই কথা লিখে-ছেন। (৮৭ পৃঃ দেখুন)

৪৬-এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে লণ্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার কয়েক দিন পরে জিন্না মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন উইনস্টন চার্চিল, এণ্টনি ইডেন ও রিচার্ড বাটলারকে। তাঁদের নিকট থেকেই হয়ত জিন্না খবর পেয়ে থাকতে পারেন যে, ওয়েভেলকে অপসারণ করা হবে এবং নেহরুর মনোনীত মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতের বড়লাট করা হবে। ঠিক এইসময়েই প্রধানমন্ত্রী এটলি মাউণ্টব্যাটেনকে ডেকে পাঠিয়ে তিনি বড়লাটের পদ গ্রহণ করতে পারবেন কি না তা জেনে নেন।

জওহরলাল প্রতিবাদ করলেও জিন্নার বুঝতে বাকি ছিল না যে, তাঁরই মনোনয়ন পেয়ে মাউণ্টব্যাটেন বড়লাট হচ্ছেন। ওয়েভেল যে নিরপেক্ষতা রক্ষা করে চলেছিলেন মাউণ্টব্যাটেন আর সেই নিরপেক্ষতা রক্ষা করবেন না, তিনি যে জওহরলালের কথায় চলবেন সেটা জিন্না এবার পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। ওয়েভেল উভয় পক্ষের প্রতি যতটা সুবিচার করা সম্ভব, তারই ওকালতি করেছিলেন এবং সেইহেতু মুসলিম লীগ তাঁর অনেক নিন্দা করলেও তাঁকে গভীরভাবে বিশ্বাস করতো। কিন্তু জিন্নার চোখে মাউণ্টব্যাটেন ভারতের ভাগ্যাকাশে শনির মত উদয় হলেন।

মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে মাউণ্টব্যাটেন দম্পতির সঙ্গে ফটো তোলবার জন্য জিন্নাকে দুজনের মাঝখানে দাঁড়াতে বলায় জিন্না একটু ব্যঙ্গ করে বলেছিলেনঃ 'দুটি কাঁটার মাঝে একটি গোলাপ ফুল।' কিন্তু কথাটি সম্পূর্ণ ব্যঙ্গ ছিল না। জিন্না মাউণ্টব্যাটেন দম্পতিকে ভারতের মঙ্গলের পথে কাঁটাই মনে করতেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চক্রান্ত করে যে ওয়েভেলকে বড়লাটের পদ থেকে সরানো হোলো এবং জওহরলালের পছন্দমত মাউণ্টব্যাটেনকে বড়লাটের পদে নিয়োগ করতে ব্রিটেনের শ্রমিক মন্ত্রিসভা রাজি হলেন, এতেই মনে হয় জিন্না মনস্থির করে ফেললেন যে, আর মীমাংসার কথা নয়—যদি প্রয়োজন হয় গৃহ-যুদ্ধ করেও দেশ-বিভাগ করতে হবে।

ওয়েভেল তাঁর দিন-পঞ্জীর ২৭শে মার্চ, ১৯৪৭-এর লিপিতে পরিষ্কার লিখেছেন যে, তাঁর বরখাস্তে এবং মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগে নেহরুর হাত ছিল। কাজেই এ খবরটি তখন গোপন ছিল না এবং জিন্নাও খবরটি আগেই পেয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার যে জওহরলালের কথায় ওয়েভেলের মত বড়-লাটকে বদল করলেন এতে জিন্না মনে করলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাঁর পক্ষে হয়ত সুবিচার পাওয়া যাবে না। সেইজন্য তিনি লণ্ডনেই উইন-স্টন চার্চিল প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং পাকিস্তানের দাবি আদায় করবার উদ্দেশ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করবার জন্য মনস্থির করে ফেললেন।

একথা মনে রাখতে হবে, মন্ত্রী-মিশন প্রস্তাব সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতাদের আপাতবিরোধী নীতি সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তুলেছিল। কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলির নির্বা-চনে ৭৯টি মুসলমান আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র ৩টি এবং জওহরলালের যুক্তপ্রদেশে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) কংগ্রেস প্রার্থী তিন জায়গায় দাঁড়িয়ে হেরে যান। অন্য জায়গায় দাঁড়িয়ে হেরে যেতে পারেন সেই ভয়ে আবুল কালাম আজাদকেও দাঁড়াতে হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে।

বিভিন্ন প্রদেশে এতদিনের কংগ্রেসী ও মুসলিম লীগ বিরোধী মুসলমান

নেতারা একে একে মুসলিম লীগে যোগ দিতে লাগলেন। পাঞ্জাবের পুরাতন কংগ্রেস নেতা পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও এক সময়ের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মিয়াঁ ইফতিকারউদ্দিন মুসলিম লীগে যোগ দিলেন। বাংলায়ও কৃষক-প্রজা দলের নেতা, এক সময়ে প্রবল মুসলিম লীগ বিরোধী, ফজলুল হক ও তাঁর সহকর্মী সামসুদ্দিন আমেদ অন্যান্য বহু সহকর্মীসহ লীগে যোগ দিলেন। চিত্তরঞ্জনের সময়েই যিনি মুসলমান কংগ্রেসীদের মধ্যে প্রথম সারিতে গণ্য হতেন এবং যাঁকে স্বয়ং সুভাষচন্দ্র একবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত করেছিলেন সেই আসরাফউদ্দিন আমেদ চৌধুরীও এই সময়ে লীগে চলে গেলেন। মতিলাল নেহরুর এক সময়ের বিশ্বস্ত সহকর্মী চৌধুরী খালিকুজ্জমানও লীগের দরজায় ঢুকলেন।

এমন-কি ভারত গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী হয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সফর করবার সময়ে স্বয়ং জওহরলালকে বহুদিনের পুরানো এই কংগ্রেসী ঘাঁটিতে বিক্ষুব্ধ মুসলমান জনতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁকে লক্ষ্য করে যে সব ইঁট-পাথর ছোঁড়া হয়েছিল তাতে তাঁর গাড়ির কাঁচ ভেঙে যায় এবং নিজেও তিনি সামান্য আঘাত পেয়েছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ সমর্থকদের এইসব গুণ্ডামি সম্বন্ধে ওয়েভেলের কাছে জওহরলাল যখন অভিযোগ করেন, তখন ওয়েভেলের একান্ত সচিব পরে পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার ইভান জেনকিন্স বলেছিলেনঃ 'কংগ্রেস ১৯২১ সাল থেকেই এই সব করেছে, এখন মুসলিম লীগও ওই পথ ধরেছে।'

এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে রাখা দরকার যে, প্রথম থেকে জিন্নার দাবি ছিল ভারতবিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। আমি প্রবন্ধের প্রথম দিকে দেখবার চেষ্টা করেছি যে, মুসলমানদের কংগ্রেস নেতাদের প্রতি অবিশ্বাস এবং হিন্দু নেতাদের ভ্রান্ত নীতি অনুসরণের ফলে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রায় প্রথম থেকেই মুসলমান সমাজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি। জিন্না এটাকে পরে দ্বি-জাতিতত্ত্ব বলে প্রচার করেছিলেন এবং দ্বি-জাতিতত্ত্ব সত্য কি মিথ্যা সেই আলোচনায় না গিয়েও এ কথা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই যে, জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে হিন্দু ও মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অনেক পার্থক্য এসে গিয়েছিল। জিন্না তাই আগাগোড়াই বলতেন, এই দুই পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীর মিতালি হওয়া সম্ভব নয় এবং সেইজন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের মঙ্গলসাধনের একটি উপায় হচ্ছে ভারতকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে ভাগ করে দেওয়া—এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

আমরা অনেকেই বলি যে, হিন্দু মুসলমানের এই অনৈক্যটি প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি করেছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা যাতে ভারতে ইংরেজ

শাসন নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে এবং এও বলি যে, ভারতকে চিরদিনের জন্য দুর্বল করে রাখবার জন্য তারাই ভারতকে ভাগ করে দিয়ে গেছে। এর জবাবে মানতেই হবে যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের রাজ প্রতিনিধি ওয়েভেল ভারতকে স্বাধীন করে দেবার মুখে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন যাতে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যটি ক্ষুন্ন না হয়। ওয়েভেল অবশ্য খাঁটি ইংরেজের মতই কাজ করেছিলেন। প্রায় দেড়শ' বছরের ইংরেজ শাসনে ভারতে শোষণ করা হয়েছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু ইংরেজ ভারতের একটি প্রধান মঙ্গল করতে পেরেছিল—বহুধা-বিভক্ত ভারতীয় সমাজে একটি মোটামুটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের বন্ধন এনে দিতে পেরেছিল। ওয়েভেলের একমাত্র চিন্তা ছিল ভারত থেকে ইংরেজ শাসন চিরদিনের জন্য বিদায় নেবার সময়ে ভারতের প্রতি ইংরেজের এই সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানটি যেন ধ্বংস না হয়ে যায়। ওয়েভেলের এই আন্তরিকতার মূল্য হয়ত আমরা দিতে চাইব না, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর আন্তরিকতা যে ছিল একথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই।

ওয়েভেলের বিশেষ চাপাচাপিতেই ভারতবর্ষ বিভাগ না করে কিভাবে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যও রক্ষা করা যায়, তারই পথ দেখিয়েছিল ৪৬-এর ১৬ই মে-র ঘোষণাপত্র। বলা যেতে পারে, ওটা কোনো মিলনের পথই ছিল না—ওতে মিলনের সূত্র কিছুই ছিল না। হয়ত তাই। যাঁরা এইমতের সমর্থক তাঁদের ত তাহলে বলা উচিত ছিল যে, এই মিলনের সূত্রটি মিথ্যা এবং দাবি করা উচিত ছিল যে, জিন্নার আবদার অগ্রাহ্য করে কংগ্রেসের হাতেই শাসন-ব্যবস্থা তুলে দিয়ে ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে যাক, আর না হয় জিন্নার দাবি মেনে নিয়ে ভারতকে পরিষ্কার দুটি স্বাধীন রাজ্যে ভাগ করে দেওয়া হোক।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সেই মতই ছিল। ১৯৪৬-এর ৬ই জুলাই বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে প্যাটেল বলেছিলেনঃ 'মন্ত্রী-মিশনের ১৬ই মে-র ঘোষণাপত্রে মিং জিন্না দেখেছেন পাকিস্তানের 'মন্ত্রী-মিশনের ১৬ই মে-র ঘোষণাপত্রে মিঃ জিন্না দেখেছেন পাকিস্তানের সমাজতন্ত্রীদের নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে ধনিকশ্রেণীর বন্ধু বল্লভ-ভাই প্যাটেলের আশ্চর্য মিল ছিল। শ্রীজয়প্রকাশ বলেছিলেন, 'মুসলিম লীগের নেতার সঙ্গে আলোচনা করে কোনোদিন সত্যকার স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না। এই কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি ইংরেজেরই সৃষ্টি—এর দ্বারা আমরা কোনো দিন সত্যকার স্বাধীনতায় পৌঁছতে পারবো না। মন্ত্রী-মিশনের এই ঘোষণাপত্র এখনই প্রত্যাখ্যান করে আবার বিপ্লবের ডাক দিতে হবে এবং বিপ্লবের পথেই ইংরেজকে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে। মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোস করে আমরা সে পথে যেতে পারবো না।' প্রতিবাদ-

স্বরূপ পরে শ্রীনারায়ণ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেছিলেন।

শ্রীনারায়ণ যেমন বিপ্লবের কথা বলেছিলেন, তেমনি বল্লভভাইও মুসলিম লীগকে লক্ষ্য করে পরে বলেছিলেনঃ 'তরবারির দ্বারাই তরবারিকে আটকানো হবে।' (অবশ্য জিন্না এর জবাবে বলেছিলেনঃ 'সর্দার প্যাটেলের তরবারিটি কোথায়? কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী এবং বড়লাটের শাসন-পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যরা ব্রিটিশ বেয়নটের দ্বারা সুরক্ষিত না হলে নিজেদের কাজ চালাতে পারতেন না।')

বল্লভভাই প্যাটেল বা জয়প্রকাশ নারায়ণের পথ হয়ত খুব জটিলতার সৃষ্টি করতে পারতো, কিন্তু এতে কোনো লুকোচুরি ছিল না। পথটি ছিল দিনের আলোর মত পরিষ্কার। কিন্তু মুস্কিল হল গান্ধীজী ও জওহরলালকে নিয়ে। এঁরা জিন্নার সঙ্গে আপোস করতে চাইলেন, অথচ জিন্না যা চান তা পুরোপুরি দিতেও এঁদের প্রবল আপত্তি। গান্ধীজী বললেন যে, তিনি ১৬ই মে-র ঘোষণাপত্র মেনে নিয়েছেন। কিন্তু আসামকে বললেন যে, সে যেন কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে যোগ না দেয়। জওহরলাল ত ওয়েভেলকে সরিয়ে নিজের মনোনীত লোকটিকে বড়লাটের পদে বসালেন। উপায়ান্তর না দেখে জিন্না গৃহযুদ্ধের পথই বেছে নিলেন।

৪৬-এর ৭ই এপ্রিল এক বিবৃতিতে জিন্না কংগ্রেস নেতাদের এ বিষয়ে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'মুসলিম-ভারতের পক্ষে একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতের ধারণা একেবারে অসম্ভব। যদি মুসলমানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে মুসলিম-ভারত সকল উপায়ে এবং সকল শক্তি দিয়ে তার প্রতিরোধ করবে...যদি দুর্ভাগ্যবশত রক্তপাতের ভয় দেখিয়ে ইংরেজদের কিছু করতে বাধ্য করা হয়, যদিও তা ধাপ্পামাত্রই হবে বাস্তব সত্যের চেয়ে—তাহলে এবারে মুসলিম-ভারত আর নিষ্ক্রিয় বা নিরপেক্ষ হয়ে থাকবে না। তারা তাদের যা করণীয় তাই করবে—সকল বিপদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। পণ্ডিত নেহরু মস্ত ভুল করছেন। তিনি বলেছেন, হাঙ্গামা হতে পারে। কিন্তু তা মোটেই খুব বেশি হবে না। তিনি এখনও 'আনন্দ-ভবনের' আবহাওয়ায় বাস করছেন।' (দি স্টেটসম্যান ৮.৪.৪৬ ইংরেজির অনুবাদ)

পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে পাবলিক সেফটি অর্ডিনান্স জারি করে সভা-শোভাযাত্রা বেআইনী বলে ঘোষণা করেছিলেন। জিন্না তাঁর সতর্ক-বাণীতে বললেনঃ 'পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এই আর একটি উন্মাদের মত এবং শত্রুতামূলক আচরণের কুফল সারা মুসলমান ভারতের পক্ষে সাংঘাতিক হবে এবং আমি বড়লাটের নিকট আবেদন জানাচ্ছি, তিনি যেন অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে অবস্থাকে রক্ষা করেন, তা না হলে

সমস্ত ব্যাপারটার পরিণতি খুব গুরুতর হতে পারে এবং তার জন্য দায়ী থাকবেন বড়লাট এবং ব্রিটিশ সরকার।' সম্ভবত ওয়েভেলের হস্তক্ষেপে পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট কারারুদ্ধ লীগ নেতাদের ছেড়ে দিলেন এবং মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড-এর (ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের) উপর হতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন, কিন্তু পাবলিক সেফটি অর্ডিন্যান্স জারি রইল এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সভা-শোভাযাত্রা পরিচালনা করে মুসলিম লীগ আইন অমান্য শুরু করলেন।

ফেব্রুয়ারীর প্রথমে জওহরলাল দাবি তুললেন যে, যেহেতু কংগ্রেস ১৬ই মের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং লীগ গ্রহণ করেনি, অতএব ওয়েভেলের শাসন পরিষদ থেকে মুসলিম সদস্যদের পদত্যাগ করতে বলা উচিত। এই নিয়ে জওহরলাল বিলাতে ব্রিটিশ সরকারকেও চিঠি দিলেন। ৯ই ফেব্রুয়ারি ওয়েভেল বিলাতে ভারত-সচিবকে চিঠি দিয়ে জানালেন যে, এখনও আর একবার চেষ্টা করে দেখা দরকার লীগকে কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে আনা যায় কিনা। ১১ই ফেব্রুয়ারি তিনি একটি খসড়া ঘোষণা তৈরি করে বিলাতে পাঠালেন এবং বলে দিলেন যে, ব্রিটিশ সরকার যদি এই ঘোষণাটি করেন তাহলে লীগ হয়ত এখনও কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে যোগ দিতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ওয়েভেলের অনুরোধমত কোনো ঘোষণা করতে অস্বীকার করলেন।

মাউণ্টব্যাটেন ও অবশেষে ভারত-বিভাগ

১৩ই ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, ওয়েভেলকে এক মাসের নোটিশে বরখাস্ত করা হোলো এবং তাঁর জায়গায় লুই মাউণ্টব্যাটেনকে বড়-লাট নিযুক্ত করা হোলো। বরখাস্তের নোটিশ পেয়েও ১৭ই ফেব্রুয়ারি ওয়েভেল ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করলেন, লীগকে কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে আনবার একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা উচিত। ব্রিটিশ সরকার তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি বল্লভভাই প্যাটেল সর্বপ্রথম ওয়েভেলকে জানিয়ে দিলেন যে, মুসলিম লীগ যদি নাছোড়বান্দা হয়, তাহলে পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (যদি রাজি হয়) ও পূর্ব বাংলা নিয়ে তারা পাকিস্তান গঠন করতে পারে। ২০শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সরকার ওয়েভেলের 'ব্রেকডাউন প্ল্যানের' অনুরূপ ঘোষণাটি করলেন যাতে বলা হোলো 'কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি যদি সর্বসম্মত সর্ব-ভারতীয় সরকার গঠন করতে অক্ষম হয়, তাহলে ব্রিটিশ সরকার বর্তমান প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ভালো ও যুক্তিসম্মত বলে মনে করবেন।'

মার্চের প্রথম দিন থেকেই পাঞ্জাবের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগলো। মুসলিম লীগ আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল এবং তাঁদের আন্দোলনে বিরক্ত হয়ে ও অন্যান্য জটিলতার জন্য মুসলিম ইউনিয়নিস্ট প্রধানমন্ত্রী মালিক খিজর হায়াৎ খান তিওয়ানার মন্ত্রিসভা ৩রা মার্চ পদত্যাগ করলো। মুসলিম লীগ সরকার গঠনের দাবি জানালো, কিন্তু ব্যর্থ হোলো—পাঞ্জাবে গভর্ণরের শাসন চালু করতে হোলো। কিন্তু পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ গভর্ণমেণ্ট গঠন করে ফেলতে পারে এই আশংকায় হিন্দু ও শিখরা প্রতিবাদ জানালেন এবং সেই প্রতিবাদ অচিরেই লাহোর, অমৃতসর, রাওয়ালপিণ্ডি ও অন্যান্য অনেক শহরে প্রবল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপান্তরিত হোলো, যা পরে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো এবং সহস্র সহস্র লোক এর রক্তাক্ত স্পর্শে সিঞ্চিত হলেন। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ধীরে ধীরে ক্রমশ সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বল্লভভাই প্যাটেল ওয়েভেলকে অনুরোধ করলেন, পাঞ্জাবে মিলিটারি শাসন চালু করা হোক। কিন্তু ভারতকে স্বাধীনতা দানের মুখে ওয়েভেল পাঞ্জাবে মিলিটারি বসাতে রাজি হলেন না।

২২শে মার্চ মাউণ্টব্যাটেন তাঁর ইয়র্ক এম ডবলিউ ১০২ এরোপ্লেনে চড়ে যখন ভারতের ভাগ্যাকাশে শনির মত উদয় হলেন, তখন সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত একটি বারুদখানা হয়ে আগুনের হল্কার সামনে বসে আছে।

মাউণ্টব্যাটেন পেঁছবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বড়লাটের একান্ত সচিব জর্জ এবেল (ইনি ওয়েভেলের সময় থেকেই ছিলেন) তাঁকে জানিয়ে দিলেন, ভারতবর্ষ সিভিল ওয়ারের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তাঁর চিফ অফ স্টাফ লর্ড ইসমে খবর দিলেনঃ 'ভারতবর্ষ মাঝ-সমুদ্রে একটি আগুন-লাগা জাহাজ যার নিচের খোলে ঠাসা রয়েছে বারুদ।' পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার বাট্রাণ্ড গ্ল্যানসি খবর পাঠালেনঃ 'সমগ্র প্রদেশে সিভিল ওয়ারের হাওয়য়া বইছে।'

মাউণ্টব্যাটেনের ভারতে পা দেবার এক সপ্তাহের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কলকাতায় হত হলেন ৯৯ জন, বেম্বাইতে ৪১। তিনি ভারতবর্ষের পুলিশের বড়কর্তাদের ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'আপনারা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারবেন?' তাঁরা একবাক্যে বললেন, 'আমরা পারবো না।' তখন ভারতের প্রধান সেনাধ্যক্ষ স্যার ক্লড অচিনলেককে মাউণ্টব্যাটেন একই প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেনঃ পারবেন না। তাঁর নিজের গভর্ণমেণ্টে কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে লীগ সদস্যদের বৈরিতা এতদূর বেড়ে গেছে যে, নিজেদের মধ্যে কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ। ১৯৪৭-এর ২রা এপ্রিল মাউণ্টব্যাটেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন যে, ভারতের ভবিষ্যত সম্বন্ধে একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত লাভের কোনো আশা তিনি পাচ্ছেন না এবং তিনি যদি খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ না করতে পারেন, তাহলে তাঁকে সারা দেশে সিভিল ওয়ারের সূত্রপাত অবলোকন করতে হবে।

মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই গান্ধীজী ও জওহরলাল তাঁর সঙ্গে স্নেহের বন্ধনে বাঁধা হয়ে গেলেন। কিন্তু জিন্না ধরতে পেরেছিলেন যে, মাউণ্টব্যাটেন নেহরুর লোক, আগাগোড়া তিনি মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে ঘৃণা-সূচক ব্যবহার করলেন। মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলি একটার পর একটা শুধু 'হ্যাঁ' 'না' বলে এড়িয়ে গেলেন। বড়লাট-প্রাসাদে এক প্রকাশ্য ভোজসভায় জিন্না সকলের সামনে মাউণ্টব্যাটেনকে তাচ্ছিল্য করতে দ্বিধা করেন নি।

জিন্নার ব্যবহারে মাউণ্টব্যাটেনকে বলতে বাধ্য হতে হোলোঃ 'ভারতে আমার কাজ যে কতখানি অসম্ভব হবে, একথা মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে আমি বুঝতে পারিনি।' (ইংরেজির অনুবাদ—ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট) মাউণ্টব্যাটেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে জিন্নাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, ভারত-বিভাগ করলে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে। তিনি জানতেন না, জিন্না ঠিকই করে রেখেছেন মাউণ্টব্যাটেনের কোনো কথাই শুনবেন না। তাই

হোলো। মাউণ্টব্যাটেন চরমভাবে ব্যর্থ হলেন। শুধু একটি বিষয়ে জিন্না মাউণ্টব্যাটেনকে সমর্থন করলেনঃ খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে—ভারত বিভাগের অপারেশনটি খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে, তা না হলে ভারত ধ্বংস হয়ে যাবে। জিন্নাকে দেখে মাউণ্টব্যাটেনকে বলতে হোলোঃ 'আমি কখনও বিশ্বাসই করতাম না যে, একজন বুদ্ধিমান, উচ্চশিক্ষিত, বিলাতের আইনবিদ্যালয়ে রপ্ত কেউ, জিন্নার মত মনের দরজা এমনভাবে বন্ধ করে বসে থাকতে পারে। এমন নয় যে তিনি যুক্তিটা ধরতে পারেন না, কিন্তু তার পরেই পাল্লাটি বন্ধ হয়ে যায়। সমস্ত জিনিসটাতেই তিনি একটি অপশক্তি হয়ে বসে আছেন। অন্য সকলকেই বুঝিয়ে কাজ করানো যায়, কিন্তু জিন্নাকে যায় না। তিনি বেঁচে থাকতে থাকতে কিছুই করা সম্ভব হবে না।' (ইংরেজির অনুবাদ—ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট)

শেষমেশ ১০ই এপ্রিল মাউণ্টব্যাটেন জিন্নাকে ডেকে নিয়ে দু' ঘণ্টা ধরে কাতরভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যাতে তিনি ভারত বিভাগের জন্য জেদ না করেন। জিন্নার কাছে তিনি পরাস্ত হলেন।

বড়লাট প্রাসাদ থেকে বিদায় নেবার আগে ওয়েভেল জওহরলালকে বলেছিলেনঃ 'আমি যেখানে বিফল হলাম, আমার পরবর্তী মাউণ্টব্যাটেন তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে হয়ত সেখানে সফল হতে পারবেন।' মাউণ্টব্যাটেন সফলও হয়েছিলেন, নিশ্চয়ই সফল হয়েছিলেন। কিন্তু সে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, বল্লভভাই প্যাটেল ও জওহরলাল নেহরুর কাছে। ইংলণ্ডের রাজার এই দাম্ভিক জ্ঞাতিভ্রাতা চরম এবং শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলেন ক্ষয়রোগগ্রস্ত মৃত্যুপথযাত্রী মহম্মদ আলি জিন্নার কাছে। মাউণ্টব্যাটেনের দুর্ভাগ্য তিনি জানতেন না, জিন্না যাঁকে বিশ্বাস করতেন যাঁকে শেষ পর্যন্ত কথা দিয়েছিলেন, কংগ্রেস যদি ১৬ই মে-র ঘোষণা মত গ্রুপ-গঠনে রাজি হয় তাহলে তিনি ভারত-বিভাগ চাইবেন না, সেই সরল মানুষ সৈনিক ওয়েভেল বড়লাট প্রাসাদ থেকে চলে যাবার পর জিন্না ঠিকই করে ফেলেছিলেন, নেহরুর মনোনীত মাউণ্টব্যাটেন যা বলবেন তাতে তিনি শুধু বলবেন 'না।' ইতিহাস এটা লক্ষ্য করলো না যে, ভারত-বিভাগ নাটকের শেষ যবনিকা পড়ে গেল সেইদিন, যেদিন জওহরলালের প্রচেষ্টায় ওয়েভেলকে নয়াদিল্লির বড়লাট প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে হোলো এবং তাঁর জায়গায় ঢুকলেন তাঁরই মনোনীত মাউণ্টব্যাটেন।

অনেকে বলেন মাউণ্টব্যাটেনই ভারত বিভাগ করে দিয়ে গেছেন। কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। এটা ঠিক, মাউণ্টব্যাটেন ভারতে না এলে হয়ত ভারত বিভাগ হোতোই না কিম্বা এরকম লক্ষ লক্ষ লোকের মরণ যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যেতে হোতো না। আসলে জিন্নার অদম্য ইচ্ছাশক্তির কাছে মাউণ্টব্যাটেনকে আত্মসমর্পণ করতেই হোলো। পরের দিন ১১ই এপ্রিল

মাউণ্টব্যাটেন তাঁর চিফ অব স্টাফ লর্ড ইসমে-কে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা তৈরি করতে বললেন। ২রা মে ভারত বিভাগের খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করে বিলাতে মন্ত্রীসভার অনুমোদন লাভের জন্য পাঠানো হোলো। এই খসড়ায় ভারত ও পাকিস্তানে যোগ না দিয়ে যে কোনো প্রদেশের একক স্বাধীনতা লাভের ব্যবস্থা ছিল যার ফলে তখনই অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি হতে পারতো। খসড়াটি প্রকাশ করবার আগে মাউণ্টব্যাটেন এটি জওহরলালকে দেখাতেই তিনি বিরক্তিতে ফেটে পড়লেন। তাঁর অনুরোধে ভারত বিভাগের পুরানো পরিকল্পনা বদলিয়ে নতুন খসড়া তৈরি করা হোলো এবং বিলাতে মন্ত্রীসভাকে দিয়ে অনুমোদন করবার জন্য মাউণ্টব্যাটেন নিজে সেটা নিয়ে গেলেন। ২রা জুন সকলেই সেই খসড়ায় সম্মতি দিলেন। জিন্না সম্মতি দিতে রাজি হলেন না যতক্ষণ না লীগ কাউন্সিল প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে পারছে। মাউণ্টব্যাটেনের অনুরোধে তিনি শুধু মাথা একটু নামিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত সম্মতির কথা স্বীকার করলেন।

৩রা জুন বড়লাট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এক সংগে ঘোষণা করলেন, "ব্রিটিশ সরকার পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চান যে, স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করবার কোনো অভিসন্ধি তাঁদের নেই। এটা ভারতবাসীদের নিজেদের দ্বারা করণীয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচনা করে একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ গঠনের পথে বাধা দেওয়াও সরকারের পরিকল্পনায় নেই।

বর্তমানের কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলির কাজে বাধা দেওয়াও ব্রিটিশ সরকারের অভিসন্ধি নয়। এটাও পরিষ্কার যে, বর্তমান এসেম্বলি যে সংবিধান রচনা করছেন, দেশের যে অংশগুলি তা গ্রহণ করতে রাজি নয়, তাদের উপর সেটা প্রয়োগ করা চলবে না।

ব্রিটিশ সরকার এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, যে সকল অঞ্চল বর্তমান কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে যোগ দিতে অস্বীকার করেছে তাদের পক্ষে বর্তমান কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলির সংবিধান অথবা তাদের নিজেদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি নতুন এবং পৃথক কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি দ্বারা রচিত সংবিধান প্রযোজ্য হবে। সেই ব্যাপারে সেখানকার অধিবাসীদের অভিলাষ সাব্যস্ত করবার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি এই নতুন পরিকল্পনায় নিবদ্ধ করা হয়েছে। তা যখন করা হবে তখনই ঠিক হবে, কার বা কাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যেতে পারে।

সিন্ধুতে এই বিষয়টির সিদ্ধান্ত নেবে প্রাদেশিক লেজিসলেটিভ এসেম্বলি ভোটের দ্বারা। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে (ও ব্রিটিশ বেলুচিস্তানে) বিষয়টি নির্ধারিত হবে রেফারেণ্ডামের দ্বারা। আসামেও বিষয়টি নির্ধারিত হবে মুসলমান প্রধান জেলাগুলিতে রেফারেণ্ডামের দ্বারা।

বাংলা ও পাঞ্জাবের প্রাদেশিক লেজিসলেটিভ এসেম্বলি প্রত্যেকটি (ইয়োরোপীয়গণ বাদে) প্রথমে সমগ্রভাবে বসলে এবং ভোটের দ্বারা এই প্রশ্নটি নির্ধারিত হবে এই রকম ধরে নিয়ে যে, প্রদেশ বিভাগ হবে না। তারপরে এসেম্বলি দুইভাবে বিভক্ত হয়ে বসবে। একটি হবে ১৯৪১-এর সেন্সাস অনুযায়ী মুসলমান প্রধান জেলাগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে, অন্যটি বাকি প্রতিনিধিদের নিয়ে। প্রত্যেক লেজিসলেটিভ এসেম্বলির দুটি ভাগের সদস্যরা আলাদাভাবে বসে ঠিক করবেন, প্রদেশকে ভাগ করা হবে কি না। যে-কোনো একটি ভাগের সংখ্যাধিক সদস্যের সাধারণ ভোটে যদি প্রদেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে সেই প্রদেশ ভাগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। প্রত্যেক প্রদেশের বিভাগ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার সংগে সংগে প্রত্যেক প্রদেশের জন্য গভর্ণর জেনারেল একটি বাউন্ডারি কমিশন গঠন করে দেবেন যার সদস্যপদ ও কার্যপদ্ধতি তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সংগে পরামর্শ করে ঠিক করবেন। লেজিসলেটিভ এসেম্বলির অংশ দুটি ঠিক করবে যে, যে অঞ্চলের তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করে সেগুলি ভারতে অথবা পাকিস্তানে যোগ দেবে।" (ইংরেজির অনুবাদ)

১৯৪৬-এর ২৮শে আগস্ট ওয়েভেলকে লেখা চিঠিতে গান্ধীজী বলেছিলেন যে, ১৬ই আগস্টের কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পাশবিক প্রদর্শনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে একে উৎসাহই দেওয়া হবে এবং এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে। কিন্তু পাঞ্জাবের পাশবিক প্রদর্শনীর কাছে সকলকে নতিস্বীকার করতেই হোলো। বল্লভভাই প্যাটেল ওয়েভেল বিদায় নেবার আগেই ৪৭-এর ১৭ই ফেব্রুয়ারি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন—পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান করে দিয়ে জিন্নাকে আলাদা করে দেওয়া হোক। মাউণ্টব্যাটেনের প্রখর ব্যক্তিত্বের কাছে জওহরলাল দেশ বিভাগের প্রস্তাবটি আগেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

সমস্যা দাঁড়ালো গান্ধীজীকে নিয়ে। তিনি কিছুদিন আগেই বলেছিলেনঃ ভারত বিভাগ করতে হলে আমার মৃতদেহের উপর করতে হবে। আরও বলেছিলেনঃ যতই রক্তপাত হোক, এক ইঞ্চি পাকিস্তানও আমি সমর্থন করবো না।

৩রা জুনের ঘোষণার পর একজন পত্রলেখক তাঁকে বললেনঃ "আপনার প্রতিশ্রুতি মত এবার আমরণ অনশন আরম্ভ করে আপনি ভারত বিভাগ রোধ করুন।" জবাবে গান্ধীজী বললেনঃ "কংগ্রেস যদি পাগলের মত কাজ করে থাকে তার অর্থ এই নয় যে, আমাকে মরতে হবে।" দুদিন পরে প্রার্থনা সভায় তিনি বললেনঃ "আমি যখন দেশ-বিভাগে বাধা দিতে চেয়েছিলাম তখন দেশের লোক দেশ বিভাগ চাইত না, সেইজন্য আমিও দেশ বিভাগের বিরোধী ছিলাম। এখন দেশের লোকই দেশ বিভাগ চাইছে, আমার বাধা দেওয়া উচিত হবে না।"

শুধু আর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ রাখবো।

১৯৪৭-এর ২০শে জুন বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্বলির অধিবেশন বসলো সদস্যদের মতামত জানাবার জন্য যে, তাঁরা ভারতীয় কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে যোগ দেবেন, না নতুন ও পৃথক কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে যোগ দেবেন। এসেম্বলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সদস্যেরা একযোগে ভোট দিলেন, বাংলা ভাগ করা চলবে না; তাঁরা ভারতীয় কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে যোগ দেবেন না, নতুন ও পৃথক কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিতে যোগ দেবেন। এই নতুন ও পৃথক কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলিই হোলো পাকিস্তান কনস্টি-টিউয়েণ্ট এসেম্বলি। বাংলার মুসলমান সদস্যরা সেদিন স্বেচ্ছায় অন্যের বিনা প্ররোচনায় নিজেদের স্বাধীন চিন্তায় পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিলেন। কাজেই ১৯৭১ সালে আমরা যখন বললাম যে, পাকিস্তান জবরদস্তি করে পূর্ব বাংলা দখল করে বসে আছে, তখন আমরা সর্বতোভাবে অসত্য কথা বলেছিলাম। সারা ভারতের বড় বড় নেতাদের অনুসরণে কলকাতা হাইকোর্টের বড় বড় অনেক ব্যারিস্টার মিটিং করে এই অসত্যটি চালু করেছিলেন। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা ১৯৪৭-এ স্বেচ্ছায় পাকিস্তানে যোগ দিয়ে পাকিস্তানের অবি-চ্ছেদ্য অঙ্গ বলে নিজেদের ভাগ্য রচনা করেছিলেন। তারপর হঠাৎ একদিন সকালে উঠে আমরা স্বাধীন বলা মাত্র পাকিস্তান যদি সেটা স্বীকার করতে রাজি না হয়, তাহলে আইনের দিক থেকে পাকিস্তান অন্যায় কিছু করে নি। অমাদের দেশে আমরাও কাশ্মীর ও মিজো-নাগাদের ক্ষেত্রে সেই রকম ব্যবহারই করেছি। তবে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিলেন এবং তার জন্য লড়াই করতে চেয়েছিলেন। এটাকে ওয়ার অফ সিসেশন নিশ্চয় বলা চলে, কিন্তু স্বাধীনতার যুদ্ধ যাকে সাধারণত বলা হয়, বাংলাদেশের যুদ্ধকে তাই বলা ঠিক নয়।

এই সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলা দরকার। বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দেবার জন্য আমরা ভারতীয়রা কৃতিত্বের দাবি করি এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সেইজন্য এই সময়ে এশিয়ার মুক্তি সূর্য বলেও অভিহিত করা হোতো। কিন্তু বিনীতভাবে বলতে চাই—যে লোকটির জন্য বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারলো তাঁর নাম মহম্মদ আলি জিন্না। ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন পূর্ব বাংলার মুসলমানরা জিন্নার আহ্বান অগ্রাহ্য করে যদি পাকিস্তানে যোগ না দিতেন এবং ভারতে যোগ দিতেন এবং তারপর দশ-বিশ বছর বাদে যে-কারণে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হতে চাইলেন অর্থাৎ ভাষা পার্থক্যের জন্য ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতালাভ করতে চাইতেন, তাহলে শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা বাঙালিরা কি ফুলের মালা দিয়ে পূজা করতাম, না রাস্তায় গুলি করে মারার দাবি জানাতাম? প্রায় একই কারণে

শেখ আবদুল্লাকে কত বছর কারাগারে থাকতে হয়েছিল, নিশ্চয়ই সেকথা কেউ ভোলেন নি। পাকিস্তানে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে তারপর পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দাবি জানালে পাকিস্তান পূর্ব বাংলায় যে অত্যাচার করেছিল, আমাদের ভারতবর্ষে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে তারপর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দাবি জানালে ভারতবর্ষ পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের চেয়ে বেশি না হোক কম অত্যাচার করতো না। মিজো-নাগাদের উপর আমরা যে অত্যাচার করেছিলাম, পৃথিবীর লোক কোনোদিন সে সংবাদ জানতে পারবে না। এবং ভারতের মত শক্তিশালী দেশের সংগে লড়াই করবার জন্য ক্ষুদ্র পাকিস্তান বা পৃথিবীর কোনো দেশের কার্যকরী সাহায্য পূর্ব বাংলার লোকেরা পেতেন না। ভাগ্যবশত পূর্ব বাংলা পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিল, তাই খুব সহজেই স্বাধীন হতে পারলো—না হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দূর অস্ত হয়ে থাকতো। সেইজন্যই বললাম, পূর্ব বাংলার মুসলমানরা মহম্মদ আলি জিন্নার ডাকে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিল বলেই সহজে স্বাধীন হোলো। ১৯৪০-এ লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাবে জিন্না একাধিক মুসলমান-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নই দেখেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে জিন্নার স্বপ্নই সফল হোলো।

আর একটি প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে আমার মনে থেকে গেছে যার কোনো সদুত্তর আমি পাই নি। একথা সবাই জানেন, ভারতীয় সৈন্য পূর্ব বাংলায় যেতে না পারলে পূর্ব বাংলা স্বাধীন করা যেত না। গোপনে যে ধরনের সাহায্য দেওয়া হচ্ছিল তাতে একটা দেশকে স্বাধীন করা যায় না। পূর্ব বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী ভারতে এসে পড়ায় ভারতের অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে, এই যুক্তিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিছু করা উচিত এই দাবি নিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রনেতাদের সংগে সাক্ষাৎ করে তাঁদের কার্যকরী কিছু করতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। পৃথিবীর কোনো দেশই এ ব্যাপারে ভারতকে কিছু অর্থ ভিক্ষা ছাড়া আর কিছু করতে রাজি হোলো না। সত্য হোক মিথ্যা হোক—একথাও তখন অনেকে বলতেন যে, এই লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর ভারতে আগমনও একটি ষড়যন্ত্রের ফল। এই পাকিস্তানীদের (আশ্রয়প্রার্থীরা তখনও পাকিস্তানী) ভারতে আগমনের দরুণ ভারত এদের বসবাসের জন্য পাকিস্তান থেকে জমি দাবি করে লড়াই শুরু করতে পারতো। এবং শেষকালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে হয়তো সেই পথই নিতে হোতো, যদিও তাতে বিশ্বে ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া খুব তীব্র হোতো। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীকে রক্ষা করলেন একজন পাকিস্তানী ভদ্রলোক।

তাঁর নাম জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ—পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। তিনি ১৯৭১-এর ৩রা ডিসেম্বর ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন।

বাংলাদেশ যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল অরোরা ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লি অফ ইণ্ডিয়া-তে লিখেছিলেন যে, এই সুযোগটি যেন ভগবৎ-প্রেরিত এবং বাংলাদেশ যুদ্ধে যোগদানের পূর্বে তিনি ইয়াহিয়া খাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর নামে একটি টোস্ট পান করেছিলেন। ইয়াহিয়া খাঁ যদি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করতো, তাহলে ইন্দিরা গান্ধী বিশ্ব জনমতের ভয়ে সৈন্য প্রেরণের সুযোগই পেতেন না। ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারতো না। এবং ইয়াহিয়া খাঁ এইভাবে কয়েক বছর চুপ করে বসে থেকে সারা পূর্ব বাংলাকে শ্মশান করে দিতে পারতো। লক্ষ লক্ষ পাকিস্তানী আশ্রয়প্রার্থী নিয়ে ভারতের অর্থনীতির উপরও অচিরেই গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। ৩রা ডিসেম্বর ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইয়াহিয়া খাঁ ইন্দিরা গান্ধীকে পূর্ব বাংলায় সৈন্য পাঠাবার সুযোগ করে দিলো কেন? ইয়াহিয়া খাঁ কি ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে মোটা টাকা ঘুষ পেয়েছিল? অথবা যে সব লোকের উপদেশ মেনে ইয়াহিয়া খাঁ চলতো, তাদের মধ্যে কেউ কি ইন্দিরা গান্ধীর চর ছিল?

৩রা জুনের ঘোষণার পরের দিন মাউণ্টব্যাটেন একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন। একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেনঃ 'আপনার গতকালের বেতার বক্তৃতায় আপনি বলেছিলেন যে, দুটি ভাগ-করা প্রদেশের সীমারেখা সম্ভবত নিশ্চয়ই বর্তমানে যেভাবে আপাতত টানা হয়েছে, সেভাবে হবে না। কেন?

মাউণ্টব্যাটেন জবাব দিলেনঃ কারণটি খুবই সরল এবং সেটি এই যে, পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার লোক সংখ্যার হিসাবে শতকরা ৫০.৪ ভাগ মুসলমান এবং ৪৯.৬ ভাগ অ-মুসলমান। তবুও আপনি দেখবেন যে, বাউণ্ডারি কমিশন এই জেলাটির সমগ্র অঞ্চলকে মুসলমান-প্রধান বিভাগে ফেলবেন না। সেই রকম বাংলার একটি জেলাতেও অবস্থাটি ঠিক উল্টো। সেখানে খুব সামান্য ভগ্নাংশ অ-মুসলমানের সংখ্যাধিক্য আছে। আমি নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবো যদি দেখি যে, বাউণ্ডারি কমিশন ওই জেলাটিকে সমগ্রভাবে অ-মুসলমান বিভাগে ঠেলে দিয়েছে। আমরা জেলাগুলি সম্বন্ধে শুধু একটি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছি এবং সেটা হচ্ছে সবচেয়ে সরল উপায় যার দ্বারা প্রত্যেকটির আইন সভার সদস্য সংখ্যা কি করে বাড়ানো যায়। আমি চাই না যে, ওই সব জেলার অধিবাসীরা একেবারে চূড়ান্তভাবে ধরে নিক যে, তাদের সম্প্রদায় যেখানে সংখ্যাধিক নয় সেই অঞ্চলেই তাদের ঠেলে দেওয়া হবে। এই সাংবাদিক সম্মেলনে মাউণ্টব্যাটেন বাংলার যে জেলা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু নাম করেন নি, মনে হয়, সেটি যশোহর জেলা।

৪৭-এর ৪ঠা জুলাই মাউণ্টব্যাটেন বাংলা ও পাঞ্জাবে বাউণ্ডারি কমিশন

নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। পাঞ্জাব কমিশনে রইলেন লাহোর হাই-কোর্টের বিচারপতি মহম্মদ মুনির, বিচারপতি দিন মহম্মদ, বিচারপতি মেহেরচাঁদ মহাজন ও বিচারপতি তেজা সিং। চেয়ারম্যান বিলাতের কিংস কাউন্সেল স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ। বাংলার কমিশনে রইলেন কলকাতা হাই-কোর্টের বিচারপতি বিজনকুমার মুখার্জি, বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিচার-পতি আবু সালে মহম্মদ আক্রাম, বিচারপতি সৈয়দ আবদুল রহমান। চেয়ার-ম্যান ওই সিরিল র‍্যাডক্লিফ।

ঠিক হোলো—কমিশনের দৈনন্দিন অধিবেশনে চেয়ারম্যান র‍্যাডক্লিফ একদিনও যোগদান করবেন না। বাংলায় কমিশনের দৈনন্দিন অধিবেশনে র‍্যাডক্লিফ কখনই যোগ দেন নি। আরও ঠিক হোলো, দুটি কমিশনের বিচার-পতিরা যদি একমত হয়ে রায় দেন তাহলে র‍্যাডক্লিফ তাতে মোটেই হস্তক্ষেপ করবেন না বা কিছুমাত্র বদলাবার চেষ্টা করবেন না। কমিশনের সদস্যরা যদি একমত না হন তাহলেই চেয়ারম্যান নিজের মতামত বড়লাটকে জানাবেন এবং তখন তাঁর সিদ্ধান্ত মত রায় দেওয়া হবে। আরও ঠিক হোলো, প্রায় এক মাসের ভিতর অর্থাৎ ১১ই আগষ্টের মধ্যে দুটি কমিশন তাঁদের রায় পেশ করবেন। র‍্যাডক্লিফ প্রতিশ্রুতি মত ১১ই আগষ্টের ভেতরেই দুটি কমিশনের রায় বড়লাটের নিকট পেশ করেছিলেন। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন শীলমোহর করা খাম দুটি খুললেন না। তিনি ঠিক করেছিলেন, ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজটা সমাধা হয়ে গেলে তারপর কমিশন দুটির রায় প্রকাশ করবেন। সেইমত ১৬ই আগষ্ট বাংলা ও পাঞ্জাবের বাউণ্ডারি কমিশনের রায় দুটি প্রকাশ করা হয়েছিল।

১৪ই জুলাই থেকে কলকাতার বেলভেডিয়ারে—এখন যেখানে ন্যাশনাল লাইব্রেরী—বাংলার বাউণ্ডারি কমিশনের দৈনন্দিন অধিবেশন বসেছিল। কংগ্রেসের পক্ষে ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, হিন্দু মহাসভার পক্ষে নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জি, মুসলিম লীগের পক্ষে হামিদুল হক চৌধুরী ও মহম্মদ ওয়াসিম। আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও অন্যান্য আইনবিদ ছিলেন।

মুসলিম লীগ তাঁদের লিখিত দাবিতে কলকাতাকে পূর্ব বাংলার অন্তর্ভূক্ত করতে চাইলেন কারণ,

১. কলকাতা বন্দরের অধিকাংশ লস্কর মুসলমান।

২. পূর্ব বাংলার পাট সবটাই কলকাতা বন্দর দিয়ে রপ্তানি করা হয়, অতএব কলকাতা বন্দর পূর্ব বাংলা না পেলে বন্দরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পূর্ব বাংলার পাটও রপ্তানি হতে পারবে না।

৩. কলকাতার উন্নতিতে পূর্ব বাংলার অবদান বেশি।

মুসলিম লীগ চাইলেন, কলকাতা থেকে তালতলা, বেলেঘাটা, ভাঙ্গড়,

বারাসাত, বসিরহাট দিয়ে সীমারেখা টেনে দুটি প্রদেশকে ভাগ করে দেওয়া হোক।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পক্ষ থেকে বলা হোলো—তাদের মুসলমান-প্রধান প্রদেশে ফেলা ঠিক হবে না, কারণ ত্রিপুরা ও আসামের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র গভীরতর। নোয়াখালির চারটি থানার পক্ষ থেকে দাবি জানানো হোলো যে, তাঁদের যেন পশ্চিমবাংলার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। কলকাতা-পোড়াদা-গোয়ালন্দ জলপথটিকে পশ্চিমবাংলা কর্তৃত্বাধীনে রাখা হোচ্ছে এমন দাবিও করা হোলো।

কংগ্রেস চাইলেন দিনাজপুর, রংপুর এবং চারটি থানা বাদে মালদহ জেলা পশ্চিমবাংলার অন্তর্ভুক্ত হোক। পশ্চিমবাংলার জন্য কংগ্রেস চাইলেন ৪০,০০০ স্কোয়ার মাইল এবং পূর্ব বাংলাকে দিতে বললেন ৩১,০০০ স্কোয়ার মাইল। কিন্তু তাঁরা পশ্চিমবাংলার লোকসংখ্যা ধরলেন দু'কোটি আশি লক্ষ এবং পূর্ব বাংলার লোকসংখ্যা ধরলেন তিন কোটি বিশ লক্ষ।

বাংলার ব্যাপারে দেখা গেল কমিশনের সদস্যদের মধ্যে বাউন্ডারির সীমারেখা নিয়ে গভীর মতানৈক্য রয়েছে। আগের ব্যবস্থা মত তাঁরা চেয়ারম্যান সিরিল র‍্যাডক্লিফকে অনুরোধ করলেন, তিনি নিজের বিবেচনামত রায় দিন এবং সেইটাই কমিশনের রায় হবে। র‍্যাডক্লিফ তখন সমস্ত ব্যাপারটা বিবেচনা করে কমিশনের রায় দিলেন এবং মাউণ্টব্যাটেন তাই গ্রাহ্য করলেন।

বাংলা সম্বন্ধে র‍্যাডক্লিফ তাঁর রায়ে বললেন যে, ৭টি প্রধান প্রশ্নের উপর বাউন্ডারি লাইন টানার কাজ প্রধানভাবে নির্ভর করছেঃ

১. কলকাতা কাকে দেওয়া হবে অথবা কলকাতাকে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে;

২. কলকাতা যদি যেকোনো একটি রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে দেওয়া হয়, তাহলে নদীয়ার নদীপথ অথবা নদীবাহিত অঞ্চলটি কার হাতে দেওয়া হবে, যেহেতু বাঁচতে হলে এদের উপরেই কলকাতাকে নির্ভর করতে হবে;

৩. বাউন্ডারি কমিশনের কার্যপদ্ধতির বিধিগুলিকে কি অমান্য করা হবে যদি গঙ্গা-পদ্মা-মধুমতী নদীপথটির আকর্ষণে যশোর ও নদীয়া জেলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্যের দাবিকে অগ্রাহ্য করা হয়;

৪. খুলনাকে কি একটি রাষ্ট্রে দেওয়া যায় এবং মশোহরকে অপর রাষ্ট্রে;

৫. মালদহ ও দিনাজপুর জেলা দুটিতে হিন্দু সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও কি এদের পূর্ব বাংলায় দেওয়া ঠিক হবে;

৬. ২.৪২ শতাংশ মুসলমান নিয়ে দার্জিলিং এবং ২.৩৮ শতাংশ মুসলমান নিয়ে জলপাইগুড়ি কারা পাবে, যদিও দুটি জেলার অব্যবহিত অঞ্চলগুলিতে অ-মুসলমান সংখ্যাধিক্য নেই;

৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম কাকে দেওয়া হবে যেখানে মুসলমান মাত্র ৩ শতাংশ, কিন্তু চট্টগ্রাম জেলার শাসন ব্যবস্থা থেকে একে বিচ্ছিন্ন করা শক্ত।

বাউন্ডারি কমিশনে কোনো বিশেষ অঞ্চলে এক সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্যই একমাত্র বিবেচনার বিষয় ছিল না। কোনো জেলাতে বা মহকুমায় এক সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য থাকলেও অব্যবহিত অঞ্চলটিতে কোন্ সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য সেটাও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছিল। জেলা বা মহকুমায় সামান্য সংখ্যাধিক্য আছে কিন্তু অব্যবহিত অঞ্চলে অন্য সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য থাকায় অনেক জায়গায় অব্যবহিত অঞ্চলের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মূল অঞ্চলকে যুক্ত করা হয়েছিল।

র‍্যাডক্লিফের রায়ে পশ্চিমবাংলা পেল পুরো কলকাতা শহর এবং সম্পূর্ণ বর্ধমান ডিভিসন।

পূর্ব বাংলা পেল রাজসাহী ডিভিসনের রংপুর, বগুড়া, রাজসাহী এবং পাবনা জেলা এবং প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের খুলনা জেলা। পেলো সম্পূর্ণ চট্টগ্রাম ডিভিসন ও ঢাকা ডিভিসন।

নদীয়া জেলার খোকসা, কুমারখালি, কুস্টিয়া, মীরপুর, আলমডাঙা, ভেড়ামারা, গণগণি, দামুরহুদা, চুয়াডাঙা, জীবননগর, মেহেরপুর এবং মাথাভাঙা নদীর পূর্বে দৌলতপুরের অংশটুকু, বনগাঁ এবং গাইঘাটা বাদে সম্পূর্ণ যশোর জেলা পেল পূর্ব বাংলা। নদীয়ার বাকি অংশ ও বনগাঁ এবং গাইঘাটা পেল পশ্চিমবাংলা।

দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ, ইটাহার, বংশিধারি, কুশমুন্ডি, তপন, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, হেমতাবাদ, এবং প্রধান উত্তর-দক্ষিণ রেলওয়ে লাইনের পশ্চিমে বালুরঘাটের অংশটুকু পেল পশ্চিমবাংলা। দিনাজপুরের বাকি সমস্তটাই পেল পূর্ব বাংলা।

জলপাইগুড়ি জেলার তেঁতুলিয়া, বচাগড়, বোদা, দেবিগঞ্জ, পাটগ্রাম এবং কুচবিহারের দক্ষিণে ঢুকে-থাকা অঞ্চলগুলি পেল পূর্ব বাংলা। জলপাইগুড়ির বাকিটা পেল পশ্চিমবাংলা।

দার্জিলিং পুরোটাই পেল পশ্চিমবাংলা।

মালদহ জেলার গোমস্থাপুর, নাচোল, নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, এবং ভোলাহাট পেল পশ্চিমবাংলা।

আসামের বেলায় প্রথম প্রশ্ন উঠেছিল, কোন কোন অঞ্চল নিয়ে বাউন্ডারি কমিশন কাজ করবে। কমিশনের কোনো কোনো সদস্য বলেছিলেন, শ্রীহট্ট ছাড়াও আসামের অন্যান্য মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলিকেও কমিশনের এক্তিয়ারে ঢোকানো চাই। র‍্যাডক্লিফ কিন্তু শুধু শ্রীহট্ট ছাড়া অন্য কোনো জেলা সম্বন্ধে বিবেচনা করতে রাজি হলেন না।

পাথরকান্দি, রাতাবাড়ি, করিমগঞ্জ এবং বদরপুর থানাগুলি ছাড়া শ্রীহট্ট জেলার সবটাই পেল পূর্ব বাংলা।

পাঞ্জাব কমিশনের রায়ে পশ্চিম পাঞ্জাব পেল সম্পূর্ণ মুলতান ডিভিসন ও রাওয়ালপিণ্ডি ডিভিসন এবং লাহোর ডিভিসনের গুজরানওয়ালা, শেখুপুরা এবং শিয়ালকোট জেলাগুলি।

পূর্ব পাঞ্জাব পেল সম্পূর্ণ জলন্ধর ডিভিসন এবং আম্বালা ডিভিসন এবং লাহোর ডিভিসনের অমৃতসর জেলা। লাহোর ডিভিসনের গুরুদাসপুর ও লাহোর জেলা দুটি পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হোলো। রাবি নদীর পশ্চিমে গুরুদাসপুরের শকর-গড় তহশিল পশ্চিম পাঞ্জাব পেল এবং পাঠানকোট, গুরুদাসপুর ও বাগলা তহশিলগুলি—যেগুলি রাবি নদীর পূর্বে অবস্থিত—পেল পূর্ব পাঞ্জাব। লাহোর জেলার সম্পূর্ণ চুনিয়ান এবং লাহোর তহশিল পেল পশ্চিম পাঞ্জাব।

কসুর তহশিল পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের ভেতর ভাগ করে দেওয়া হোলো। বিভাগ-রেখা পড়লো আপারবাড়ি দোয়াব ক্যানেল যে-বিন্দুতে তহশিলে ঢুকছে তার দক্ষিণের গ্রামগুলির সীমারেখা ধরে খেমকরণ রেল স্টেশনের পশ্চিমের শেষ বিন্দু পর্যন্ত, তারপর পূর্বে বেঁকে শতদ্রু নদীর মুখে মাস্তেকে গ্রাম পর্যন্ত।

প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর লেখা আত্মজীবনী 'ফ্রেণ্ডস্ নট মাস্টারস্', প্রকাশিত হবার পর বইটি আমার সম্পাদিত ইংরেজি সাপ্তাহিক "লা ভেরি"তে সমালোচনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পাকিস্তানের তৎকালীন কলিকাতাস্থ ডেপুটি হাইকমিশনের আমার বন্ধু স্বর্গত হোসেন ইমাম। সেই সমালোচনার খানিকটা এই প্রবন্ধে তুলে দিলাম বাংলায় অনুবাদ করে।

'...প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নন যেখানে তিনি লিখেছেন যে, মুসলমানরা তাঁদের সমস্ত শক্তি দিয়ে এক স্বতন্ত্র বাসভূমির জন্য আগাগোড়া লড়াই করেছিলেন যার ফলশ্রুতি হোলো পাকিস্তান। সত্য কথা এই যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলমান নেতৃস্থানীয়রা, যাঁদের মধ্যে জিন্না ছিলেন প্রধান, একটি স্থানীয় ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য দাবি করেছিলেন যাতে হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যাল্প সম্প্রদায় সমান এবং সম্মানজনক শরিক হয়ে বাস করতে পারবে। কায়েদ-আজম জিন্না এক সময়ে প্রখর জাতীয়তাবাদী ছিলেন ও কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। সরোজিনী নাইডু তাঁর সম্বন্ধে বলতেনঃ হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের দূত।

মুসলমান রাজনৈতিক মানসিকতা উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের কাছে রূঢ় আঘাত পেল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে। ১৯০৫

সালের বঙ্গবিভাগ শিক্ষা, ব্যবসা ও শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মুসলমানদের একটি আত্মবিকাশের ভূমি তৈরি করে দিতে চেয়েছিল। মুসলমানের সেই আত্ম-বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের একটি তথাকথিত অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের নামে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ এতে বাধা দিলো। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং মুসলমানরা আবার দিল্লীর সিংহাসনে এসে বসতে পারবে, এই নিয়ে হিন্দুদের কোনো উদ্বেগ ছিল না। কিন্তু ১৯০৫ সালে মুসলমানরা প্রথম উপলব্ধি করতে পারলেন যে, সম্প্রদায় হিসাবে তাঁদের উন্নতির পথে হিন্দু জাতীয়তাবাদ একটি প্রধান বাধা-স্বরূপ হবে।

তবুও তখন তাঁরা তাঁদের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন বাসভূমির দাবি তোলেন নি। এমনকি ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তি বিদায় নেবার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কায়দে আজম জিন্না ও মুসলিম লীগ ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের কল্পনাকে ফলবতী করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। যাতে ভবিষ্যতে মুসলমান সম্প্রদায় ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার পেয়েছিলেন সেই ১৯৪৬-এর ১৬ মে তারিখের ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশন প্রস্তাব নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করে জিন্না এবং মুসলিম লীগ ভারত বিভাগকে একটি ভবিষ্যতের সম্ভাবনা মাত্র হিসাবে রেখেছিলেন, অবশ্যম্ভাবী বলে নয়। জওহরলাল নেহরুর একগুঁয়েমির জন্য এই মন্ত্রী-মিশন প্রস্তাব কার্যকরী করা যায় নি এবং তারপরে ব্যাপক সাম্প্র-দায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় যার জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সমানভাবে দায়ী ছিলেন। যদি এই মন্ত্রী-মিশন প্রস্তাব কংগ্রেস নেতারা আন্তরিকভাবে মেনে নিতেন, তাহলে জিন্না এবং মুসলিম লীগ হয়ত ভারত থেকে মোটেই বিচ্ছিন্ন হতে চাইতেন না। এবং দেশবিভাগের পরেও হয়ত দেশরক্ষা, যোগাযোগ ইত্যাদি নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে কার্যকরী চুক্তি করা সম্ভব হোতো।"

সর্বপ্রথম মুসলিম লীগ একটি নামমাত্র রাজনৈতিক দল ছিল। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে বাংলার কৃষক-প্রজাদল বেশির ভাগ মুসলিম কেন্দ্র-গুলিতে মুসলিম লীগকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। এই কৃষক-প্রজা দলের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন হিন্দু ছিলেন। বাংলা এসেম্বলিতে আসন লাভ করে কৃষক-প্রজা দলের নেতা ফজলুল হক কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন মহল অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। তখন হতাশা-ক্লিষ্ট ফজলুল হক মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে বাধ্য হলেন এবং কংগ্রেস নেতাদের একগুঁয়েমির জন্য বাংলায় মৃতপ্রায় মুসলিম লীগ পুনর্জীবন লাভ করলো।

এই কারণে একথা বলা ভুল যে, ভারতের মুসলমানরা তাদের স্বতন্ত্র

স্বাধীন বাসভূমির জন্য আগাগোড়া লড়াই করে এসেছে। সত্য কথা এই যে, উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, সেই জাতীয়তাবাদে তাদের কোনো স্থান নেই এবং যখন প্রতিনিধিস্থানীয় কংগ্রেস নেতারা তাঁদের এড়িয়ে যেতে লাগলেন, তখন তাঁরা নিজেদের জন্য এক উগ্র মুসলিম জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির পথ গ্রহণ করলেন। তথাপি, বহু দায়িত্বশীল মুসলমান নেতা এবং স্বয়ং কায়েদ-আজম জিন্না শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটি ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের ব্যবস্থা চালানো যায় কিনা তা যাচাই করতে রাজি ছিলেন, যদি তাঁরা হিন্দু এবং কংগ্রেস নেতাদের নিকট থেকে সন্তোষজনক উৎসাহ পেতেন। ১২ই জুলাই ১৯৪২-এর হরিজনে লেখা গান্ধীজীর একটি প্রবন্ধের উত্তরে কায়দে-আজম জিন্না বলেছিলেনঃ 'মুসলিম ভারতের কাছে পাকিস্তান একটি অঙ্গীকারের বস্তু...কিন্তু আপনারা একটি সম্মানজনক মীমাংসার জন্য আন্তরিকতা ও সরলতা প্রদর্শন করুন।' কায়দে-আজম জিন্নার কাছে পাকিস্তানই শেষ কথা ছিল না। সুযোগ পেলে তিনি সম্মানজনক মীমাংসায় আসতে রাজি ছিলেন। কিন্তু হিন্দু নেতাদের একগুঁয়েমি এবং বাস্তব সম্বন্ধে এক বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী জিন্না এবং মুসলিম লীগ নেতাদের এক নিরুপায় অবস্থার দিকে ঠেলে দেয় এবং যখন তাঁরা দেখলেন, হিন্দু এবং কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে কোনো মীমাংসা সম্ভবপর নয় তখনই তাঁরা দেশ-বিভাগই একমাত্র সমাধান বলে মনে করলেন। মুসলমানরা প্রথম থেকে স্বতন্ত্র স্বাধীন বাসভূমি কখনই চাননি। হিন্দু নেতাদের অন্ধতা এবং কংগ্রেস নেতারা স্বার্থপরতার বশে প্রতিনিধিস্থানীয় মুসলমান নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিতে অস্বীকার করায় মুসলমানরা বাধ্য হয়ে স্বতন্ত্র স্বাধীন বাসভূমির দাবি জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আয়ুব খাঁর বইয়ের প্রত্যেকটি পাতা এই সমালোচক খুঁজে দেখেছে, পূর্ব পাকিস্তানে (পূর্বতন) সংখ্যালঘু হিন্দুদের জন্য তাঁর কি বলবার আছে। ভারতের মুসলমানদের একটা বড় অংশ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এই জন্যে যে, কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের সমস্যা সরাসরি অস্বীকার করতেন। এই সমালোচক দেখতে পাচ্ছে যে, প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ ভারতীয় কংগ্রেসের নেতাদের সেই বিজ্ঞহীন নীতিই অনুসরণ করেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির সময়ে কায়দে-আজম জিন্না বলেছিলেন যে, পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সমান মর্যাদার সঙ্গে ব্যবহার করা হবে। এটা মনে রাখতে হবে যে, প্রথম পাকিস্তানী মন্ত্রিসভায় জিন্না দুজন হিন্দুকে ক্যাবিনেট মর্যাদার মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর লোকান্তরের পরও পাকিস্তানের অন্যান্য নেতারা সময়ে সময়ে ঘোষণা করতেন যে, সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের 'জিম্মি' স্বরূপ। কারও কারও মতে এটা খুব মর্যাদাসূচক ছিল না বটে, তবুও ওতে একটা সহানুভূতির

প্রকাশ ছিল। হুসেন শহীদ সুরাবর্দি এক সময়ে পাকিস্তানে মিশ্র নির্বাচন পদ্ধতি (জয়েণ্ট ইলেক্টরেট) প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন।

সত্য বলতে কি, কায়দে-আজম জিন্নার নেতৃত্বে ভারতের মুসলমানরা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করেছিলেন, সেটা শুধু মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র স্বাধীন বাসভূমি স্থাপনের জন্য নয়—যেখান থেকে তাঁরা তাঁদের ধর্মপ্রচারের সুযোগ পেতে পারেন। এই সমালোচক এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, জিন্না সকল ধর্মের সকল মানুষের সমান অধিকারের জন্য লড়াই করেছিলেন এবং তাঁর বিদ্রোহ ছিল সেই হিন্দু-সমাজদর্শনের বিরুদ্ধে যা মানুষকে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের বিভাগে বিভক্ত করে দেয় এবং যা উচ্চবর্ণের মানুষের জীবনকে লক্ষ লক্ষ নিম্নবর্ণের মানুষের শ্রমের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে। এই বিষয়ে জিন্নাকে একজন বিশ্বনেতা হিসাবে বিবেচনা করা দরকার। শুধুমাত্র মুসলমান সমাজের নেতা বলে নয়। জিন্না বলেছিলেন, এটা বোঝা খুব কষ্টকর, আমাদের হিন্দুবন্ধুরা হিন্দুধর্ম ও ইসলামের প্রকৃত রূপটি হৃদয়ঙ্গম করতে বিফল হন কেন? ধর্ম বাক্যটির প্রকৃত অর্থে এ দুটি পৃথক ধর্মমত মোটেই নয়—বরং সত্যদৃষ্টিতে দুটি পৃথক এবং ভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা। এটি একটি নিছক স্বপ্নমাত্র যে, হিন্দু ও মুসলমান কখনও একটি মিলিত জাতীয়তার সৃষ্টি করতে পারবে। (৬-৪-৪০-এর হরিজনে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক উদ্ধৃত)

হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধ্বজা তুলে ধরবার জন্য শুধু নয়, পরন্তু সাম্যের বাণীকে সফল করবার জন্যই জিন্না আমৃত্যু লড়াই করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন অ-মুসলমান মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন, তাঁর একমাত্র সন্তান—কন্যাটিও একজন অ-মুসলমানকে বিবাহ করেছেন।

প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ মুসলিম আশ্রয়-প্রার্থীদের ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে গমন সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন এবং নিঃসন্দেহে তাঁদের দুঃখ এবং দুর্দশা খুব বিষাদময়। কিন্তু যেসব লক্ষ লক্ষ হিন্দু আশ্রয়-প্রার্থী পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে এসেছিল, তাদের সম্বন্ধে একটি কথাও লেখেন নি। যদি সামাজিক অবিচারের ফলে মুসলিম আশ্রয়-প্রার্থীরা ভারত ছেড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে হিন্দু আশ্রয়-প্রার্থীরাও একই কারণে পাকিস্তান ছেড়ে এসেছে। আয়ুব খাঁর নিজের লেখাতেই দেখা যাচ্ছে যে, ধর্মের পার্থক্য ঈশ্বরের সামনে মানুষে মানুষে সাম্য প্রতিষ্ঠার বাধা-স্বরূপ হবে। এটা একজন উলেমার মনোবৃত্তি হতে পারে, কিন্তু একটি নবীন রাষ্ট্রের আধুনিক কোনো প্রগতিশীল নেতার এই মনোবৃত্তি রাখা চলে না।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বহু হিন্দু-কংগ্রেস নেতা পাকিস্তান সৃষ্টির

ব্যাপারটা মনে মনে মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু সেই কারণে কি পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র সংখ্যাল্প হিন্দু-সম্প্রদায়কে সন্দেহের চোখে দেখতে হবে? আনুগত্যের প্রশ্ন হয়ত তোলা হতে পারে। যদি পাকিস্তানের নব্বই লক্ষ হিন্দু সংখ্যালঘুকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়, তাহলে ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসলমান সংখ্যালঘুকেও সন্দেহের চোখে দেখা হতে পারে। কিন্তু এইভাবে আমরা কোনো সমাধানে পৌঁছতে পারবো না।

এই প্রশ্নগুলি দেশবিভাগের সময়েই ভাবা উচিত ছিল এবং এর প্রতিবিধানের পথ ঠিক করে রাখা উচিত ছিল। পাকিস্তানের স্রষ্টারা যদি সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দু ও মুসলমান কিছুতেই এক দেশের অধিবাসী হয়ে একসঙ্গে বসবাস করতে পারবে না, তাহলে স্পষ্টত তাদের উচিত ছিল—লোক-বিনিময়ের ব্যবস্থা করা, যাতে পাকিস্তান একটি নিছক মুসলমান রাজ্য এবং ভারত একটি নিছক হিন্দু রাজ্যে পরিগণিত হতে পারে। যাই হোক, সে সময়ে কেউই উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের দুর্দশার কথা ভাবেন নি, কিম্বা এ সম্বন্ধে একটা কার্যকরী সমাধান বের করবার চেষ্টা করেননি। দেশ-বিভাগের সময়ে পাকিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে সংখ্যালঘুরা পাকিস্তানের সম-মর্যাদার সম্মানজনক অধিবাসী হিসাবে গণ্য হবে এবং তাঁদের ভয়ের কোনো কারণ থাকবে না। কংগ্রেস নেতারা অবশ্য তাঁদের একটি তথাকথিত সম্মিলিত জাতীয়তাবাদের প্রতি আনুগত্যের জন্য সমস্ত ব্যাপার-রটি মধ্যে এই সবচেয়ে মূল্যবান প্রশ্নটিই তুলতে চাননি। এবং এখন নিশ্চয়ই এই প্রশ্ন তোলার পক্ষে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেই সংখ্যালঘুদের থাকতেই হবে এবং তাদের সংখ্যাগুরু-সম্প্রদায়ের সমান মর্যাদা ও অধিকারও পাওয়া চাই। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ তাঁর দেশের সংখ্যালঘুদের এই প্রশ্নটি নীরবতা দিয়ে এড়িয়ে গেছেন, যদিও তিনি বার বার উল্লেখ করেছেন, ভারতের মুসলমান সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে। কায়দে আজম জিন্না দুজন হিন্দু ক্যাবিনেট মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন এবং তিনি বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সংখ্যালঘুদের সম্পূর্ণ সমান দৃষ্টি দিয়ে দেখা হবে। এতে সন্দেহ নেই যে, মার্শল আয়ুব খাঁ এ ব্যাপারে কায়দে আজম জিন্নার মহান সামাজিক আদর্শ থেকে অনেকখানি দূরে সরে গিয়েছিলেন।

এই সমালোচক বুঝতে পারেনি, আয়ুব খাঁ বার বার কেন শুধু এইটুকু বোঝাবার প্রয়াস করেছেন যে, পাকিস্তান একটি মুসলমান রাষ্ট্র মাত্র। মুসলমান রাষ্ট্রগুলি সম্বন্ধে তিনি বলেছেনঃ 'এটি একটি বাস্তব ঘটনা যে কম্যুনিষ্ট জগত, ক্রীশ্চান জগত এবং হিন্দু-ভারত এদের মুসলিম রাষ্ট্র বলেই মনে করে (১৮৩ পৃঃ)'। কিন্তু আয়ুব খাঁও কি সেইটাই চাননি? ইসলামী ধর্মদর্শনের উপর অত্যধিক নির্ভরতা এবং অন্য ধর্মের লোকেদের কোনো সুবিধাদানের

বিষয়ে চরম উপেক্ষা—এইসব দেশগুলিকে প্রচণ্ডভাবে মুসলিম-জাতীয় করে তুলেছে এবং তার জন্য এইসব দেশের নেতারাই মুখ্যত দায়ী। ইসলামী তুলেছে এবং তার জন্য এইসব দেশের নেতারাই মুখ্যত দায়ী। ইসলামী গুণগুলি স্বীকার করতে দোষ কি?

১৯৬ পৃঃ-য় তিনি লিখেছেনঃ 'ইসলামকে যেসকল বাধাসূচক ও বিজাতীয় প্রভাব তার প্রকৃত চরিত্রকে বিকৃত করেছে, যতক্ষণ না ইসলামকে সেগুলি থেকে মুক্ত করা হচ্ছে ততক্ষণ মুসলমান সমাজের পক্ষে কোন অগ্রগতি অসম্ভব।' এবং ১৯৫৯-এর ১২ই এপ্রিলের নোটে তিনি বলেছেনঃ 'ঈশ্বরের সামনে সকল মানুষ সমান অতএব, বর্ণ জাতি এবং দেশের সকল পার্থক্যের মধ্যেও মানুষের মৌলিক একত্বকে স্বীকার করতেই হবে'। (১৯৭ পৃঃ)। এই লাইনটির মধ্যে 'ধর্ম' কথাটিও দেখবার জন্যে বৃথা চেষ্টাই সমালোচক করেছে। তার অর্থ এই যে, ধর্মের পার্থক্য থাকলে মানুষের মৌলিক একত্বকে স্বীকার করা চলবে না। তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে, মুসলমানরা অ-মুসলমানদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের সামনে সকলে এক বলে মানতে রাজি নন। এই বিষয়ে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর পথপ্রদর্শক তাঁর পবিত্র পয়গম্বর নন, বরং সেই আর্য ও ব্রাহ্মণ যারা শত-শতাব্দী ধরে নিজেদের সমাজের এক বিরাট অংশকে হীনতার কালিমায় লিপ্ত করেছিল এই জন্য যে, দুর্ভাগ্যবশত সেই বংশে তাদের জন্ম হয়েছিল যারা উচ্চবর্ণের লোকেদের সেবা করতে বাধ্য।

ইংরেজরা যখন তাঁদের শিক্ষার আলোক নিয়ে এদেশে এসেছিলেন, তখন মুসলমানরা তাকে পরিহার করেছিলেন। কিন্তু হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষাকে স্বাগত জানালেন। জাতীয়তাবাদের প্রথম বীজ ভারতে রোপিত হয়েছিল ইংরেজের দ্বারা ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে এবং হিন্দুরা প্রথমে এই শিক্ষা পেয়েছিলেন বলে তাঁরাই জাতীয়তাবাদের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। কিন্তু বহু-জাতিক ও বহুবর্ণভিত্তিক ভারতবর্ষে ভূমিভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এক ভঙ্গুর স্বপ্নের মতই ছিল। কাজেই শিক্ষিত হিন্দুরা হিন্দু-ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আদর্শকেই ধরলেন তাঁদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি হিসাবে। কিন্তু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ধর্মের সংমিশ্রণ সব সময়েই বিপজ্জনক। জার্মানিতে একটি বিপর্যয় ঘটে গেছে এর ফলে এবং ভারতের বেলাতেও সেইটাই হয়েছে।

কিন্তু ভারতে এর নিষিক্তকরণ এত গভীর হয়েছিল যে, গান্ধী ও নেহরুর মত শ্রেষ্ঠ নেতারাও মধ্যযুগীয় মানসিকতার এই অন্ধকারের শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার মোট ফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, দুটি হিন্দু ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে রুখে দাঁড়ালো এবং প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ বলছেন, একবার কাশ্মীর সমস্যাটির

সন্তোষজনক সমাধান হয়ে গেলেই এই দুই জাতীয়তাবাদ 'ভাই-ভাই' হয়ে বাস করবে। এই সমালোচকের এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। জাতীয়তাবাদ বিষ, কিন্তু ধর্মমূলক জাতীয়তাবাদ দ্বিগুণ বিষ। এ বিষয় সন্দেহ নেই যে, শিক্ষিত হিন্দুরা যদি হিন্দুধর্মে অনুপ্রাণিত জাতীয়তাবাদ প্রচার না করতেন, মুসলমানরা ইসলামে অনুপ্রাণিত জাতীয়তাবাদ প্রচার করতে উৎসাহ পেতেন না।

অতীতে হিন্দু ও কংগ্রেস নেতারা অনেক ভুল করেছেন। কিন্তু পাকিস্তানি নেতাদেরও আদর্শ নির্ভর করেছে সেই ব্রাহ্মণ্যবাদের উপর যার মূলমন্ত্র হচ্ছে বিশ্বজোড়া ঘৃণা। সাম্যের আদর্শের যিনি উপাসক, ইসলামের আদর্শের যিনি উপাসক, তিনি কেন ঘৃণার আদর্শকে উপাসনা করবেন? ইসলাম ঘৃণার উপাসনা করে না—ইসলাম মানুষে মানুষে শত্রুতার বাণী প্রচার করে না। যদি হিন্দুধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম ভুল করে থাকে, তারা তার কুফল ভোগ করবে। কিন্তু ভারতের এবং পাকিস্তানের ভাবীকালের মানুষদের স্বাধীনভাবে এবং নিষ্কলুষ হয়ে ফুটতে দিতে হবে বা ফুটে উঠতে হবে সমগ্র মনুষ্যজাতির কুসুমটির মত—হিন্দু মুসলমান, ক্রিশ্চান বা ইহুদি হিসাবে নয়।

———

গ্রন্থপঞ্জী

১। ভারতে বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬৭
২। ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া, আর. পি. দাশগুপ্ত
৩। ন্যাশন্যালিজম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ম্যাকমিলান, ১৯৪৬
৪। স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী, রামকৃষ্ণ মিশন, ১৩৫৫
৫। লর্ড ক্লাইভ, কর্ণেল মেলিসন
৬। এ হিস্টরী অফ দি ইন্ডিয়ান রিভোল্ড, জর্জ এড, ১৮৯১
৭। ইন্ডিয়া উইন্‌স্‌ ফ্রিডম, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ওরিয়েন্ট ১৯৬৪
৮। স্পিচেস এ্যান্ড রাইটিংস্‌ অফ বি. জি. তিলক, ১৯১৫
৯। সোল অফ ইন্ডিয়া, ১৯৩২
১০। শ্রী অরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ, গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, ১৯২৪
১১। রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খন্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৭২
১২। পাকিস্তান অর পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া, ডঃ বি. আর. আম্বেদকর, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৬
১৩। রাজা ও প্রজা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৩২৭
১৪। ইয়ং ইন্ডিয়া, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সম্পাদিত, ১৯২০, ১৯২৭, ১৯২৫, ১৯২৯, ১৯৩০
১৫। জাতীয় কংগ্রেস সভাপতির অভিভাষণ, চিত্তরঞ্জন দাশ, ১৯২২
১৬। জাতীয় কংগ্রেস সভাপতির অভিভাষণ, মহাত্মা গান্ধী, ১৯২৪
১৭। জাতীয় কংগ্রেস সভাপতির অভিভাষণ, মতিলাল নেহরু, ১৯২৮
১৮। ইন্ডিয়ান এ্যানুয়াল রেজিস্টার, এইচ. আর. মিত্র প্রকাশিত, ১৯২১, ১৯২৮
১৯। এ বাণ্ড অফ ওল্ড লেটার্স, জওহরলাল নেহরু সম্পাদিত, ১৯৫২
২০। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ, চিত্তরঞ্জন দাশ, ১৯২৫
২১। দি বেঙ্গলী, ইংরেজি দৈনিক, ১৯২৪, ১৯২৫, ১৯২৬, ১৯২৭, ১৯২৯

২২। মাই লাইফ স্টোরি, মুকুন্দরাম রামরাও জয়াকর, ১৯৩৮
২৩। অমৃতবাজার পত্রিকা, ইংরেজি দৈনিক, ১৯২৫, ১৯২৬, ১৯২৭, ১৯৪০
২৪। কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, মুজফ্ফর আহমদ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৬২
২৫। দি স্টেটসম্যান, ইংরেজি দৈনিক, ১৯২৭, ১৯৪৬
২৬। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, ১৯২৬
২৭। দি মুসলমান, ইংরেজি সাপ্তাহিক, জুন, ১৯২৭
২৮। সিভিল এ্যান্ড মিলিটারি গেজেট, লাহোর, ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭
২৯। ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল হেরাল্ড, ইংরেজি দৈনিক, বোম্বাই, ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭
৩০। দক্ষিণী বার্তা, ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৭৬
৩১। অটোবায়োগ্রাফি, জওহরলাল নেহরু, বডলে হেড, ১৯৩৫
৩২। এডভান্স, ইংরেজি দৈনিক, মার্চ, ১৯৩২
৩৩। ফরোয়ার্ড, ইংরেজি দৈনিক, জানুয়ারী, ১৯২৯
৩৪। সুভাষের সঙ্গে বারো বছর, হেমন্তকুমার সরকার, ১৯৪৪
৩৫। দেশবন্ধু স্মৃতি, হেমন্তকুমার সরকার, ১৯২৮
৩৬। এ নেশন ইন মেকিং, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ১৯২২
৩৭। ইন্ডিয়ান নিউজ হেরাল্ড, বোম্বাই, ১৯২৭
৩৮। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কার্যবিবরণী, ১৯২৭, ১৯২৮
৩৮। স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের ৩৯ নম্বর ফাইল, ১৯২৫
৪০। সমূহ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩১২
৪১। স্পীচেস এন্ড রাইটিংস অফ মৌলানা মহম্মদ আলি, ১৯৩১
৪২। হিস্টরী অফ দি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, উইনস্টন চার্চিল, ম্যাকমিলান, ১৯৫০
৪৩। ওয়ার ইন ফার ইস্ট, বেসিল কলিয়ার
৪৪। এশিয়ান ন্যাশন্যালিজম এন্ড দি ওয়েস্ট ইনস্টিটিউট অফ প্যাসিফিক রিলেশান, ১৯৫৫
৪৫। ট্রান্সফার অফ পাওয়ার, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট, তৃতীয় খণ্ড
৪৬। ওয়েভেল দি ভাইসরয়েস জার্নাল, পেণ্ডেরেল মুন সম্পাদিত, ১৯৭২
৪৭। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, ইংরেজি সাপ্তাহিক, ১৯৩৪
৪৮। ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট, দোমিনিক লাপিয়ের ও সিরিন কলিন্স্, ১৯৮৫

লেখক পরিচিতি

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও শ্রীমতী হেমন্তকুমারী শাসমলের একমাত্র পুত্র বিমলানন্দ শাসমল মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সালে ছাত্রাবস্থায় তিনি কলকাতায় গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে গান্ধীজী তাকে বলেছিলেন "You have to carry on the work of your father." ছাত্রাবস্থায় তিনি পিতৃহীন হ'ন। কাঁথির মহিয়সী বীর রমণী পদ্মা গয়লানীর উপর সত্যাগ্রহীদের নিজ বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে যে অমানুষিক পুলিশি অত্যাচার হয়েছিল সেই কাহিনী লেখক বিলাতের হাউস অফ কমন্সে উত্থাপনের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন।

'১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী দুর্ভিক্ষপীড়িতদের মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য লেখক ভারতরক্ষা আইনে গ্রেফতার হয়েছিলেন। ১৯৪৫-এ তিনি সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে গান্ধীজীর অবস্থানকালে তাঁর শিবিরে সংবাদপত্র জগতে যোগাযোগকারী কর্মী হিসাবে কাজ করতে থাকেন। এই সময় তিনি গান্ধী শান্তি সেবাদল নামে এক অহিংস কর্মীদল গঠন করেন। ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় তিনি গুরুতর ভাবে আহত হয়ে সাতাশ দিন অজ্ঞান অবস্থায় পি জি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তখনকার রাজনীতি ছিল পঙ্কিলতায় ভরা এই ধারণায় লেখক স্বাধীনতার পর থেকে রাজনীতি-জগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন।

লেখক প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "বেদান্ত দর্শন ও বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক সূত্র" এই বিষয়ের উপর ফরাসী ভাষায় ডক্টরেট হ'ন এবং ফ্রান্সের জাতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিষদ থেকে স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। লেখকের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রেডিওযোগে সমগ্র ইউরোপে প্রচারও করা হয়েছিল এবং বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আলবার্ট সোয়াইৎযোয়ার তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

লেখক আইন পাশ করেন এবং বিভিন্ন কলেজ যেমন সুরেন্দ্রনাথ, সিটি কমার্স, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রভৃতি কলেজে অধ্যপনা করেন। সমাজ সেবার কাজেও লেখক অগ্রণী ছিলেন। বছর খানেক মাদার টেরিজার সঙ্গে কুষ্ঠ-রোগীদের সেবাও করেছেন। এছাড়া এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যালের সদস্য

হিসাবে বিভিন্ন দেশের অত্যাচারিত ও নিপীড়িতদের পক্ষ নিয়ে অনেক তদবির করেছেন। কিছুদিন আগে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির বন্দীদের স্বপক্ষে আবেদন জানালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার সহানুভূতির সাথে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছিলেন। মেদিনীপুরের সেন্ট্রাল জেলে তিরিশ জন তপশিলি জাতির বন্দীদের জন্য প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের কাছে আবেদন করে মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। ছাত্রাবস্থায় লেখক তার কাব্যগ্রন্থ "পতিতা" প্রকাশ করেন। তাঁর গদ্য পদ্যের সংকলন "এস রেণু" খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ১৯৬৮ সালে তিনি "লা ভেরীতে" (সত্য) নামে ইংরাজী সাপ্তাহিক কাগজও বের করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করে লেখক দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ঐ রিপোর্টে বিধানচন্দ্র রায় সহ কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ হয়েছিল। লেখকের অনুপম অবদান প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টিকারী স্বাধীনতা ইতিহাসের বহু তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক দলিল "স্বাধীনতার ফাঁকি"। লেখক বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিশিষ্ট আইনজীবি।

বিমলানন্দ শাসমল

ভারত কিভাবে ভাগ হলো